শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা । বারো

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

বন্ধুবরেষু

লেখকের অন্যান্য বই

জীবন যৌবন

তিমিরাভিসার

নিকষিত হেম

অমিত্রাক্ষর

শুভরাত্রি

নতুন নায়িকা

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য
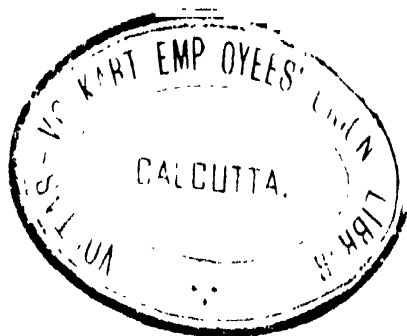
Not till the sun excludes you do I exclude you,
Not till the waters refuse to glisten for you and the leaves to rustle
for you, do my words refuse to glisten and rustle for you.

মাসে তিন দিন।

সারা মাস সুবর্ণ এই তিনটি দিনের প্রতীক্ষায় থাকে।

হাসি মুখে আসে। ম্লান মুখে যায়।

আর, যাওয়ার সময় প্রতিবারই ভাবে : কতদিনে শেষ হবে এই আসা-যাওয়ার পালা? আর কতদিন? পাঁচবছর তো হতে চলল!

পাঁচটি বছর!

পাঁচ বছর আগে, সেই প্রথমবার বিদায় নেবার সময়, তাকে জড়িয়ে ধরে ফনী কেঁদে উঠেছিল। চার পাশে ছিল সুভাষিণী, সুষমা, সুরমা, ননী, টুলু। ঘর থেকে বার হয়নি অবিনাশ।

কেমন যেন দিশেহারা লাগে সুবর্ণর। অত বুঝিয়ে-সুঝিয়ে-রাজী-করানো মনটা তার বেঁকে বসে হঠাৎ। ফনীর বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েও পা বাড়াতে পারে না। একে একে তাকায় সকলের মুখের দিকে।

তুমি যাইও না বড় পিশি! যাইও না!

আঁচলে টান পড়ামাত্র সচেতন হয়ে ওঠে। টুলুর মিনতিকাতর মুখখানির দিকে তাকাতেই মনে পড়ে যায়—শুধু তিন বছরের ওই টুলু নয়, এতগুলি প্রাণী চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। অবিকল ওইভাবে। তিন বছরের অবুঝ-নাবুঝ টুলুর চেয়েও অসহায় অবিনাশ।

না গিয়ে পারে সুবর্ণ!

শুধু যাওয়া নয়, যেতে যেতে প্রতিজ্ঞা করে, এই শেষ যাওয়া।

বড় হয়েও যদি আজকের কথাগুলি মনে রাখে ফনী আর ননী, তবেই আসবে।

তখনও কি না এসে পারে?

সেই ভবিষ্যতের পথ চেয়ে থাকবে।

সে-প্রতিজ্ঞা সুবর্ণ রাখতে পারেনি।

প্রথমবার তবু একটা অজুহাত ছিল : কী করে তাকে দেখে সবাই ? কী ভাবে তাকে গ্রহণ করে ?

সে-কৌতূহল কি এতদিনেও মিটল না !

তবে কেন আজও সারা মাস এই তিনটি দিনের প্রতীক্ষায় থাকে ?

কড়া নাড়ার শব্দে ননী এসে দরজা খুলে দেয়।

তুই ! ভয়ানক অবাক হয়ে যায় ননী।

সুবর্ণ হেসে বলে, ক্যান ?

ননী জবাব দিতে ভুলে যায়।

ক্যারে, ভূত দেখলি নাকি ? দুদিনের সর্দিজ্বরেই—

তুই না কইছিলি—

কী কইছিলাম ?

কিছু না। আয় ! ননী আর দাঁড়ায় না।

কিন্তু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সুবর্ণ। তাকে দেখে অমন চমকে উঠল কেন ননী ? কী বলেছিল সে ? নাকি দুদিনের সর্দিজ্বরেই নিজের ভাইকে চমকে দেবার মত পাল্টে যায় চেহারা মানুষের ?

প্রতিবারই ননী অবশ্য দরজা খুলে দেয় না। কিন্তু যে-ই দিক, সুবর্ণ ঢোকামাত্র তাকে জড়িয়ে ধরে সে বাড়ি মাথায় করে। সাড়া পেয়েই ছুটে আসে বাকি সকলে। একই সঙ্গে রান্নাঘর থেকে সুভাষিণীর আর বারান্দার খুপরি থেকে অবিনাশের হাঁকডাক শোনা যায়।

কিন্তু আজ কারো পাত্তা নেই কেন ? কী ব্যাপার ?

দু'পা এগিয়ে সুবর্ণ জানালা দিয়ে সদরে উঁকি দেয়। তক্তাপোষে খবরের কাগজে তন্ময় অবিনাশ। একপাশে তার টুলু, আরেক পাশে সুরমা। বইয়ে মুখ গুঁজে দুজনেই। ওপাশে জানালার সামনে টেবিলে ননী।

ভাইবোনেরা পড়াশোনা করছে। সামনে বসে বাপ পাহারা দিচ্ছে। দেখলেও চোখ জুড়িয়ে যায়।

সে আসা মাত্র ওরা পড়ার পাট তুলে ফেলে বলে সে-ই না প্রতিবার রাগা-রাগি করে? আজ কেন তবে মনটা তার মুষড়ে পড়ল?

তবে কি তার আসাটা কেউ টের পায়নি? ননী গিয়ে কাউকে বলেনি? এমনই অবাক হয়ে গেছে ননী? সুভাষিণীও ভাবতে পারেনি সুবর্ণ আবার আসবে?

তাই বুঝি সে রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ানো সত্ত্বেও একমনে সুভাষিণী ডালে কাঁটা দিয়ে চলেছে?

সুবর্ণ জিজ্ঞেস করে, বুড়ি কোথায় মা?

সুভাষিণী ফিরে তাকায়। ওমা, তুই! সুভাষিণী যেন বিষম খায়। আইলি কখন?

এই। বুড়িরে দেখি না যে মা?

র, আসি। তাড়াতাড়ি ডালের কড়া নামিয়ে চটপটহাত ধুয়ে সুভাষিণী উঠে আসে। ফিস ফিস করে বলে, বুড়ির কথা নিয়া রাগারাগি করিস না য্যান মা। বুড়ি যাইবার চায় নাই, শ্যাষে উনি কওনই—

গ্যাছে কই?

গ্যাছে—

আঃ! কই গ্যাছে তাই কওনা ছাই?

বাইসকোপে!

অ। সুবর্ণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

মিথ্যেই মনটা তার কু গাইছিল। সে আসামাত্র সবাই আনন্দ উচ্ছ্বাসে ফেটে না পড়ুক, মান তার পুরো বজায় এখনও। কবে সে সুরমার সিনেমা দেখা নিয়ে রাগারাগি করেছিল—সেই আতঙ্ক আজও যায় নি সুভাষিণীর।

সুবর্ণ বলে, ওয়াতে রাগারাগি করনের কি আছে। এ্যামনে তো বেচারির বাড়ি থেইকা বাইরন হয় না। চব্বিশ ঘণ্টা ঘরে বন্দ। মাঝেমধ্যে সিনেমায় গ্যালে মনটা তবু ভালো থাকে।

উনিও তাই কইল—

বাবায় ঠিকই কইছে।

কিন্তু দুলালের লগে যাইতে বুড়ির—

দুলালের লগে ?

দোহাই মা!

গুম হয়ে যায় সুবর্ণ। দুলালের সাথে সিনেমায় গেছে সুষমা, যে-দুলালের সাথে ননীকেই সে মিশতে মানা করে দিয়েছে? এবাড়িতে যে-দুলালের আসা নিয়েই গতবার সে রাগ করে বলেছিল, বেশ, দুলালই যদি অত আপন, আসুক দুলাল—সুবর্ণ আর আসবে না ?

এতক্ষণে ননীর অবাক হওয়ার কারণটা বোঝে সুবর্ণ।

দুলালের লগে বুড়িরে বাবা—

তর পায়ে পড়ি মা, এ নিয়া অখন আর হুজ্জোত করিস না। এতক্ষণ তরি বকবক কইরা ওঁর ধমকে ননী এই থামছে। একটু কাল চুপ করে থেকে সুভাষিণী আবার বলে, তা ছাড়া দুলালরে মাইনষে যত বদ ভাবে পোলাটা আসলে—

কথা না বলে হনহন করে কলঘরে চলে যায় সুবর্ণ।

শুধু দুলালের সাথে সুষমার সিনেমা যাওয়া নয়, সদর ঘর থেকে সেদিন নিজের কানে সব শুনেও দুলাল আসা-যাওয়া করে এখনও? অবিনাশ কেন, সুভাষিণীরও তাতে আপত্তি নেই—কারণ দুলালকে লোকে যত খারাপ ভাবে দুলাল কি তাই ?

সুষমারও এই ধারণা? নইলে বাবা বলল বলেই রাজী হল কেন?

দুলালকে হাতে রাখায় ননীর না-হয় স্বার্থ আছে। দুলালের হয়ে সে-ই শুধু সেদিন ওকালতি করেছিল।

গয়নাগাঁটি ছাড়াও নগদ দশ হাজার, কম কথা! টাকা টাকা করে যেমন ক্ষেপে উঠেছে ননীটা।

তা টাকার জন্যে ননীর ক্ষেপে ওঠার মানে সুবর্ণ বোঝে। কিন্তু নিজে দুলালের বন্ধু হয়ে থাকলেও, এ-বাড়িতে তার আসা যাওয়ায় মত থাকলেও—সুষমাকে

ও দুলালের সাথে সিনেমায় যেতে দিল কি বলে? পরে বাবার সাথে রাগারাগি না করে আগেই কেন রুখে দাঁড়াল না?

সুষমাই বা গেল কি বলে? সিনেমা দেখার এত শখ সুষমার!

সুবর্ণর মাথায় যেন আগুন ধরে যায়। তার ইচ্ছে করে গলা চিরে চেঁচিয়ে ওঠে। চিৎকার-চেঁচামেচি করে একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে বসে। লোকে কী বলে না বলে পরোয়া করে না সুবর্ণ, করতে কাউকে বলেও না—কিন্তু তার নিষেধের কোন দাম নেই?

সুভাষিণী ধোয়া কাপড়চোপড় নিয়ে আসে। সুবর্ণ সরে দাঁড়িয়ে তাকে ঢোকার পথ করে দেয়।

সুভাষিণী বলে, রাগ করলি মা! ফইনার লেইগা টিকিট কিইনা আনছিল, এদিকে হে গেছে বর্ধমান, টাকা দিয়া কেনা টিকিট নষ্ট হইব! তাই—

ফইনা বর্ধমান গেছে? ক্যান? বর্ধমানে তার কি কাম? অর না সোমবার পরীক্ষা!

তয় আর কই কি মা! জ্বালা কি আমার একটা।

ফইনা আইব কবে?

হে কথা জিগাইবার সাহস হইছে কারো? ননী বুঝি একবার মানা করছিল—তাইতে বড় ভাইরেই যা-নয়-তাই শুনাইয়া দিল।

ফইনা?

স্পষ্ট শুনেও সুবর্ণর যেন বিশ্বাস হয় না।

তায় আরেক কাণ্ড—কথা নাই বার্তা নাই হুট কইরা জামাই আইসা হাজির।

কে! রুদ্ধশ্বাসে সুবর্ণ জিজ্ঞেস করে, কে আইছিল মা?

সুভাষিণী জবাব দেয় না। মেয়ের প্রশ্নের ধরনেই সে বুঝে গেছে যে জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। দড়িতে শাড়ি-ব্লাউজ রেখে চুপচাপ সে কলঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বাইরে থেকে টিনের পাল্লাটা ঠেলে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে সেটা খুলে ফেলে সুবর্ণ। শোন মা, শুইনা যাও। কবে আইছিল? ক্যান আইছিল? ঠিকানা পাইল কি কইরা?

যেতে যেতে সুভাষিণী বলে, আয়, কাপড় ছাইড়া আয়, জিরা—শুনিস।

ভুজঙ্গ এসেছিল ?

কিন্তু কেন ?

নিজেই তো ভুজঙ্গ একদিন সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিল। বছরের পর বছর কোন খবর নেয়নি। বরং সুবর্ণর হাত এড়াবার জন্য রাতারাতি বাসা বদল করেছে, একটার পর একটা মেস বদলিয়েছে। পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে।

আজ, এতদিন পরে, কেন এসেছিল তবে ?

তবে কি এতদিনে ভুজঙ্গর—

মা-ই নিজে থেকে কথা শুরু করবে ভেবে কিছুক্ষণ উসখুস করে সুবর্ণ। কিন্তু সুভাষিণীর চাল ধোয়া আর শেষই হয় না। লজ্জার মাথা খেয়ে তাই সুবর্ণ জিজ্ঞেস করে, কি কইল মা ?

কে কি কইল ?

যে আইছিল কইলা ?

জামাই ? আরে ছি ছি ছি—হের কথা আর কইস না। শ্বশুর মানুষ—গুরুজন —পোলাপানের সামনে কী সব কথা তারে শুনাইয়া গেল! ফের হুমকি দিয়া কয় কি—

থাউক মা থাউক।

না, আর কিছু শোনার সাধ নেই সুবর্ণর। ভুল করেছিল সে। ভীষণ ভুল। মানুষ বদলায় বলে সে-মানুষটাও বদলে যাবে কী করে ভেবেছিল ? সে কি মানুষ !

সে কী চোটপাট ! ভাগ্যে উনি বুদ্ধি কইরা—

বাবায় কী কইল ?

সিধা কথা। তর খবর আমরা জানি না। তুই আসস না। তর লগে আমাগো আর সম্পক্ক নাই।

ঠিক কইছে! দেওয়ালে একটা টিকটিকি টিক-টিক করে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে কথাটার পুনরুক্তি করে সুবর্ণ, বাবায় ঠিকই কইছে মা।

আর তুইও কইয়া গেলি—
আমার আসা ভুল হইছে মা!

কথাটা স্বভাষিণী বোধ হয় শুনতে পায় না। পেলে নিশ্চয় প্রতিবাদ করত। মেয়ে মায়ের কাছে আসবে না, মাসে অন্তত তিনটি দিনের জন্যেও? এতে যদি কারো বুকে বাজে, সে যেন গিয়ে আলাদা থাকে। যে যাই বলুক, মা হয়ে মেয়েকে স্বভাষিণী জন্মের মত পর করে দিতে পারবে না। না না না!

তুমি মেয়ার মা, আমি বাপ না?

বাপ! নামেই! বাপ হইলে কখনও—

ম্লান হেসে গাঢ়স্বরে অবিনাশ বলে, শোন্ সোনা শোন্—মা-টা তর কি বুঝতে কি বুঝছে! আরে সত্যই কি আমি অর না আসায় মত দিছি নাকি। লেখাপড়া সিকায় তুইলা সকাল-বিকাল ডুলালরে নিয়া ঘরে আড্ডা বসাইলে ও যখন আর আইব না কইয়া টুলুগো ভয় দেখাইল—তখন স্যান আমি—

সেদিন চুপ করে গিয়েছিল স্বভাষিণী। অবিনাশের কৈফিয়ত শুনে এক মাস আগে তার বুদ্ধির তারিফ করেছিল স্বর্ণও।

করছে আজও! ভাগ্যিস বাবা বুদ্ধি করে ওই কথাটা বলেছে ভুজঙ্গকে।

বাড়াবাড়ি করলেও সুষমার কথাগুলি হয়ত পুরোপুরি মিথ্যে নয়। দিনকে দিন সত্যিই বড় বুদ্ধিমান হয়ে উঠছে অবিনাশ। বড়-বেশি বুদ্ধিমান!

তাই এতক্ষণ সে এসেছে অথচ একবারো তাকে ডাকল না। সুরমা আর টুলুকে পর্যন্ত আগলে রেখেছে—পাছে ওদের পড়াশোনার ক্ষতি হয়। জানে তো, ভাইবোনদের পড়াশোনার দিকে কী নজর স্বর্ণর।

নইলে সত্যিসত্যিই মেয়ের সাথে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিলে কি তার আসা টের পেয়েও অবিনাশ নির্বিকার বসে থাকত?

কিন্তু সে-মানুষটা এসেছিল কেন? কৈফিয়ত নিতে? তাহলে তার কাছে না গিয়ে তার বাপের কাছে কেন? এ ঠিকানা যোগাড় করতে পেরেছে, ও ঠিকানা পারত না? এ ঠিকানা যে দিয়েছে ও ঠিকানা কি তার অজানা?

প্রতিশোধ নিয়েছে দুলাল। আর সেই দুলালের সঙ্গেই সুষমাকে যেতে দিয়েছে অবিনাশ। যাওয়া বন্ধ করার মত জোরালো আপত্তি ননীও করেনি।

অর্থাৎ ওরাও বুঝে গেছে, ভুজঙ্গকে ঠিকানা দিয়েছে কে? তাই দুলালকে অসন্তুষ্ট করতে চায়নি কেউ। বরং এরপর থেকে প্রাণপণে দুলালের মন যুগিয়ে চলবে সবাই।

কিন্তু প্রতিশোধ শুধু দুলাল নিতে পারে, স্বর্ণ পারে না? সেদিনের পরেও তাকে সোনামামী বলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে বলেই না স্বর্ণ চুপ করে গেছে। কথায় কথায় শুধু ননীকে বলে দিয়েছে, দুলালের সাথে সে যেন না মেশে। অন্তত এ বাড়িতে যেন কক্ষণো আর না আসে দুলাল। পড়ুক সে ননীর সাথে, বড়লোকের ছেলে তো। গরিব বড়লোকে কি খাপ খায়?

এক সাথে পড়েন! বাপ মরার পর থেইকা কলেজের গেট মাড়াইছেন!

তয়? তয় অর লগে অত ভাব কিসের?

সুষমা ফুট কাটে, ভাব কি আর অর লগে লো। ভাবের মানুষ একখান রাইখা গ্যাছে চৌধুরী মশয়।

রেওয়াজমাফিক বোনকে একটা সলজ্জ ধমক দিয়ে ওঠার বদলে বেহায়ার মত মিটিমিটি হাসে ননী।

স্বর্ণ বলে, অ্যাঁ। তাই নাকি রে? বিয়া হয় নাই হেইডার? কী য্যান নাম—

সুষমা বলে, নামের বাহার আছে দিদি। দ্যাশে আছিল পুঁটি, অখন ইস্কুলে হইছেন শকুন্তলা।

ইস্কুলে?

অ মা! তাও জানস না—কইলকাতায় যে হাবাকালাগো লাইগাও ইস্কুল আছে লো।

ঘন ঘন মাথা নেড়ে স্বর্ণ বলে, না না ভাই, খবদ্দার। হাবাকালা যাই হউক, বড়লোকের মাইয়া। আমরা গরিব, আমাগো কি—

ননী বলে, তুইও যেমন দিদি! ওই ছেমরির কথায়—ধুস!

ননী চলে যেতে সুষমা বলে, দিদি, দুলালের সেই হাবাকালা মোটা কুচ্ছিত বুইনডারে বিয়ার লাইগা দাদা এক্কেরে ক্ষেইপা উঠছে।

হেডার তো বয়সও কম হইল না।

কম! দাদার থেইকা বড় হইব তো ছোট না।

কিন্তু অখনই অর বিয়ার কী হইছে। পাশটাশ করুক—

সুষমা, সুরমা, টুলু পরের বউ হয়ে চলে যাবে। ননী বিয়ে করবে। ফনী বিয়ে করবে। ননী ফনীর ছেলেমেয়েতে ফাঁকা বাড়ি আবার ভরে উঠবে।

আহা, দিনের পর দিন ভবিষ্যতের এই স্বপ্নই না দেখে সুবর্ণ।

সুষমা বলে, আসলে ভাবটাব সব উপরের ঠমক—বুঝলি দিদি, দাদা বিয়া করতে চায় টাকার লেইগা—নগদ দশ হাজার—সেই টাকায় আমার বিয়া দিব, ছুটকির বিয়া দিব, ব্যবসা করব—

স্বপ্নটা তালগোল পাকিয়ে যায় সুবর্ণর।

সুবর্ণ বলে ওঠে, না না—কিছুতেই না। ও বিয়া ননী কিছুতেই করতে পারব না।

টাকার জন্যে একটা হাবাকালা কুৎসিত মেয়ে হবে ননীর বউ? কেন, এখনও তো সুবর্ণ মরে যায়নি? সে থাকতে ননী কেন ভাবে টাকার কথা?

টাকার চেয়ে দামী যে পৃথিবীতে কিছু নেই, সুবর্ণ জানে। সুবর্ণর মত আর কে তা জানে! তাই তো সে মনেপ্রাণে চায় টাকার জন্যে ননীর জীবন যেন ব্যর্থ হয়ে না যায়। শুধু ননী কেন, কারো জীবনই।

ওরা সবাই লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে উঠুক, বিয়ে-থা করে সংসার পাতুক, সুখী হোক—টাকার জন্যে আটকাবে না। সুষমার, সুরমার, এমন কি টুলুর বিয়ের জন্যেও কাউকে ভাবতে হবে না।

দুবার আই-এ ফেল করেছে তো কী হয়েছে, এবার নিশ্চয় ননী পাশ করবে। চেষ্টায় কী না হয়? পাশ করার চেষ্টা তো ননী করছে? এই ঢের।

কিন্তু অত করে বলা সত্বেও দুলালের বোনটাকে বউ করার মতলব ননী ছাড়েনি। ছাড়েনি বলেই দুলালকে এখনও প্রশ্রয় দিচ্ছে।

এবং পায়ে হাত দিয়ে সেদিন সোনামামী বলে প্রণাম করলেও দুলালও বুঝে গেছে যে ভেতরে ভেতরে সুবর্ণ তাকে ক্ষমা করেনি। সে-ও তাই মোক্ষম চাল চেলেছে। নইলে একেবারে সিনেমার টিকিট কাটিয়ে এসে হাজির হয় কোন্ সাহসে?

সুবর্ণ জিজ্ঞেস করে, বর্ধমানে কার কাছে গ্যাছে ফইনা? বর্ধমানে অর চেনাজানা কে আছে?

ডাক্তার গিন্নিরে তার বাপের বাড়ি লইয়া গ্যাছে।

ডাক্তার-কাকী আর মানুষ পাইল না! দুদিন বাদে যার পরীক্ষা—

কী জানি! আমারে কি কেউ কিছু কয়, না মানুষ বইলা মনে করে! কুমড়ো কোটা মুলতুবি রেখে সুভাষিণী ঘুরে বসে। বিনা পয়সার বাঁদী, আমার লগে খালি কাজের সম্পর্ক। আমার শরীর নাই, মন নাই, কিছু নাই। কীভাবে যে আমি সংসার করি মা—

বলতে বলতে সুভাষিণীর গলা ধরে আসে। এইবার হু হু করে চোখে জলের ঢল নামা শুরু হবে। সংসারের বিরুদ্ধে নালিশ কি তার একটা? দুকথায় দশকথা এসে পড়বে। পুরনো পরিচিত কথা।

সুবর্ণ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

তা পোলা ফিরব কবে?

এককথা বার বার ক্যান জিগাস! কইলাম তো—

কইলা তো! কিন্তু সোমবার যার পরীক্ষা—কেউরে কিছু কইয়া যায় নাই?

কী জানি! বলে ঘুরে বসে সুভাষিণী। ফের কুমড়ো কোটা শুরু করে।

মায়ের এই নিরাসক্তিতে শরীর সুবর্ণর রী রী করে ওঠে। সংসারের বিরুদ্ধে আজকাল নালিশের অন্ত নেই সুভাষিণীর। আর, সব নালিশ তার সুবর্ণর কাছে। তার দুঃখ সুবর্ণ ছাড়া কে বুঝবে!

এতদিন সুবর্ণও মনে করেছে, সত্যি। সে শুধু মায়ের বড় মেয়ে নয়—একেক সময় মনে হয় তারা দুজনে যেন দুটি সখী।

এমন হয়। বয়েস হলে বড় মেয়ের সাথে মায়ের সখিত্ব গড়ে ওঠে। অনেক দেখেছে স্বর্ণ। মেয়ের দুঃখ মা ছাড়া যেমন কেউ বোঝে না—তেম্নি মায়ের দুঃখও মেয়ে ছাড়া বোঝে না। সবচেয়ে বেশি বোঝে বড় মেয়ে।

তবে কি স্বর্ণর দুঃখ আর কেউ বোঝে না? বোঝে, খুবই বোঝে। টুলু থেকে অবিনাশ পর্যন্ত সবাই।

তাইত সে এলে বাড়িতে একটা উৎসবের সাড়া পড়ে যায়। মেয়ে নয়, স্বর্ণ যেন কুটুম্ব। গোটা মাছ আসে, রান্নার পদ বাড়ে, হেঁশেল ছেড়ে বেরোবার ফুরসত পায় না স্বভাষিণী।

ক্রাচে ভর দিয়ে বার বার অবিনাশ এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়ায়। নতুন নতুন রান্নার ফরমাস করে। ছেলেবেলায় কী কী খেতে ভালোবাসত সোনা, বাপ হয়েও সব অবিনাশ মুখস্থ করে রেখেছে।

স্বর্ণর তখন কেবলি মনে পড়ে অবনীর কথা। ঢাকা থেকে ছুটিছাটায় দাদা দেশে এলে, এইভাবে তার খাওয়া-নিয়েও ব্যস্ত হয়ে উঠত অবিনাশ।

স্বর্ণ এখন অবনী হয়েছে। তবু কেন মনটা খচখচ করে?

একী মা! ভাদ্র মাসে পিঠা-পায়েস?

পৌষ পর্যন্ত বাঁচি কি মরি!

ধাক্কা মেরে বাটি ঠেলে দেয় স্বর্ণ। খালি মরা মরা আর মরা! ওয়া ছাড়া মুখে কথা নাই। খামু না আমি, যাও।

হাত গুটিয়ে বসে স্বর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া বন্ধ হয়ে যায় ননীদেরও।

খুপরি থেকে চেঁচিয়ে ওঠে অবিনাশ। কী হইল? অ্যাঁ, বলি হইলটা কি! স্বস্থির মত মাইয়াটারে তোমরা খাইতেও দিবা না! কী আক্কেল! মা আমার একমাস বাদে আইছে—যা-তা কইয়া—

জলে তখন স্বভাষিণীর দুচোখ উপচে এসেছে। কইছি! বেশ করছি কইছি! আর আমার সয় না। চোখকানা ভগবানের বিচার আচার আর সইহু হয় না। এই সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা—

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করে স্বভাষিণী।

সুভাষিণীর সেই কান্নায় বড় তৃপ্তি পায় সুবর্ণ। কথায় কথায় মা আজকাল মৃত্যুকামনা করে বলেই না এখনও তাকে মা বলে মনে হয়। নইলে এই তিনদিন সুভাষিণীও যদি টুলুর মত আনন্দে ডগমগ হয়ে থাকত—সুবর্ণ কি খুশী হত?

দাদার জায়গাটা দখল করলেও সত্যিই তো অবনী হয়ে ওঠেনি সুবর্ণ!

ঘাড় হেঁট করে সবাই ভাত ঘাঁটাঘাঁটি করছে, শুধু টুলু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। দেখে বড মায়া হয় সুবর্ণর। মাসের মধ্যে এই তিনদিন একটু ভালোমন্দ খাওয়া—সুবর্ণ কি ওদের বঞ্চিত করবে? সে যদি এখন না খেয়ে উঠে যায়, আর কাউকেই কি সুভাষিণী খেতে দেবে? সবকিছু লাথি মেরে ছড়িয়ে ফেলে ফিট হয়ে যাবে না!

ভগবানের বিরুদ্ধে, সংসারের বিরুদ্ধে, সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে কেন নালিশ থাকবে না সুভাষিণীর? সুবর্ণর মা নয় সে?

মরার কথা সুবর্ণ ভুলেও মনে স্থান দেয় না—মরা তো মানুষের হাতের পাঁচ—কিন্তু মায়ের ফিট হওয়া দেখে তারও কি সাধ যায় না মাঝে মাঝে অমন ফিট হয়ে যেতে? সাময়িকভাবে মরে থাকতে? দেহটাকে বজায় রেখে মনটাকে বাতিল করে দিতে?

এতদিন মার নালিশ শুনে কান্না দেখে মন ভরাবার জন্যে মাকে আরও উস্কে দিয়ে এসেছে সুবর্ণ, আজ কিন্তু সুভাষিণীর ব্যবহারে সে চটে যায় ভয়ানক। কী স্বার্থপর মা! নিজের দুঃখটাই বড় মার কাছে। সংসারে সবাই যেন রাজার হালে আছে!

বিরক্ত হয়ে সুবর্ণ উঠে পড়ে।

স্বামীকে ছেলেকে রেঁধে খাওয়ালেই যেন সব কর্তব্য শেষ হয়ে গেল। ও কাজ তো কয়েক টাকা মাইনের এক অনাথা বিধবা দিয়েও চলে। বলা উচিত নয়, মার যদি কিছু হয়, বাড়ি থেকে রান্নার পাট উঠে যাবে?

ছেলেমেয়ের ভালোমন্দই যদি না দেখতে পারবে, মা হয়েছে কেন? অমন করে 'কী জানি' বলতে লজ্জা করে না?

স্বামী-ছেলেমেয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ সুভাষিণীর যতই থাক, সুবর্ণ জানে, মার অবাধ্য তার ভাইবোনেরা নয়। রাগারাগির সময় মুখে যাই বলুক, অবিনাশও স্ত্রীকে যথেষ্ট সমীহ করে চলে।

ছেলেমেয়েরা অবাধ্য হলে, স্বামী বশে না থাকলে মেয়েমানুষের অবস্থা যে কী হয়—সেন-গিন্নিকে দেখেও কি তা বোঝেনি মা ?

এলানো চুলে খোঁপা বাঁধতে গিয়েই সুবর্ণর খেয়াল হয়, রোখের বশে কাপড় ছাড়বার সময় মাথায় ঘটি ঘটি জল ঢেলেছে, ঘষে ঘষে সিঁথি শাদা করে ফেলেছে—এ অবস্থায় এখন বাবার সামনে যায় কী করে ? তার কথার জবাব ভুলে গিয়ে অবিনাশ কি হাঁ করে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকবে না ? চওড়া করে সিঁদুর পরলে লক্ষ্মীপ্রতিমার মত দেখায় যে-মেয়েকে ?

লক্ষ্মীপ্রতিমার মত ! কথাটা হঠাৎ কানে বাজে সুবর্ণর। আট বছরের পুরনো কথাটা।

বিয়েতে অবনীর মত ছিল না। সুভাষিণী দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। আত্মীয়-স্বজনের অনেকেও ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিতে পারেনি।

নগেন জ্যাঠা তো স্পষ্টই বলেছিল—হোক নিকুঞ্জ চৌধুরীর শালার বন্ধু, কিন্তু অচেনাঅজানা মানুষ তো ? কলকাতায় চাকরি করে, সংসারের কোন দায়-দায়িত্ব নেই, দেখতে-শুনতে চৌকশ, দাবিদাওয়াও কিছু মেটাতে হবে না—সবই ভালো—কিন্তু হুট করে বিয়ে ? এ কেমন কথা !

বেশ তো, বাঙাল দেশ যদি পছন্দ হয়ে থাকে কলকাতার ছেলের, বাঙাল মেয়ে বিয়ে করার অতই যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে—আরেকবার না হয় আসবে কষ্ট করে। বন্ধুর দেশে বেড়াতে নয়—একেবারে বর সেজে। সারা গাঁয়ের লোক জামাই আদর করবে। যেমন করে থাকে।

এদিকে দুদিন অন্তত সবুর করুক অবিনাশ, একটু ভাবুক, বিচার-বিবেচনা করে দেখুক কলকাতার ছেলের এই চোখের নেশাটা শুধু চোখেরই নেশা কিনা।

মেয়ে তো তার গলায় আটকে নেই। বয়েস উনিশ হলেও, চোদ্দ-পনেরোর বেশি কি দেখায় স্বর্বর্ণকে?

কিন্তু কারো কথায় অবিনাশ কান দেয়নি। দেবে কেন, মত চাইতে মেয়েই যখন 'আমি জানি না' বলে সামনে থেকে পালিয়ে গেছে, আর তার কাকে তোয়াক্কা।

কলকাতা দেখার সাধ স্বর্বর্ণর ছেলেবেলা থেকে। গরিব ইস্কুল মাস্টার অবিনাশ। মেয়ের সে-সাধ সে মেটাতে পারল না। জীবনেও হয়ত পারবে না। তাই না ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। নইলে গল্প-উপন্যাসে ছাড়া এমন বিয়ের কথা কেউ শুনেছে কখনও? এ বিয়ে ভগবানের বিধান।

ভগবানের বিধান!

স্বর্বর্ণরও তাই মনে হয়েছিল। জীবনে একবার শুধু কলকাতা দেখা নয়, জীবনভর কলকাতার বউ হয়ে থাকা!

এই গাঁ ছেড়ে যেতে অবশ্য তার খুবই কষ্ট হবে—কিন্তু আজ হোক কাল হোক একদিন তো এই সবের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে তাকে যেতে হবেই।

দেরি করলে নারায়ণগঞ্জের সেই লোকটা যদি পছন্দ করে বসে?

ঢাকার গায়ে নারায়ণগঞ্জ। কলকাতার মত না হোক ঢাকাও মস্ত শহর। গত কদিন তাই নারায়ণগঞ্জের লোকটিকে নিয়েই জেগে-ঘুমিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছে স্বর্বর্ণ। চিঠি এখন পর্যন্ত না এলেও মনকে সান্ত্বনা দিয়েছে—হাজার হোক দাদার বন্ধু, সে কি স্বর্বর্ণকে অপছন্দ করতে পারে? চিঠি আসছে না হয়ত ডাকের গোলমালে। দাদার আসার চিঠিই কি অনেকবার দাদা এসে চলে যাওয়ার পরে পৌঁছোয় না?

এখন স্বর্বর্ণর হঠাৎ খেয়াল হয়—নারায়ণগঞ্জের লোকটার সামনের দাঁতগুলি কী উঁচু-উঁচু! কী প্রকাণ্ড জোড়া ভুরু! কেমন রাক্ষুসে-রাক্ষুসে চেহারা! যেমন হাঁ করে তাকে দেখছিল, খাচ্ছিলও তেমনি গোগ্রাসে। চালচলনে যদি কোন ছিরিছাঁদ থাকে। নামেই শহরের চাকুরে, আসলে গেঁয়ো একেবারে।

আর কলকাতার এই মানুষটি—!

আশ্চর্য! উনি কী করে তাকে দেখলেন? সুবর্ণর তো ধারণা ছিল চিনুদের বাড়ি গিয়ে সে-ই শুধু আড়াল থেকে ওঁকে দেখেছে। দেখে আর চোখ ফেরাতে পারেনি। চমকে উঠেছে চিনুর চিমটি খেয়ে।

কদিন অতিকষ্টে সুবর্ণ মনের খুশি লুকিয়ে রাখলেও বিদায় নেবার সময় কিন্তু কান্না চাপতে পারে না।

ফনীকে কাছে টানা মাত্র বুকটা হু হু করে ওঠে। ফনীকে ছেড়ে সে থাকবে কি করে! ফনীকে ছেড়ে সে বাঁচবে কি করে! কেন এ কদিন ফনীর কথাটা তার একবারো মনে পড়েনি!

তার কান্নায় ফনীও ডুকরে ওঠে। মুখে আঁচল দিয়ে ফোঁপায় সুভাষিণী। তাই দেখে ননী, সুষমা, সুরমাও একসাথে কান্না জুড়ে দেয়। নতুন বউ বৌদি পর্যন্ত। একা অবনী সবাইকে সামলাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যায়।

মৃদু ধমক দিয়ে গাঢ় গলায় অবিনাশ বলে, কাঁদে না, কাঁদে না—শুভদিনে কাঁদতে নাই গো কাঁদতে নাই। আমারে ছাখনা—আমি কাঁদতাছি? ভুমুঠ চাউল দিয়া মা আমার সব ঋণ শোধ কইরা গেল—তাওনি কাঁদছি? এমুন লক্ষ্মীপ্রতিমার দিকে চাইলে কাঁদন যায়? ওগো, সিঁদুরটা আরও চওড়া কইরা দাও, মাথা ভইরা মায়ের সিঁদুর দিয়া দাও। মায়ের আমার এই রূপ য্যান অক্ষয় থাকে!

আয়নাটা একেবারে মুখের কাছে এনে সিঁদুর পরে সুবর্ণ। কলঘরে যেমন আঙুলে গামছা জড়িয়ে ঘষে ঘষে সিঁদুর তুলেছিল, এখন তেমনি চিরুনির ডগায় সিঁদুর নিয়ে আপ্রাণ সিঁথিতে ঘষে।

সিঁদুরের বদলে এক পোঁচ চামড়া তুলে ফেলে সিঁথিটাকে যদি রক্তাক্ত করে ফেলতে পারত! বার বার সিঁদুর পরা ঘুচিয়ে দিত!

সুবর্ণ ঘরে ঢোকা মাত্র অবিনাশ ক্রাচে হাত দেয়।

বলে, চল মা, আমার মাথাটা একটু টিইপা দিবি চল। বিকাল থেইকা বড় ভার হইয়া আছে!

সুবর্ণ ঠিক করেছিল, ঘরে পা দিয়েই বাবার হাতে টাকা দিতে দিতে ফনীর কথা জিজ্ঞেস করবে। কেন তিনি ফনীকে বর্ধমানে যেতে দিলেন? ফনীর কথা শেষ হতে না হতেই সুষমার কথা। দুলালের সাথে কেন তিনি সুষমাকে সিনেমায় যেতে দিলেন?

দরকার হলে এ নিয়ে একটু রাগারাগি করতেও ছাড়বে না।

সকলের সামনে টাকা দিতে দিতে এরকম কৈফিয়ত চাওয়া দৃষ্টিকটু দেখায়? দেখাক। সব ব্যাপারে চক্ষুলজ্জাকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। এটুকু কৈফিয়ত চাওয়ার অধিকারও কি সুবর্ণর নেই? বাবা যদি কিছু মনে করেন, সুবর্ণ না হয় তখন ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলবে।

দরকার মত কান্না-হাসির অভিনয়টুকুর ক্ষমতা সুবর্ণর আছে।

সুবর্ণ তাজ্জব হয়ে যায় অবিনাশের ব্যবহারে। বিনা অভিনয়ে বিনা ভূমিকায় কীভাবে অবিনাশ টেক্কা দিয়ে গেল!

সে এড়াতে চাইলে কি হবে, কথা তো শুধু তার নয়, অবিনাশেরও আছে। এমন কথা যে ননীদের সামনে বলা যায় না।

ক্রাচে ভর দিয়ে ঠুকঠুক করে এগোয় অবিনাশ। আয়, আমার ঘরে আয়।

মরিয়া হয়ে সুবর্ণ বলে, টাকাটা—

ক্রাচ বগলে চেপে ফিরে দাঁড়ায় অবিনাশ। নিঃশব্দে হাত বাড়ায়।

সুবর্ণ ভড়কে যায়।

অবশ্য আজকাল আর বাবার হাতে সরাসরি টাকা তুলে দিতে সুবর্ণর দ্বিধা জাগে না। অবিনাশের হাতও থরথরিয়ে ওঠে না।

কিন্তু এমন অবলীলায় তো কখনও হাত পেতে টাকা অবিনাশ নেয় না। 'থাউক না অখন। তারপর তর শরীরগতিক কেমুন ক শুনি? সেই অম্বলের ব্যথাটা—' বলার ফাঁকে ফাঁকে ডান হাতে টাকা নিয়ে বাঁ হাতে সে চালান করে দেয়।

সুবর্ণ একটু অদৃশ্য হাসে : শরীর যে তার সজুত আছে, হাতে-হাতেই কি প্রমাণ দিল না ? অম্বলের রোগ তার ভালো হবার নয় বুঝে ছমাস আগেই কি সে বলেনি যে ভালো হয়ে গেছে একেবারে ?

বাঁ হাতে টাকা লুকিয়েও অবিনাশের অস্বস্তি যায় না। হর্দম কথার খেই হারিয়ে ফেলে। মুখ ফেরায় না—না তাকিয়েও বুঝি টের পেয়ে যায় তারই মুখের দিকে মেয়ে চেয়ে আছে অপলক। শেষ পর্যন্ত টাকাগুলি নিরাপদে রেখে আসার ছলে উঠে পালায়।

বাপকে অস্বস্তিতে ফেলতেই চায় সুবর্ণ। কিন্তু বিকলাঙ্গ দেহটাকে টেনে-হিঁচড়ে অবিনাশের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে বেদনায় মনটা তার টনটন করে ওঠে হঠাৎ : কী অবুঝ সে ! কী অবুঝ ! তার এই অক্ষম অসহায় বাবার ওপর সে অভিমান করে বসে আছে ? এমনই মারাত্মক অভিমান যে কখন সেটা আক্রোশ হয়ে দাঁড়িয়েছে টেরও পায়নি ?

এই টাকা নেওয়া নিয়েই প্রথমবার কী কাণ্ড !

প্রথমে আর বাড়ি আসবে না ঠিক করেও পরে 'দেখাই যাক না আমায় দেখে সবাই কী করে' ভেবে রওনা হয়েছিল। আসতে আসতে 'বাড়িতে পা দিয়েই বাবার হাতে টাকা তুলে দেব' স্থির করেছিল।

কিন্তু যাবার সময় ছাড়া টাকা দিতে পারেনি। দিই-দিই করে কতবার টাকা-ভরা খামটা সুটকেশ থেকে বার করেছে, বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে হাত ওঠেনি।

তিনদিন পরে যাবার সময় প্রণাম করে বাপের পায়ের সামনে খামটা রেখেছিল।

কী রে ?

টাকা। পাছে অবিনাশ না শুনতে পেয়ে থাকে, অস্ফুট পুনরুক্তি করে সুবর্ণ, টাকা।

টাকা ! ছিটকে সরে যেতে গিয়ে তক্তাপোষে হুমড়ি খেয়ে পড়ে অবিনাশ। টাকা ! টাকা ! মা আমার টাকা উপায় কইরা আনছে—ওগো শুনছনি ! ও টাকা তর মারে দে। আমি তো মড়া—আমি তো অপদাখ। ওকি—তুমি

চললা ক্যান—নাও, নাও, রাইখা দাও—তোমার লক্ষ্মীর পটে ছোঁয়াইয়া রাখো। টাকা! টাকা! মা আমার—

বালিশে মুখ থুবড়ে একটানা আবোলতাবোল বকে অবিনাশ। হুমড়ি খেয়ে স্বামীকে পড়তে দেখেও নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় সুভাষিণী।

ঘরের মধ্যে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ননী, ফনী, সুষমা, সুরমা।

টুলু বলে, এমা পিশি করলা কি! টাকানি পায়ে ঠ্যাকায়! নাও—শিগগীর নমো করো।

তাড়াতাড়ি খামটা সে তুলে ধরেছিল।

তারপর অনেকদিন বাবার হাতে টাকা দেয়নি সুবর্ণ। কুলুঙ্গিতে চাপা দিয়ে রেখেছে। যাবার সময় মাকে জানিয়ে গেছে।

সরাসরি টাকা দিচ্ছে বাড়ি বদলানোর পর। এ বাড়িতে উঁচু কুলুঙ্গি না থাকার অজুহাতে।

অজুহাত ছাড়া কি? বাড়ি বদলানোর ফলে বাড়ি ভাড়া মাত্র পাঁচ টাকা বাড়াতেই টাকার ভয়ানক টানাটানির কথা কি বার বার শোনায়নি অবিনাশ? বলেনি কি, ফ্রি না হলে ফনীর পড়া বন্ধ করে দিতে হবে? দাসনগর না কোথাকার এক কারখানায় ননীকে চাকরি নিতে হবে? শাড়ির অভাবে সুরমার ইস্কুলে যাওয়া জলাঞ্জলি দিতে হবে? সুষমার সেলাইয়ের সুতোও জুটবে না? টুলুর—

পাঁচ টাকার বাড়তি খরচের জন্যে সব ওলোট পালোট! মনে মনে হেসেছিল সুবর্ণ। সামনের মাস থেকে পঁচিশ টাকা বেশী দেবে বলে আচমকা বাপের হা-হুতাশ থামিয়ে দিয়েছিল। এবং পরের মাসেই টাকা দিয়েছিল সরাসরি অবিনাশের হাতে।

নইলে কুলুঙ্গি নেই তো কি হয়েছে, সুষমার হাতে টাকা দিতে পারত না? সুরমার হাতে পারত না? ননীর হাতে?

তখন আর ভাইবোনের হাতে টাকা তুলে দিতে আপত্তি কি ছিল?

কলকাতা থেকে হাওড়ায় আসতে হয়েছিল কি সাধে? পাড়ায় পাঁচ কথা হতে কোন্ এক বন্ধুর মারফত ননীই না হাওড়ার বাড়ি ঠিক করেছিল?

শুধু টাকার জন্যে অবিনাশের কাঁদুনি নয়, মালার কথা শুনে বেয়াড়া একটা কৌতূহলও চাড়া দিয়ে উঠেছিল স্ববর্ণর মনে : সবকিছুই যখন সহজ হয়ে গেছে, হাত পেতে টাকাটাও অবিনাশ সহজভাবে নিতে পারবে কি? নাকি সেদিনের মত আজও চমকে উঠবে? ক্রাচ ফসকে হুমড়ি খেয়ে পড়বে?

চমকে ওঠা দূরে থাক, 'থাউক না অখন। তারপর তর শরীরগতিক কেমুন ক শুনি? সেই অম্বলের ব্যথাটা'—বলার ফাঁকে ফাঁকে অনায়াসে অবিনাশকে হাত বাড়াতে দেখে নিজের বেয়াড়া কৌতূহলের জন্যে হঠাৎ বাপের হাত থেকে ক্রাচটা ছিনিয়ে নিয়ে দড়াম করে নিজের মাথায় প্রাণপণে একটা বাড়ি কষিয়ে দিতে ভয়ঙ্কর একটি ইচ্ছা ঘাই দিয়ে ওঠে স্ববর্ণর মনে।

যাই বলুক মালা, স্ববর্ণ জানে, ভেতরে ভেতরে বাপ তার তেমনি আছে—তবে কেন অবিনাশ হাত পেতে টাকা নিল?

সহজ ব্যাপারটা সহজতর করার জন্যে? পাছে ওই টাকা নেওয়া নিয়ে মনটা স্ববর্ণর খচ করে ওঠে?

কিন্তু অবু মাস্টার কি ভাবতে পারবে—সবকিছু ভুললেও বাবার এই হাত পেতে টাকা নেওয়াটাকে স্ববর্ণ কিছুতেই ভুলতে পারবে না? কোনদিনও না? ভবিষ্যতে ভোলার দিন এলেও না? বাবা মারা গেলেও না?

বাবার মরা মাথাটা কোলে নিয়ে সেদিন শোক করতে বসেও মনে পড়বে—বাবা তাকে সত্যিই বড় ভালোবাসত। বড় ভালবাসত! কিন্তু-হাত পেতে টাকা নেওয়ার পর কথার খেই হারিয়ে কাছ থেকে উঠে গেলেও—কেন বাবা সরাসরি তার হাত থেকে টাকা নিত? কেন এত অসহ্য বোকা ছিল তার অবু মাস্টার?

অবিনাশের আজকের বোকামিতে স্ববর্ণ স্রেফ তাজ্জব বনে যায়। টুলু, সুরমা, ননী চেয়ে আছে বলে সে খানিক ইতস্তত করাতে অবিনাশ কিনা টাকাগুলি তার হাত থেকে বেকসুর ছিনিয়ে নিল? নয় ছিনিয়ে নেওয়া? স্ববর্ণ মুঠো আলগা করার আগেই কি টাকাগুলি বেহাত হয়ে যায়নি?

স্বর্ণ শোবার ঘরে ঢুকছিল, অবিনাশ তাড়াতাড়ি বলে, ওহানে না, এহানে আয়।

আন্নারে নিয়াসি।

ক্যান? ওডারে দিয়া কী হইব?

কাঁদে শোন না। ঘুম ভাইঙ্গা—

অর মারে ডাইকা দে।

রান্না ফেলাইয়া মা অখন পোলা সামলাইব!

তাইলে ছুটকিরে ক।

পড়া থুইয়া ছুটকি—

তয় মরুক হারামজাদী গলা চিরা্যা। তুই চইলা আয়।

অবিনাশ নিজের খুপরিতে ঢোকে। টিন দিয়ে বারান্দার খানিকটা ঘিরে নিজের আলাদা ব্যবস্থা করে নিয়েছে অবিনাশ। ঝাঁপ ভেজিয়ে দিলে দিনের বেলাতেও খুপরিটা অন্ধকার হয়ে ওঠে। দম আটকে আসে।

তা হোক অন্ধকার, আসুক দম আটকে—এই অবিনাশের ভালো। আন্না হওয়ার পর থেকে সে শোবার ঘরের দরজা মাড়ায় না।

আন্নাকে কোলে নিয়ে এসে দাঁড়ায় স্বর্ণ।

অবিনাশ গজ গজ করে, মানা করলাম, শুনলি না। আপদটারে ক্যান আনলি! অখ্খনি তো কানের কাছে চিক্‌কইর শুরু করব।

স্বর্ণ বলে, পেট ভরা, কাঁদব না। তুমি শোও—আমি মাথা টিইপা দেই।

গজ গজ থামে না অবিনাশের। হাতড়ে হাতড়ে সে তক্তাপোষের তলা থেকে হুঁকো বার করে। দেশলাই জ্বেলে কাঁপা কাঁপা হাতে টিকে ধরায়। কলকিটা একেবারে মুখের কাছে এনে চোপসানো গাল ফুলিয়ে ফুঁ দেয়।

টিকের আগুনে থেকে থেকে অবিনাশের ভাঙাচোরা মুখে বসানো ঘোলাটে চোখ দুটি অমানুষিক জলজল করে। আগুনের ফুলকি এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ে। সেই সঙ্গে চোখের মণি দুটোও যেন ছিটকে বেরিয়ে যাওয়ার মওকা খোঁজে।

খোঁচা মেরে আন্নাকে কাঁদায় স্বর্ণ। অবিনাশ নির্বিকার ভাবে টিকেয় ফুঁ দিয়ে চলে।

স্বর্ণ বোঝে, আন্নাকে কোলে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেও ফল হল না। আন্নাকে কাঁদাতেও না। টিকেয় ফুঁ দিতে দিতে অবিনাশ নিজেকে তৈরী করে নিচ্ছে, মনের দ্বিধা ফুঁ দিয়ে দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে, আর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই : বাপের কথাগুলি তাকে শুনতেই হবে।

বেশ, বলুক অবিনাশ তার যা বলার আছে। সে-ও তৈরী। ব্যাপারটা তো গোপন কিছু নেই—সকলের সামনেই মানুষটা যখন মেজাজ দেখিয়ে গেছে ?

কেন মিছে এত ইতস্তত করছে অবিনাশ ? তবে কি জামাইকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে বাপ এখন মুখ তুলে চাইতে পারছে না মেয়ের দিকে ?

স্বর্ণ বলে, তুমি ঠিক করছ বাবা।

ঠিক করছি। অবিনাশ চমকে ওঠে, কিয়ের কি ঠিক করছি ? অ্যাঁ ?

মা আমারে কইছে।

কইছে ? অ !

আনমনে অবিনাশ হুঁকো টেনে যায়। ধোঁয়া না এলেও হাঁ করে নিশ্বাস ছাড়ে। নিঃশব্দে উদাসভাবে।

এখানতরি আইসা মেজাজ দেখায় ! আমি থাকলে—

না মা, মেজাজ হে আগে ছাখায় নাই।

ছাখায় নাই ?

আগে ছাখায় নাই। ফিরাইয়া লইতেই আইছিল—তরে ফিরাইয়া লইতেই—

তাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিল ? এতদিনে ? এতগুলি বছর বাদে ?

এতগুলি বছর বাদে বলেই ভুজঙ্গ তাহলে বদলে গেছে ? মানুষও তাহলে বদলায় ? ভুজঙ্গর মত মানুষও ? নিজে থেকে তাই সে খোঁজ নিয়ে এসেছিল ? ইচ্ছে করলে তো ঠিকানা পাওয়া কিছু অসম্ভব নয় তার পক্ষে। দুলালের মামার বন্ধু যখন।

মিছেই স্বর্ণ তবে দুলালকে সন্দেহ করেছিল।

রান্নাঘরে বোধ হয় কান খাড়া করে ছিল সুভাষিণী। খুন্তি হাতেই সে একরকম দৌড়ে আসে।

তাইলে যে তুমি কইলা—

অবিনাশ ধমকে ওঠে, তুমি আইলা কী করতে?

জামাই আইল মাইয়ারে নিতে—

আঃ! হে কথায় তোমার কি কাম? যাও তুমি এহান থেইকা। যাও কইতাছি! গ্যালানি!

যামু! ক্যান যামু! জামাই আইল মাইয়ারে নিতে, আর তুমি তারে অপমান কইরা—

হ, করছি অপমান। আমি তারে অপমান কইরা ভাগাইয়া দিছি। দিমু না! একশবার দিমু। হাজারবার দিমু। যতবার আইব ততবার দিমু। এবার আইলে এক্কেরে গলা ধাক্কা দিয়া জুতা মাইরা তাড়ামু। হারামজাদা শয়তান—

সবতেই তোমার—

হ, সবতেই আমার জিদ। আর কিছু শুইনবার চাও? অখন ভালোয় ভালোয় যাইবা, না হুক্কা ছুঁইড়া মারন লাগব?

সুবর্ণ মাকে ঠেলে দেয়। যাও মা, তুমি যাও। আমার লগে কথা হইতাছে, তুমি আইলা ক্যান।

ফোঁস ফোঁস করতে করতে সুভাষিণী চলে যায়। সে চলে যেতেই শান্ত হয়ে যায় অবিনাশ। আনমনে তামাক টেনে চলে। তার এই অতি সাধের তামাক টানাতেই যেন বাধা দিতে এসেছিল সুভাষিণী।

অন্ধকারেও বাবার মুখখানা এতক্ষণ দিনের আলোর মত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল সুবর্ণ। বাপের মুখখানা তো সে জন্ম থেকে দেখছে, চোখ বুজলেও চোখে ভাসে—কিন্তু ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় এখন সেটা বড় ঝাপসা দেখায়, অচেনা-অচেনা মনে হয়। আজকাল কী সহজে দপ করে রেগে উঠতে, সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই রাগকে অবলীলায় ধোঁয়া করে উড়িয়ে দিতে পারে অবিনাশ!

জানস, চৌধুরীগো পোলা এর পিছনে আছে?

দুলাল ?

হ। হুঁকো থেকে মুখ সরিয়ে ফের হুঁকোতেই ঠোঁটটা একবার ঘষে নিয়ে অবিনাশ বলে, আগে আমি অত বুঝি নাই। ঢুক্যাই উবুড় হইয়া প্রণামের যা ঘটা। হড়হড় কইরা নিজের দোষ কবুল কইরা গেল—অর বিধ্‌বা বৌদিটা আছিল নষ্টের গোড়া, এইবার মাগী গলায় দড়ি দিয়া মরছে—

শৈল মরে গেছে ? চমকে ওঠে সুবর্ণ। নিজেকে শৈল মেরে ফেলেছে ?

শৈলই যত নষ্টের গোড়া সন্দেহ নেই।

কলকাতায় আসার পর একটি দিনও কি সে না কাঁদিয়ে ছেড়েছে সুবর্ণকে !

উঠতে-বসতে খোঁটা দিয়েছে ভুজঙ্গকে। আইন-আদালতের ভয় পর্যন্ত দেখিয়েছে।

কলঙ্কের পরোয়া শৈল করে না। কলঙ্ক শুধু কি শৈলর একার ? ভালো চায় তো বাঙাল ছুঁড়িকে এখনও বাড়ি থেকে বার করে দিক ভুজঙ্গ। সুবর্ণর চেয়ে রূপ-যৌবন কোন্ দিক থেকে খাটো শৈল ? বাপ হওয়ার বাই জেগেছে ? কেন, বিধবা বিয়ে কি আজকাল হয় না ? নিজে থেকেই শৈল কি লজ্জার মাথা খেয়ে বিয়ের কথা বহুবার বলেওনি ? তখন তো বড় গদগদস্বরে বলা হয়েছিল, জীবনে ভুজঙ্গ বিয়েই করবে না। ছেলেপুলের ঝঞ্ঝাট ভুজঙ্গ সইতে পারবে না। কী দরকার বিয়ের ! ভালোবাসার চেয়ে কি বিয়ে বড় !

তার কাছ থেকে ভুজঙ্গকে ছিনিয়ে নিয়েও আত্মঘাতী হতে হল শৈলকে ?

শৈল আত্মঘাতী হয়েছে বলেই রেহাই পেয়ে ভুজঙ্গ এবার সুবর্ণর কাছে ছুটে এসেছিল ?

অবিনাশ বলে, নতুন কইরা ফের ঘর-সংসার করতে চায়। তাই দুলাল কওয়ামাত্র—দুলাল শুইনাই আমার হুঁশ হইল। বুঝলিনি—দুলাল হারামজাদার বদমাইসিটা ? সব জাইনা শুইনা হারামজাদা চালাকি খেলছে।

মানুষটারে তুমি ভাগাইয়া দিয়া ঠিকই করছ বাবা ?

ক—তু-ই ক মা। কিছু অন্যায় করছি ? জামাই আইছিলেন শ্বশুরের বেইজ্জত কইরা মজা দেখনের লাইগা। নাইলে ননীরে কয়, তোমার দিদিরে

ডাকো দেখি ভাই, বাবার সামনেই অর হাতে ধরে ক্ষমা চাই ?—জাইনা শুইনা, বুঝলি মা, জাইনা শুইনা—

ঘাড় নেড়ে সায় দেয় স্বর্ণ।

একবার মনে হয়েছিল বটে, বদমাইসি করে লেলিয়ে দিলেও দুলাল হয়ত সব কথা বলেনি। বলতে পারেনি বলেই বলেনি। হাজার হলেও মামার বন্ধু।

কিন্তু এখন মনে হয় বাপ মরার পর রাতারাতি যেমন পাখা গজিয়েছে দুলালের, মামার বন্ধু বলে কি আর রেয়াত করেছে ? নিজে না বললেও দুদিনে ভুজঙ্গ টের পেয়ে যাবে জেনেই ঠিকানা দিয়েছে।

সবই বলেছে দুলাল। সে সব বলেছে বলেই মুখ ফুটে শৈলর কথা বাবাকে বলতে আটকায়নি ভুজঙ্গর।

শৈল ! শৈলর অজুহাত নেহাতই অজুহাত।

ননীর হাত ধরে মেসে গিয়ে খোঁজ নেবার সময় মেসের লোকেরা বলেছিল, আরেকটি মেয়েমানুষও দিন সাতেক আগে ভুজঙ্গর খোঁজ করে গেছে। সে-ও পরিচয় দিয়েছিল ভুজঙ্গর বৌ বলে। ভুজঙ্গ তখন মেসে ছিল না, ফিরে সেকথা শোনে, শুনেই বাড়ি যাচ্ছি বলে হিসেবপত্র চুকিয়ে চলে যায়। কিন্তু বাড়ি সে যায়নি। কারণ, গতকাল আবার এসেছিল ভুজঙ্গর সেই বউ। ভুজঙ্গ নেই শুনে প্রথমে বিশ্বাসই করেনি। যাবার সময় যা-তা বলে গেছে।

স্বর্ণর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেও ভুজঙ্গকে ধরে রাখতে শৈলও পারেনি।

এবং সব জেনেই এসেছিল ভুজঙ্গ। জেনেশুনেই তার ভাইকে বলেছিল ভেতর থেকে তাকে ডেকে আনতে।

অর ন্যাকামি দেইখ্যা। মাথায় খুন চাইপা গেল চিৎকার কইরা কইলাম, অরে বান্দর, অরে শয়তানের বাচ্চা শয়তান—কইলকাতাইয়া শয়তান—বাইরও তুমি বাড়ি থেইকা। আমার লগে ইয়ারকি মাইরাবার আইছ ! তর বউয়ের খবর আমি কি জানি রে হারামজাদা ! বিয়া দিছি মাইয়া পর হইয়া গেছে। ব্যস ! মাইয়ার লগে আর আমার—

হঠাৎ তামাক টানার কথা মনে পড়ে যায় অবিনাশের।

অবিনাশ শেষ না করলেও কথার শেষটুকু বুঝতে বাকি থাকে না সুবর্ণর। মাথায় খুন চেপে যাওয়ার মত যে-কথা দরকারের সময় ভুজঙ্গকে বলেছিল, এখন কি তার সামনে তা উচ্চারণ করা যায়? সুবর্ণর নোটের বাণ্ডিলটা এখনও ওই ফতুয়ার পকেটে ফুলে আছে না?

তুমি ঠিক করছ বাবা।

তুই কইতাছস? কইতাছস? শুইনা বড় শান্তি পাইলাম মা। কদিন থেইকা মনটা আমার—

বাধা দিয়ে সুবর্ণ বলে, খাইতে যাও বাবা। মা বুঝি ডাকে।

আন্না ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিছানায় তাকে শুইয়ে দিয়ে নিজেও পাশে শুয়ে পড়ে সুবর্ণ।

অন্যান্য দিন খাবার সময় সামনে তাকে বসতে হয়। সোনা-মা সাধাসাধি করে না খাওয়ালে খেয়ে অবিনাশের পেট ভরে না।

বড় পিশির হাতে খাবে বলে হাত গুটিয়ে থাকে টুলু।

তাই দেখে হিংসেয় জ্বলে ফনী। দিদির হাতে খাওয়া ছিল একচেটে অধিকার যে-ফনীর। এখন বড় হয়ে গেছে বলে লজ্জা পায় বটে, কিন্তু তারই সামনে বসে দিদি আর কাউকে খাইয়ে দিচ্ছে—অসহ্য।

লজ্জাও করে না! ওয়াক্! পরের হাতে খায়!

পিশি বুঝি পর!

পিশি পর হইব কোন্ দুঃখে—তুমি বুড়া ধাড়ী হইচ না! শাড়ি পরনের লেইগা বায়না ধরছিলা, আর অখন—

ফনীর পেছনে লাগে সুরমা, আর আপনে যে মশয় দিদির গলা জড়াইয়া কোলে মুখ থুইয়া শুইয়া আছিলেন? উনি আবার কেলাসের ফার্স্টো বয়! রও না, তোমার বন্দুগো কইয়া দিমু।

ফনীর পক্ষ নিয়ে সুরমাকে খোঁচা দেয় ননী, অখন তো বেশ কথা ফুটছে ছুটকি-রাণীর! তয় পড়ার সময় ঢুলছিলেন ক্যান? জানস, ছুটকি ক্লাসে পড়া পারে না।

না পারে না! কাউয়া আইসা তর কানে কানে কইয়া গেছে! মিছা কথা দিদি, আমি বলে রোজ পড়া পারি—নারে টুলু ?

ভাত মুখে টুলু ফ্যালফ্যাল করে তাকায়—একবার ননীর দিকে, একবার সুরমার দিকে।

সুষমা বলে, টুলুরে সাক্ষী মানস ক্যানলো ছুটকি। তরে কি টুলুর ক্লাসে নামাইয়া দিছে ? কই, হে কথাডা তো এ্যাদ্দিন কইস নাই।

প্রতিবাদ করতে গিয়ে বিষম খায় সুরমা।

সুভাষিণী বলে, আঃ! দিনরাত খালি পড়া আর পড়া। মাইয়া মাইন্‌ষের পাশ কইরা কি পাখা গজাইব ? আমার ছুটকি যা পড়ে—

মার সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে দেয় ননী।

মাঝে পড়ে থামায় সুবর্ণ।

ভাইবোনের পড়া নিয়ে ননীর অত মাথা ঘামানোর মানে সে বোঝে। সত্যিই, পড়াশোনা করে ওরা মানুষ না হয়ে উঠলে চলবে কেন ? নিজে এক সময় নামকরা ইস্কুল মাস্টার থাকলেও আজকাল কি ছেলেমেয়েদের পড়ার সময় ধারে-কাছে থাকে অবিনাশ ? সকালে সে কাগজ পড়তে যায় ডাক্তার-কাকার ওখানে, সন্ধ্যেয় মোড়ের বাড়িতে দাবায় গিয়ে বসে। কাজেই ভাইবোনের অভিভাবক হয়ে উঠতে হয়েছে ননীকে। ওদের সম্পর্কে যা-কিছু নালিশ সব সে জমা করে রাখে সুবর্ণর জন্যে। সংসারের আসল অভিভাবক যে সুবর্ণ।

এই বয়েসে অত নিচু ক্লাসে পড়তে লজ্জা করে সুষমার। তাই সে দিদির হাতে-পায়ে ধরে ইস্কুলে ভর্তি হওয়াটা মকুব করে নিয়েছে। পড়াশোনা না করলেও সেলাইয়ে হাত সুষমার চমৎকার। সেলাই নিয়েই সে আছে। এর-তার কাছ থেকে নতুন নতুন সেলাই শিখছে।

এ একরকম মন্দের ভালো। সুবর্ণর থেকে তো হাজার গুণে ভালো। ঘর-সংসারের কাজ ছাড়া কিছু শেখেনি বলেই না সুবর্ণর আজ এই দুর্দশা ?

দিনকাল যা পড়েছে, মেয়েদেরও নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে তৈরী হওয়া দরকার। তা লেখাপড়া শিখেই হোক, কি সেলাই-ফোঁড়াই শিখেই হোক।

বিয়ের পর যদি দুর্দিন আসে, ভগবান না করুন, একেবারে অকূলে ভাসতে হবে না।

সুভাষিণী সেকথা বোঝে না। এতদিনেও যখন বুঝল না, তাকে বোঝাতে যাওয়া বৃথা। কী দরকার ও নিয়ে মায়ের সাথে কথা কাটাকাটি করে ?

খাওয়ার সময় অত সব ভাবারই বা দরকার কি ? সে ভাবনা তো মাসভর আছে।

এই তিনটি দিন সব ভাবনা তুলে রাখতে চায় স্বর্ণ। সকলের হাসিতে-গল্পে একরত্তি এই খাবার-ঘরটা জমজমাট হয়ে উঠুক, সেই সাথে স্বর্ণও একটু প্রাণভরে হাসুক, বাবা মা ভাইবোন ভাইঝির খুশিয়ালী মুখের দিকে চেয়ে বুকভরে নিশ্বাস নিক।

এই লোভেই না কতবার 'এবার থাক, না গেলাম' ঠিক করেও মাস শেষ হলে না এসে পারে না একবারও।

আজ সবাই ওদিকে খেতে বসেছে, কিন্তু কেউ তাকে ডাকল না। না, ননী বোধ হয় ডাকতে যাচ্ছিল, কিন্তু আন্নাকে সে নিয়ে আছে বলে সুভাষিণী তাকে ডাকতে দিল না।

ভালোই করেছে মা। শরীরটা যে তার কী অকথ্য ক্লান্ত, এতক্ষণ টের পায়নি স্বর্ণ। শোয়ার সাথে সাথে দেহটা যেন বিছানার সাথে একেবারে মিশে যেতে চাইছে। ঝিমঝিম করছে মাথা। চোখ চেয়ে থেকেও মনে হয়—তক্তাপোষ সুদ্ধ গোটা ঘরটা যেন মাঝ-মেঘনায় ঢেউয়ের মুখে উথাল-পাথাল নাওয়ের মত দুলতে শুরু করেছে।

ঘরের অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়। অন্ধকার। অন্ধকার। শুধু এই ঘর নয়, গোটা পৃথিবীটাই দুলতে দুলতে অন্ধকারে তলিয়ে যায়। গভীর পাঁকের মত অন্ধকারে।

কিন্তু এই দুলুনিতে আজ আর ভয় নেই। অন্ধকারে আজ আর আতঙ্ক নেই। বরং ভালোই লাগে। স্বর্ণর কাছে অতিপরিচিত এই দুলুনি। আর এই অন্ধকার। অতি প্রিয়ও। মাঝে মাঝে, অন্ধকার ঘরের নির্জনে, বা চোখ বুজে

অন্ধকারকে ডেকে এনে, মাঝ-মেঘনায় ঢেউয়ের মুখে উথাল-পাথাল নাওয়ের মত দুলতে তার সত্যিই একটা আশ্চর্য শিহরণ ছড়িয়ে যায় সারা শরীরে।

তখন হাসি পায় সেদিনের কথা ভেবে। শিয়ালদহ স্টেশনের প্লাটফর্মের সেই দিনটির কথা ভেবে—

সুভাষিণী, সুষমা, সুরমা ব্যাকুলভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। বার বার অবিনাশ জিজ্ঞেস করছিল—অবনীর বদলে তার মাথাটা কেন ওরা দু ফাঁক করে দিল না? ঘরে গিয়ে খিল দিলে ঘরসমেত পুড়ে মারা যাবে জানলে কি সকলকে নিয়ে সে বেতবনে গিয়ে লুকিয়ে থাকত? ছেলের বউয়ের পিছন পিছন বউ-ছেলে-মেয়ের হাত ধরে নাতনীকে কোলে নিয়ে সে-ও কি গিয়ে ঘরে ঢুকত না? ননীর ভাবনা, এখন কী হবে? আর কতদিন জন্তু-জানোয়ারের মত এখানে তারা পড়ে থাকবে? হিন্দুস্থান নাকি হিন্দুদের, দেশ নাকি স্বাধীন হয়েছে, সাহেবরা নাকি চলে গেছে—তবে তাদের কেন এই অবস্থা? কাঁথায় হেগেমুতে মরার মত নেতিয়ে ছিল টুলু। হঠাৎ ডুক্‌রে দিদি বলে ফনী তার ওপর ঝাঁপিয়ে আসতেই টাল সামলাতে ভুজঙ্গকে ধরতে গিয়ে সুবর্ণ চমকে উঠেছিল।

আশেপাশে কোথাও নেই ভুজঙ্গ।

আর তখন, হঠাৎ, চোখে ঘনিয়ে এসেছিল অন্ধকার। মনে হয়েছিল, মরা-হাজা এই এতগুলি সংসার নিয়ে এতবড় প্লাটফর্মটা হঠাৎ ছোট্ট একটা নাওয়ের মত মাঝ-মেঘনায় ঢেউয়ের মুখে উথাল-পাথাল দুলতে শুরু করেছে। ডুবতে শুরু করেছে। অন্ধকারে তলিয়ে যেতে শুরু করেছে। গভীর পাঁকের মত অন্ধকারে।

সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই অন্ধকার বদলে গিয়েছিল কাকজ্যোৎস্নায়। গা-ছমছম কাকজ্যোৎস্নায় মনে হয়েছিল—ব্যাকুলভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকা এই কটি প্রাণী ছাড়া এত বড় এই প্লাটফর্মে আর মানুষের নামগন্ধও নেই। প্লাটফর্ম তো নয়—ধু-ধু মেঘনার উধাও সমুদ্রে হঠাৎ-জাগা নির্জন একটি চর যেন।

চোখ বোজা মাত্র সেই কাকজ্যোৎস্নাই কিন্তু ফের ঘনঘোর অন্ধকার হয়ে গেছে। মাথা ঝিমঝিম করে উঠেছে। শুধু মাথা নয়—সারা শরীরও।

দিশেহারার মত ফনীকে সেদিন বুকে চেপে ধরেছিল সুবর্ণ।

পরম নিশ্চিন্তে স্বর্ণ এখন হাত পা ছড়িয়ে দেয়। নৌকোডুবি অতই সহজ? বাঙাল দেশের মেয়ে না সে?

মরার সময় শৈলর সাথে একবার যদি দেখা হত।

সহজ স্বরে শান্তভাবে স্বর্ণ শুধু বলত, দেখলে তো বৌদি, অত করেও তুমি আমার কিচ্ছু করতে পারলে না। বাপের বাড়ির সাথে ঝগড়া করে, পাড়ায় লোকের কাছে কলঙ্কিনী হয়েও শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী হতে হচ্ছে তোমায়—আর দেখ দেখি আমায়, সিঁথির সিঁদুর নিয়ে কেমন জলজ্যান্ত বেঁচে আছি। বাঙাল মেয়েরা শুধু ভুলিয়ে-ভালিয়ে স্বামী যোগাড় করতে পারে না বৌদি—দরকার হলে স্বামীর তোয়াক্কা না করেও থাকতে পারে। সিঁথির সিঁদুর হুবহু বজায় রেখে।

দপ করে আলো জ্বলতেই শাড়ি সামলাতে তাড়াতাড়ি উঠে বসে স্বর্ণ।

দরজায় থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সুষমা। যা ডর লাগছিল! ঘর আঁধার কইরা শুইয়া ক্যান লো? চেহারা কী হইছে! অসুখ?

একটু সর্দি-জ্বর—

একটু জ্বরের এই নমুনা?

যাক, একজনের তবু নজরে পড়ল।

কিন্তু তার চেহারা যেমনই হোক, এক মাসেই কী সুন্দর হয়ে উঠেছে সুষমা। সেজেছেও কী অপরূপ! ধরে-বেঁধে যাকে চুল আঁচড়ে দিতে হয়, সে আজ নতুন কায়দায় খোঁপা বেঁধেছে। হঠাৎ মনে হবে, বব-করা বুঝি। মায়ের বাতিল করা শাড়ি ছাড়া যে কিছু পরতে চায় না—ফিনফিনে সিফন তার পরনে। হাতে গলায় কানে হালফ্যাসানের প্লাষ্টিকের গয়না—সস্তা হলেও চটকদার। পাউডার না মাখলেও রঙ যার ফেটে বেরোয় সে যেন আজ ধীরে-সুস্থে বসে অনেকক্ষণ ধরে মুখটাকে পেণ্ট করেছে। তুলি দিয়ে ভুরু এঁকেছে। চিত্রবিচিত্র টিপ পরেছে। নিজের যৌবনের লজ্জায় সব সময় যে কুঁজো হয়ে চলে—কাঁধে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে বুক উঁচিয়ে কেমন উদ্ধতভাবে সে দাঁড়িয়েছে এখন।

স্বর্ণ বোনের দিকে চেয়ে থাকে।

কাছে এগিয়ে আসে সুষমা। দিদির কপালে, মাথায় হাত রাখে।

হুঁ, যা ভাবছি। জ্বর গায়ে ঠাইসা চান করছ। তার উপর ভিজা চুল বাইন্ধা রাখছ। তুই কী লো!

ঝাঁজালো সেন্টের গন্ধে নাক জ্বালা-জ্বালা করে ওঠে সুবর্ণর।

সুষমাকে আস্তে ঠেলে দিয়ে সুবর্ণ বলে, থাউক, খুলিস না। পিঠ স্যাঁতস্যাঁত করে।

পিঠ স্যাঁতস্যাঁত করে বইলা ভিজা চুল বাইন্ধা রাখন লাগব! কী আমার সোহাগী পিঠ রে! জোর করে সুষমা খোঁপা খুলে দেয়। ইশ, এখনতরি জল চপ-চপ করে। কই, দুগা হাত দিছে না ভগবান? কষ্ট কইরা মাথাখান মুইছবারও পার নাই?

ওয়াতে আমার কিছু হইব না। মরুম না।

হে জানি।

দরজার মাথা থেকে গামছাটা টান দিয়ে আনে সুষমা। ফিইর‍্যা বয়।

হুড়ুম দাড়ুম না কইরা তুই থির হ দেখি। হাত ধরে সুষমাকে টেনে বসায় সুবর্ণ। বাইসকোপ কেমুন দেখলি ক শুনি?

চমৎকার। সুবর্ণর মাথা মুছিয়ে দিতে দিতে উচ্ছ্বসিতভাবে সুষমা বলে, ওয়া ছাইড়া আইতে ইচ্ছা করে না।

তাইলে খুব রস পাইছ?

পামু না? রসের কলসে কে না রস পায় লো?

আগে না তর বাইসকোপে গ্যালে ঘুম পাইত? মাথা ধরত?

আগে যে খুকি আছিলাম দিদি।

অখন বুঝি খুকির মা—

হই নাই, কিন্তু হইতে কি পারি না?

হাসির বদলে হাসি দিয়েই কথাটা বলে সুষমা—কিন্তু তার হাসি দেখেই হাসি উবে যায় সুবর্ণর।

তার ঠাট্টায় সুষমা কোথায় লজ্জা পাবে, ঠাট্টার খোঁচাটা বুঝে গুম হয়ে

যাবে, তা নয়—তার কথা শেষ না হতেই একেবারে মুখের কাছে মুখ এনে জবাব দিয়ে বসল ! জবাব দিয়েও চেয়ে আছে হাসিমুখে !

সুবর্ণ গম্ভীর হয়ে যায়। খুকির মা হওনের বয়েস তর হইছে জানি। তাই বুঝি আর মানুষ না পাইয়া—

হাতের কাছে এমুন মানুষ কোথায় পামু শুনি। উঠে দাঁড়ায় সুষমা, ভালো কথা মনে করাইয়া দিছস, মানুষটা সদরে বইয়া আছে হুঁশ ছিল না। একা আছে, যাই।

বইয়া আছে !

থাকব না ! আমারে বাইসকোপে নিয়া যাওনে ছুটকিরাণীর মান হইছে—তার মান ভাঙাইয়া স্যান যাইব। ওকি—তুই যাস কই ?

দেখা কইরা আসি।

ক্ষেপলি নাকি ! সুবর্ণকে জড়িয়ে ধরে সুষমা। অখন যদি রাগারাগি করস—

না, রাগারাগি করুম না। রাগারাগি কিয়ের ! একটা কথা কমু। ছাড়—

ছাড়ে না সুষমা। বরং জোর করে সুবর্ণকে ফের বসিয়ে দেয়।

সুবর্ণ বলে, তয় তুই যা—তুই গিয়া কইয়া আয়—আর অরে অপমান করুম না—হাত ধইরা ঘরে নিয়া বসামু। গলা জড়াইয়া ধইরা—

দিদি !

সুবর্ণর মুখ চাপা দেবার জন্যে প্রাণপণে তাকে জড়িয়ে ধরে সুষমা।

নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে না সুবর্ণ। আর তার দরকার নেই।

কিন্তু এটুকুরই বা দরকার হল কেন ? বুদ্ধিমতী মেয়ে সুষমা, কেন বোঝেনি—রাতারাতি কেন সুবর্ণ বিমুখ হয়েছিল দুলালের ওপর ? বাড়িতে এসেই যেদিন সে দুলালের সাথে মিশতে, এ বাড়িতে তাকে ঢুকতে দিতে ননীকে বারণ করে দিয়েছিল—কই, সেদিন তো একটি কথাও বলেনি সুষমা ?

বরং ননী যখন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—ক্যান দিদি ? সুবর্ণর হয়ে ও-ই জবাব দিয়েছিল, দিদির কথার উপর ক্যান কি ছোড়দা। দিদি কইছে—ওয়াই হুকুম। ব্যস !

স্বর্ণ ই ভেবেছিল, মুখ ফুটে ননীকে কিছু বলতে না পারলেও সুষমাকে বলবে।

সুষমাকে সবই খুলে বলবে।

সুষমা যদি এতটুকু কৌতূহলও প্রকাশ করত! হঠাৎ কেন সে ডুলালের সাথে মিশতে ননীকে বারণ করল—আড়ালেও যদি কারণটা একবার জানতে চাইত!

নইলে নিজে থেকে ও প্রসঙ্গ কী করে তোলে স্বর্ণ?

সুষমা ও নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য না করায়, স্বর্ণ বুঝেছিল, আসল ব্যাপার না জানলেও আন্দাজ ঠিকই করেছে। বয়েসে ননীর চেয়ে ছোট হলেও মেয়েমানুষ তো? ডুলালকে স্বর্ণর চেয়ে সেই বেশি দেখে তো? ওই বয়েসে ডুদিনেই ছেলেদের চিনে নেয় গরিবঘরের মেয়েরা। তার ওপর স্বর্ণর বোন হওয়ার ডুর্ভাগ্য হয়েছে যে গরীব ঘরের মেয়ে সুষমার।

সেদিন ঠিকই বুঝেছিল সুষমা।

এখনও তাই মুখ তুলতে পারছে না। কেঁদে সারা হচ্ছে।

কিছুক্ষণ এইভাবে থাকে ডুই বোন—তক্তাপোষের কিনারে পা ছড়িয়ে বসে স্বর্ণ, সামনে দাঁড়িয়ে মাথাটা তার বুকের সাথে চেপে ধরে সুষমা। স্বর্ণর মাথায় গাল রেখে সুষমা।

বোনের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে স্বর্ণ বলে, কান্দিস না বুড়ি, কাঁদিস না। কাইন্দা কাইন্দা আমার ভিজা চুল আর ভিজাইয়া দিস না বুইন। শ্যাষে যে নিমুনিয়া হইয়া মরুম।

তুই মরবি! তুই আর মরছস! ক্যান মরস না তুই দিদি—ক্যান মরস না! স্বর্ণর মাথায় মুখ ঘষতে ঘষতে অস্ফুটস্বরে সুষমা বলে, কাগো লাইগা তুই জীবনপাত করস আবাগী! তর কি চোখ নাই? কান নাই তর? এত দেইখ্যাও কিছু বোঝস না তুই?

বোনের পিঠে হাত বুলোয় স্বর্ণ। মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাসটা বড় খাপছাড়া হয়ে ওঠে সুষমার। সব জেনে সব বুঝেও দিদিকে তখন মরতে বলে।

একই কথার পুনরুক্তি করে।

কেন যে, জানে সুবর্ণ। সুবর্ণ মরে গেলে সবচেয়ে বেশী জব্দ হবে অবিনাশ। কী যে অমানুষিক বিদ্বেষ ওর জমে উঠেছে বাপের প্রতি!

গৌরের জন্যে?

গৌরের সঙ্গে বিয়ের যখন প্রায় সব ঠিক, হঠাৎ বাগড়া দিয়ে বসেছিল অবিনাশ, এ বিয়া হইব না।

ক্যান্?

হওনের না।

ক্যান বাবা? টাকার লেইগা? হে চিন্তা তুমি কইর না। টাকা যা লাগে—

টাকা! না মা, তুই থাকতে টাকার চিন্তা আমি করি না। তামাক টানতে টানতে অবিনাশ উদাস হয়ে যায়।

তয় কেন হইব না? এমুন ভালো পাত্তরটা—

হইব না—এদেশী বইলা হইব না। আমাগো লগে ঘটি গো মিশ খাইব না।

মোক্ষম যুক্তি। সুবর্ণ প্রতিবাদ করে কোন্ মুখে! প্রতিবাদ করে লাভ নেই—সঙ্গে সঙ্গে তারই উদাহরণ দিয়ে অবিনাশ তাকে থামিয়ে দেবে।

কিন্তু সব ঘটিই কি সমান?

বাঙাল মেয়ে বলে উঠতে-বসতে তাকে কথার ঝাঁটা মারত শৈল। ঝিয়ের সামনেও তার কথার টান নিয়ে হাসাহাসি করত।

ঘোমটা খুলে সে একদিন জানালায় দাঁড়িয়েছিল বলে, কী সব কুকথ্য কথাই না বলেছিল!

ফনীর নাম করে এক রাতে কেঁদে উঠলে, পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে কুৎসিত রকম জেরায় জেরায় তাকে কাঁদিয়ে ছেড়েছিল—কে ফনী? ফনী কি সত্যিই সুবর্ণর ভাই? ভাই যদি, তবে অতগুলো ভাইবোন থাকতে যখন-তখন শুধু ফনীর নাম নিয়ে বুক চাপড়ানো কেন? নাকি গাঁয়ে ছিল বলে তাল সামলাতে পারেনি—নিজের ছেলেকে এখন বাপের ছেলে বলে চালাচ্ছে? নাকি

নিজের ভাইয়ের সাথেই লটঘট আছে? বাঙাল মাগীদের কাণ্ডকারখানা জানতে তো শৈলর বাকি নেই।

অথচ মেসেজ ক্লিনিকে সে চাকরি করবে শুনেও কি গৌরের দিদি নিজে থেকে বিয়ের কথা তোলেনি? বলেনি কি, ভটচাজ বামুনের ছেলে যদি চামড়ার কারখানায় কুলিগিরি করতে পারে, ভদ্রঘরের মেয়ের চাকরিতে কী আসে যায়? আর, মেয়েদের চাকরি মেসেজ ক্লিনিকেও যা ইস্কুলে আপিসেও তা। দিনকাল কেমন পড়েছে দেখতে হবে বইকি! আসল কথা হল—নিজে ঠিক থাকা। মল্লিকদের বি-এ পাশ সরকারি চাকরে মেয়েটা কম কেলেঙ্কারি করেছে! বাপ ভাই যাই বলুক—দেওঘরে গিয়ে কলেরায় মরেছে রটালেই হল?

শেষ পর্যন্ত ভুজঙ্গও বোধ হয়, বোধ হয় কেন নিশ্চয়, বিশ্বাস করত শৈলর কথাগুলি। 'স্বামীর কাছে লজ্জা!' বলে সে-ই জিদ ধরত বিদঘুটে তার খেয়ালগুলি মেটাক বউ, কিন্তু পাছে রাগারাগি করে এই ভয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে মনে মনে মরে গিয়ে সুবর্ণ দম দেওয়া পুতুল বনে যাওয়া মাত্র, গম্ভীর হয়ে উঠে দাঁড়াত, চিবিয়ে চিবিয়ে বলত, সবই দেখি পাকাপোক্তভাবে জানো! তবে এতক্ষণ ন্যাকামো হচ্ছিল কেন? হুঁঃ!...ডবকা বয়েস পর্যন্ত লেডেদের দেশে কাটিয়েছ, ওরা কি আর উচ্ছুগ্‌গু না করে ছেড়ে দিয়েছে!

আর—ভাঙা-ভাঙা গলায় গৌর একদিন বলেছিল, দিদি! ওকে ভালোবাসি কিনা জানি না—তবে আপন করে নিতে চাই। আমার যদি আরও ভাইবোন থাকত দিদি—আর সবাইকেও নিতুম। গোটা পরিবারটাকেই।

সে কী ভাই! বাঙাল মেয়ে বাঙাল ছেলে কি মিশ খাবে?

মানুষের সাথে মানুষের মিশ না খেয়ে পারে দিদি? দিদি! আমাদের জন্যেই আপনারা সব ছেড়ে সব হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে এলেন—আর আমরা আপনাদের দূরে সরিয়ে রাখব? দূর-দূর ছাই-ছাই করব?

গৌরই যোগাড় করে দিয়েছিল বেলেঘাটার সেই বস্তি-বাড়ি।

কারখানার ইউনিয়নের হয়ে স্টেশনে গিয়েছিল ভলান্টিয়ারি করতে। সেখানেই আলাপ অবিনাশের সঙ্গে। সেই আলাপ পরে স্নেহে-কৃতজ্ঞতায় গভীর হয়ে উঠেছিল।

গৌরের সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করত অবিনাশ।

বেলেঘাটা থেকে হাওড়ায় উঠে আসা সত্ত্বেও নিয়মিত যাতায়াত ছাড়েনি গৌর। অবিনাশের পাশে বসে বাঙাল দেশের গল্প শোনে। ননীদের কাছ থেকে বাঙাল কথা শেখে। সুষমাকে নাকি বলেওছে, যে করেই হোক শ্বশুর বাড়ির দেশ একবার ঘুরে সে আসবেই। সঙ্গে সুষমা যাক না যাক।

বর্ষাকালে নৌকো করে এঘর-ওঘর যেতে হয়? এর চেয়ে তাজ্জব কথা কেউ কখনও শুনেছে! হামাগুড়ি দিতে দিতেই সে-দেশে মানুষ সাঁতার শেখে?

শুধু দেশ নয়, দেখে আসবে সে-দেশের মানুষগুলিকেও—মুসলমান নামে যারা পরিচিত। এদেশের হিন্দুদের মতই তাদের কেউ বিনা দোষে মানুষ খুন করে—কেউ আবার মানুষের জন্যে খুন হয়? সুষমাদের গণি মিঞাদের মত এখানেও কি শ্রীদাম চাটুজ্জেরা নেই? এখানকার সতীন মিত্তিরদের মত ওখানেও কি আফজল চাচারা ছিল না? নিজেদের প্রাণ দিয়ে সতীন মিত্তিররা আফজল চাচারা কি শ্রীদাম চাটুজ্জেদের গণি মিঞাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যায়নি? তবে? দেশদুটো আলাদা হলেও তফাত কোথায় দুই দেশের মানুষের মধ্যে?

দূর থেইকা হগ্‌গলেই—

সুষমাকে থামিয়ে দিয়ে গৌর বলে, আইজ্ঞ্যা না মশয়, দূর থেইকা নয়, সশরীরে একেবারে কাছে যাইমু। কী কইছসরে ননী, তুই আর মুই—আঁউ?

গৌরের কথায় সকলে হেসে ওঠে: আমরা উইড়া নাকি গৌরদা!

ধমক দিয়ে অবিনাশ বলে, হাসস ক্যান? কই তগো হাসনের হইলটা কি? পরথম পরথম অমন হয়। তর দিদির লাখান কইলকাতাইয়া কথা কইতে পারস তরা? সোনা যেমুন এদেশী কথা শিইখ্যা লইছে, আমার গৌরও তেমুন আমাগো কথা শিইখ্যা লইব। কও বাবা কও—তোমার মুখে আমাগো কথা বড় মিষ্ট শোনায়।

সেই গৌরের সাথে বিয়ের আপত্তি?

কারণটা ফাঁস করে দেয় সুষমা।

বাপে আবার বাপ হইতাছে লো। তাই গ্যাছে গিয়া মাথা ঘুইরা।

কস কি লো!

কমু আর কি! লজ্জাও নাই! ঠ্যাং ভাইঙ্গা আর কাম না পাইয়া—

আঃ! চুপ যা ছেমরি।

বুড়িরে মিছা ধমক দ্যাস দিদি। বুড়ি ঠিকই কয়।

দুপুরে দু বোনের নিরিবিলি আলাপে কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ননী, কেউ খেয়াল করেনি। দাদাকে দেখেই সুষমা অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

সুবর্ণ বলে, কলেজ হইয়া গেল তর?

হুম।

তয় যা এহান থনে। আমাগো কথায় তুই কথা কস ক্যানরে হারামজাদা?

কই কি আর সাধে দিদি! বাপ-মায় গুরুজন, তবু কইতে হয়। তিক্ত স্বরে ননী বলে, দুদিন বাদে বুড়াবুড়ি তো ড্যাংড্যাঙাইয়া চইলা যাইব—সব ঠেলা তখন সামলান লাগব এই আমারেই। মাইনষের একটা আক্কেলবিবেচনা থাকে—এয়াগো তাও নাই।

ননী চলে যায়।

পুরানো কথার জের টানে সুষমা, মাইয়ার রোজগারে খাইতে বড় মজা লাগে। এক মাইয়ারে দিয়া সাধ মেটে না—

বুড়ি!

ধমকাইস না। এতকাল মুখ বুইজা আছি, আর থাকুম না। জানস, হেয়ার থনে টাকা লয়, ধার বইলা লয়—শোধ দেওনের নাম নাই? কাইল ছেমরাটা বুঝি চাকরি খোয়াইয়া আইসা, টাকা চাইছিল, তা কয় কি—হে টাকা দিয়া বুড়িরে শাড়ি-ব্লাউজ কিন্যা দিছি, বাবা। বুঝলিনি? বাপে তর কী কইবার চায় বুঝলিনি?

বোঝা কিছু শক্ত নয়, তবু যেন সুবর্ণ বুঝতে পারে না। কথাগুলি তার বোনই বলছে তো? বলছে তারই বাবা অবিনাশ সম্পর্কে তো? একটু আগে তার ভাই ননীই নিজের বাপকে ধিক্কার দিয়ে গেল তো?

আমারে আবার কয় অরে সামলাইতে। বেশি তাগাদা দিলে ডাক্তারকাকার থনে টাকা চাইয়া আনতে। আমি কইলেই হেডা নাকি টাকা দিব। বুঝলি? কী

কইবার চায় বুঝলি ?...কাগো লাইগা তুই জীবনপাত করস আবাগী। তর কি চোখ নাই ? কান নাই তর ? এত দেইখ্যাও কিছু বোঝস না তুই ? মরণ নাই তর ? এয়াগো পিণ্ডি জুটাইয়া বিষ কেননের পয়সা না থাকে, গলায় দড়ি দিবার পারস না ?

পাগলের মত সুবর্ণর মাথায় মুখ ঘষে সুষমা। সেদিনের কথাগুলির হুবহু পুনরুক্তি করতে করতে।

বোনের পিঠে হাত বুলিয়ে চলে সুবর্ণ। সত্যি, মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাসটা বড় খাপছাড়া হয়ে ওঠে সুষমার। সব জেনে সব বুঝেও দিদিকে তখন মরতে বলে।

বাঁচার তুলনায় মরা যে কত সহজ সুবর্ণ কি জানে না ? মরতে সাধ কি সুবর্ণরই জাগে না ? বুলবুলির মত ?

যেদিন সে বাড়িতে ঢোকা মাত্র কাঁথা মুড়ে আন্নাকে কোলে নিয়ে এসে নিষ্ঠুর হেসে সুষমা বলেছিল, 'সোনাদানা বাইর কর লো, নাইলে চাঁদমুখ দেখামু না'—সুবর্ণর কি ইচ্ছা যায়নি, ঠাস করে সুষমার হাসিমুখে প্রচণ্ড একটা থাপ্পড় কষিয়ে দেয় ? দিয়ে, কোল থেকে কদিনের শিশুটাকে ছিনিয়ে নেয় ? নিয়ে, দেয়ালের সাথে আছাড় মারে ? তারপর ধীরেসুস্থে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে চলন্ত ট্রাম কি বাসের সামনে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে ?

কিন্তু আন্নাকে কোলে নিয়ে তো সুষমা একা আসেনি, তার আগেই এসে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ফনী। চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল ননী, সুরমা, টুলু।

মরার সাধকে প্রশ্রয় দেওয়া কি তারপরেও যায় ? সুবর্ণ তো বুলবুলি নয়।

বরং মুখে হাসি এনে বলতে হয়, 'বাঃ, ভারী সোন্দর হইছে তো।' বলতে বলতে আন্নাকে কোলে নেবার জন্যে হাতও বাড়াতে হয়। একরকম জোর করেই সুষমার কোল থেকে তাকে কেড়েও নিতে হয়।

এবং কাপড় ছাড়ার কথাটা বারবার মনে পড়লেও সুভাষিণী কিছু বলে না বলে ভুলে যেতে হয়।

এবং ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে আন্না-কোলে তাকে দেখেই ফের অবিনাশ ঘরে ঢুকে পড়লে বাপের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার রোখ চেপে যায়।

মরার সাধ মেটানোর সময় হয় না।

সুষমা বলে, জানস, বাইসকোপের কথা আমিই দুলালরে কইছিলাম।

তুই ?

হ। আমি না কইলে ওই শূয়ারটার সাহস হইত? পাছে দাদা যাইতে না দেয়, তাই—

দাদায় জানত। লুঙ্গি দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ননী ঘরে ঢোকে।

থতমত খেয়ে সুবর্ণকে ছেড়ে সরে দাঁড়ায় সুষমা।

ননী বলে, দাদার চোখ দশ দিকে। দাদায় সব দ্যাখে সব জানে।

ছোড়দা!

দাদা হওন কি সহজ রে বুইন! যা, এখন ধড়াচূড়া ছাড় গিয়া। আর সং সাইজা থাকিস না।

সুষমা পালিয়ে বাঁচে।

ননী গিয়ে জানালায় দাঁড়ায়। জানালা খুলতেই হু হু করে উত্তরে হাওয়া ঘরে ঢোকে।

সুবর্ণ বলে, খুললি ক্যান। বন্দ কর। আন্নার ঠাণ্ডা লাগব।

জানালার রড ধরে ননী বাইরের দিকে একটু কাল চেয়ে থাকে। বাইরের দিকে তাকিয়েই বলে, আমার উপ্‌রে তুই রাগ করছস জানি। একবারও তর কাছে আসি নাই, তর লগে কথা কই নাই, কেউরে আসতে দিই নাই—

দূর পাগল! পড়া ফেইলা—

পাগল এখনতরি হই নাই দিদি, তয় হওনের বড় বাকিও নাই। সেদিনের কাণ্ডের পর—

সুবর্ণ বাধা দেয়। সেদিনের কাণ্ড! ও নিয়ে অত ভাবনার কী আছে? একবার বাড়ি বদলেছে, না হয় আবার বদলাবে। যতবার দরকার বদলাবে। সুবর্ণ না হয় আসা কমিয়ে দেবে। না হয় সুবর্ণ আসবেই না। আপাতত।

তাছাড়া কৈফিয়ত চাওয়ার অধিকার কি শুধু ভুজঙ্গর আছে, সুবর্ণর নেই? একবার ভুজঙ্গর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্যে সুবর্ণও কি অসহ্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি?

সুবর্ণ বলে, হে কথা ছাড়ান দে। বলেই অন্য কথা পাড়ে, হ্যাঁরে, ফইনা বর্ধমান গেল, জোর কইরা তুই আটকাইতে পারলি না? সোমবার যার পরীক্ষা—

জোর খাটাইয়া কাম হইত না দিদি! পড়াশুনা যে বন্দ করছে, তার পরীক্ষা!

পড়া বন্দ করছে!

পড়া বন্দ, ইস্কুল বন্দ। প্রভাতবাবুর মত মাইনষেরেও অপমান কইরা খেদাইয়া দিছে—

কস কি! তুই কস কিরে নইনা? প্রভাতবাবু না অগো হেড মাস্টর?

হুঁ।

তারে অপমান করছে ফনী?

হুঁ।

প্রভাতবাবু না অরে ভালোবাসে?

বাসে মানে! তিনিই ফ্রি কইরা দিছিলেন, ইস্কুল থনে সব বই দিছিলেন, বিনা পয়সায় রোজ পড়াইতেন—কইতেন—ঠিক মত কোচিং পাইলে ফইনা—

জানে সুবর্ণ। ফনীই একদিন সব কথা তাকে বলেছিল।

শুধু ক্লাসে ফার্স্ট হওয়া নয়, ঠিকমত কোচিং পেলে হাজার হাজার ছেলেমেয়ের মধ্যে ফার্স্ট হবে ফনী। খবরের কাগজে তার ছবি ছাপা হবে, তলায় লেখা থাকবে শ্রীমান ফণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। লেখা থাকবে, বড় গরিব ছিল ফনীরা। পুব বাংলার এক রিফিউজী পরিবারের ছেলে ফনী। বড় কষ্টে ফনীকে লেখাপড়া করতে হয়েছে। শ্রীমান ফণীন্দ্রর অসাধারণ মেধার পরিচয় পাইয়া প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুসুম দত্ত বি-এ মহাশয় ব্যক্তিগতভাবে তাহার পড়াশোনার যত্ন লইতেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শ্রীদত্ত জানান যে, শ্রীমান ফণীন্দ্রর মত ছাত্র পাইয়া তাঁহার পঁচিশ বছরের শিক্ষক-জীবন এতদিনে সার্থক হইল। সংসারের শত অভাব-অনটন সত্ত্বেও আদর্শের জন্য যে-সংগ্রাম আজীবন তিনি—

হেড মাস্টারের মুখে শোনা কথাগুলিই বোধ হয় বিকৃত উচ্চারণে টানা মুখস্থ বলে যায় ফনী। তার চোখমুখের ভাব দেখে হেসে ফেলে স্থবর্ণ।

তুই হাসস দিদিভাই ?

হাস্থম না ভাই ? এমুন খোশ খবরে হাস্থম না ? খবরের কাগজে আমার ফইনার ছবি ছাপা হইব, হগগলে তর নাম জানব, দ্যাশস্থদ্ধা মাইনষে আমার ফইনার গুণ গাইব—

প্রভাতবাবুর নামও ছাপা হইব ?

হইব না! বুড়া মানুষটা তর লাইগা কত করে ভাব দেখি ভাই। নিজের পোলাগুলার দিকে ফিইর‍্যাও চায় না, সেগুলা অমানুষ হইতে আছে, টাকার অভাবে দুই-দুইটা মাইয়ার বিয়া আটকাইয়া আছে-- তাও একটা টিউশনি ছাইড়া দিয়া বিনা পয়সায় তরে পডান, আবার রোজ এক বাটি কইরা দুধ খাওয়ান—

মনের মেঘ তবু কাটেনি ফনীর। মনের কথা মুখ ফুটে বলতেও পারেনি : হেড মাস্টারকে কম শ্রদ্ধা-ভক্তি সে-ও করে না—কিন্তু আসল কারণ—

সে না বললেও আসল কারণটা বুঝে গিয়েছিল স্থবর্ণ : খবরের কাগজে হেড মাস্টারের নাম থাকবে, তার দিদির নাম থাকবে না ? তার দিদির কথা কেউ জানবে না, কেউ বলবে না ? দিদি না থাকলে পড়াশোনা দূরস্থান বেঁচে থাকার মত খাওয়াপরাটাই কি জুটত ?

তখন ফনী চুপ করে গেলেও খানিক পরে খাওয়ার সময় স্থভাষিণী ফের হেড মাস্টারের গুণকীর্তন শুরু করা মাত্র হঠাৎ রেগে গিয়ে ওই কথাগুলিই শুনিয়ে দিয়েছিল।

শুনিয়ে দিয়ে অবশ্য ভাত আর মুখে তোলেনি।

সকলের খাওয়া হয়ে গেলে অত রাতে ননীকে দোকানে পাঠিয়ে খাবার আনাতে হয়েছিল স্থবর্ণকে। সকলকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে বুকে টেনে নিতে হয়েছিল ভাইকে। প্রবোধ দিয়ে তাকে বলতে হয়েছিল—ফনীর মত ছেলে পরের মুখ চেয়ে থাকবে কোন্ দুঃখে ? লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে উঠে নিজে সে দিদির দুঃখ ঘোচাতে পারবে না ? তবে!

অমন করে নিজে কেঁদে তাকেও যদি কাঁদায় ফনী—তবে আর কক্ষনোও সে আসবে না।

তুইও তো খাস নাই।

খা শয়তান! হাঁ কর কইতাছি—

না। তুই আমারে খাওয়াইয়া দে, আমি তরে খাওয়াইয়া দেই! অ্যাঁ, দিদিভাই?

ডাকুম টুলুরে! দেখুক আইসা—

ডাক না! পিছার বাড়ি মাইরা না তাড়াই তো কি কইছি! আমারে হিংসা করে হারামজাদী!

হইছে! তোমার তো হিংসাটিংসা নাই! হাঁ কর অখন।—আমি চোখ বুজলে তর কি গতি—না না—মরুম না, আমি মরুম না! ঠাট্টাও বোঝসনা? পাগলটা!

স্বুবর্ণ ফের জিজ্ঞেস করে,—প্রভাতবাবুরে ফইনা অপমান করছে?

আমার সামনে করছে। আমাগো বাড়ির দরজায় করছে। দুদিন ইস্কুল যায় না, পড়তে যায় না—বাড়ি বইয়া তিনি তাই খোঁজ নিতে আইছিলেন। আর ফইনা 'আর আমি পড়ব না—যান আপনি!' কইয়া মুখের উপর দরজা বন্ধ কইয়া দিছে।

মুখে কথা সরে না স্বুবর্ণর। ফনী এমন কাজ করেছে? এমন কাজ ফনী করতে পারে? ফনী বলেছে সে আর পড়াশোনা করবে না? তবে কি আসতে স্বুবর্ণর কদিন এবার দেরি হয়েছে বলে অভিমানে জ্ঞানহারা হয়ে গিয়েছিল ভাইটা তার?

ক্যান নইনা ক্যান? ব্যাকুল স্বুরে স্বুবর্ণ, জানতে চায় ক্যান ফইনা পড়াশোনা করতে চায় নারে? আমি রাগ কইরা আস্থম না কইছিলাম, ফইনা কি সত্যই ভাবছিল আমি আর—

ও মিলিটারিতে নাম দিব।

মিলিটারিতে নাম দিব? ফইনা?

তুই-ও যেমুন! বলতে বলতে ননী কাছে এগিয়ে আসে। ও কইলেই হইল? পোলাপানের কথা! আমি আছি না? দাদা না আমি? দুলালরে

এই কইয়া দিলাম দিদি—সামনের মাসেই ওর বুইনডারে বউ কইরা ফেলামু।
তারপর হগ্‌গল্‌টিরে লইয়া কইলকাতা ছাইড়া এক্কেরে—

আরেক দ্যাশে—

হ দিদি হ। আমাগো সেই পোড়া ভিটাতে। এ শুকনার দ্যাশের মানুষগুলাও বড় শুকনা। এ দ্যাশে আমাগো কেউ চায় নারে দিদি, এ দ্যাশ আমাগো না। মরতেই যদি হয় আমার দ্যাশের মাটিতে মরুম।

সুবর্ণর পাশে বসে ননী। দিদির কাঁধে হাত রেখে বলে, আর তুই যাইস না দিদি। আর তর গিয়া কাম নাই। তুই না থাকলে আমার বউ বরণ করব কে!

ননী বড় ভাই।

বড় ভাই হলে বাপ হতে হয়, বড় মেয়ে হলে মা। মা বাপ বেঁচে থাকলেও।

অবনী বলেছিল, আর জন্মে তুই মা হইতে গিয়া মরছিলি সোনা, এ জন্মে তাই বিয়ার আগেই মা হইয়া বইছস।

বালাই! সুভাষিণী ধমকে উঠেছিল, ও কী কথার ছিরি!

বাঃ রে! খারাপটা কী কইলাম। দ্যাখ না আইসা—মাইয়া তোমার কেমুন ষষ্ঠী ঠাউরেণ সাইজা বইছেন। কোলে, পাশে, সামনে—

বড় মাইয়া হইলে মা হইয়া ভাইবুইনরে মানুষ করতে হয়। হগ্‌গটিই করে।

ঠিক ঠিক। পরীক্ষার খাতা দেখতে দেখতে ঘর থেকে অবিনাশ সায় দিয়ে উঠেছিল, আর বড় ভাই হইলে বাপ হইয়া ভাইবুইনরে দ্যাখতে হয়। কাল যদি আমরা দুইজন চোখ বুজি—

একসাথে হাঁ হাঁ করে উঠেছিল অবনী আর সুবর্ণ। মা বাপের মরার কথায় কেঁদে ভাসিয়েছিল সুষমা! সুষমার দেখাদেখি ফনী। কোলে খিলখিল হাসা শুরু করেছিল ক'মাসের শিশু সুরমা।

ভারিক্কি চালে সাত বছরের ননী বলেছিল, শোন বুড়ি, শুইনা রাখ—আমি তর বাপ হই। ফের যদি আমার গায়ে হাত তোলস, পিটাইয়া চামচিকা বানামু।

শুনলা মা! পোলার কথা শুনলা! অরে বান্দর! আর আমি তরে পিটাইয়া চামচিকা বানাইতে পারি না? আমি তর বড় না?

নিশ্চয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল ননী, তা পারে অবনী। ছোট ভাইবোনকে পিটানোর ন্যায়সঙ্গত অধিকার দাদা-দিদির আছে।

কিন্তু তার একটা দাদা থাকলেও সে-ও যে আবার দাদা—সুষমা এটা মানতে চায় না বলেই কথাটা তাকে সকলের সামনে বলে রাখতে হল। পরে যেন কেউ দোষ না ধরে।

ননীর দাদা হওয়ার শখ নিয়ে একদিন কী হাসাহাসিই করত সকলে!

সুবর্ণর বুক ঠেলে এখন কান্না ওঠে।

সত্যিই ননী আজ বড় ভাই হয়ে উঠেছে। দাদা হয়েছে। মা বাবা বেঁচে থাকতেও বাবা হতে চাইছে।

তাই সুবর্ণ অত করে বলা সত্ত্বেও আর সে পড়বে না। দুলালের বোনটাকে বউ করে সে-ই এবার সংসারের হাল ধরবে। কালা হাবা কুৎসিত দেমাকী, বয়েসে ননীর হয়ত মাস কয়েকের বড়ই হবে যে-মেয়েটা—প্রয়োজন বুঝে তারই প্রেমে পড়ে গেছে।

দুলালকে একেবারে কথা দিয়ে বসেছে। সুবর্ণর মত চায়নি। ইচ্ছে করেই।

চাইলে কি মত দিত সুবর্ণ? দিত না। ননী তা ভালোভাবেই জানে।

কিন্তু সুবর্ণর কথামত দু ভাইয়ের লেখাপড়া শিখে পাশ করে মানুষ হতে হতে সংসারটা যে এদিকে জাহান্নামে চলে যায়!

সুবর্ণ তো সব জানে না, সুবর্ণকে সব এখন বলতেও ননী চায় না—শুধু এটুকু সুবর্ণ জেনে রাখুক, এই রাক্ষুসে শহর কলকাতা থেকে পালাতে না পারলে আর উপায় নেই।

অথচ সর্বস্ব হারিয়ে দেশ থেকে এলেও একেবারে খালি কি দেশে ফেরা যায়? পোড়া ভিটার মাটি কামড়ে থাকার জন্যে তো তারা দেশে যাচ্ছে না—দেশে যাচ্ছে নতুন করে ঘর বাঁধবে বলে, নতুন করে সংসারটাকে গড়ে তুলবে বলে।

তার রসদ কোথায় পাবে ননী? দুলালের বোনটা অমন না হলে তার মত ছেলে কি চৌধুরীবাড়ির জামাই হতে পারত? এবং চৌধুরী বাড়ির জামাই না হলে কি—

কথাগুলি ননীর যুক্তিময়।

সত্যিই রাক্ষুসে শহর এই কলকাতা। মানুষ নয়, শকুনের রাজত্ব। ননীর চেয়ে স্বর্ণ তা কম জানে না।

দেশের অবস্থাও এখন ভালো হয়েছে। অনেকে ফিরেও যাচ্ছে দুলালের কাকা তো দেশেই কায়েমী হয়ে বসেছে।

একথাও ননীর ষোল আনা সত্যি।

দিব্যি আছে চৌধুরীরা। ওখানেও জমিজায়গা নিয়ে বহাল তবিয়তে, এখানেও ঘরবাড়ি করে তোফা আরামে। ওদিক থেকেও কী ভাবে যেন নিয়মিত টাকা আনাচ্ছে, এদিকেও সরকারের কাছ থেকে রিফিউজী বলে মোটা টাকা আদায় করেছে। সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা না করেও এক শরিক আছে পাকিস্তানী সেজে, আরেক শরিক হিন্দুস্থানী।

কিন্তু চৌধুরীদের সঙ্গে অবু মাস্টারের তুলনা!

চরের দাঙ্গায় বরাবর আগ বাড়িয়ে যেত চৌধুরীরা। মাথা ফাটাবার সময় হিন্দু মুসলমান বাদবিচার করত না চৌধুরীরা। চৌধুরীদের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল গণি মিঞা।

কিন্তু আরেক দাঙ্গায় গণি মিঞার মন থেকে কী বেমালুম মুছে গিয়েছিল চৌধুরীদের কথা! শোধ নেওয়ার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও চৌধুরীদের কলকাতায় চলে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে গণি মিঞার দল ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের ওপর।

না, অবু মাস্টার, বিজয় নন্দী, সুজন সরকার, নিবারণ আচার্য, প্রাণতোষ মিত্তিরদের সঙ্গে চৌধুরীদের তুলনা হয় না।

বাবুর বাড়ির সঙ্গে গাঁয়ের সাধারণ গৃহস্থের তুলনা?

দেশের অবস্থার ভালোমন্দ ওতে কিছু বোঝা যায় না।

বোঝা যায় গৌরের কথায়। আশ্চর্য একটা কথা বলেছিল গৌর।

গণি মিঞার বড় ছেলে পুলিশের গুলী খেয়ে মরেছে? কেন, না বাংলা ভাষার জন্যে: অরা আমার মুখের ভাষা কাইরা নিতে চায়! প্রাণ থাকতে একি সওন যায়!

ছেলে মরার সাথে সাথে বদলে গেছে গণি মিঞাও? আজ পাকিস্তানের জেলে পচছে লীগের পাণ্ডা দাঙ্গাবাজ গণি মিঞা? চোখদুটো তার অন্ধ হয়ে গেছে? তবু ছাড়া পাচ্ছে না? দূর!

কী বোকা ভাই তুমি! এক নামের কি দুজন মানুষ হয় না? দুজন কেন—দু শ জন হয়। কাগজে নাম দেখেই—

গৌরের হয়ে তখন সাক্ষী দিয়েছিল ননী, হ রে দিদি, গৌরদা ঠিকই কইছে। আমিও কাগজ দেখছি। কাগজেই সব খুইলা লেখছে—আমাগো সেই গণি মিঞাই।

অ্যাঁ!

তাহলে দেশের অবস্থা অবিশ্বাস্য বদলে গেছে সন্দেহ নেই। সুবর্ণর মন তা বিশ্বাস বা না করুক।

তাহলে আবার দেশে ফিরে গিয়ে নতুন করে সব কিছু গড়ে তোলা যায়।

আবার! আবার—

সেই মাঠ সেই নদী সেই বন। ঘরে ঘরে আপন জন। বারো মাসে তের পার্বন। উঠোনে আঁচল দিয়ে কই মাছ ধরা। ধু ধু দুপুরে নাও নিয়ে উধাও হওয়া। ফিরে এসে হাসিমুখে মার বকুনি খাওয়া। এর সাথে ওর গলাগলি। আর গালাগালি। সুখে দুখে মধুর গাঁয়ের দিনগুলি। যখন-তখন মা বাপের সেই খুনসুটি। আর তাই নিয়ে—

অবনীর কথা মনে পড়ে যেতেই স্বপ্নের পর্দাটা কুটি কুটি হয়ে ছিঁড়ে যায়।

মিথ্যে! মিথ্যে! সব মিথ্যে! এসব তার মনের মিথ্যে কল্পনা। এমন কোন দিন ছিল না। থেকে থাকলেও আর হতে পারে না। কে তার দাদাকে ফিরিয়ে দেবে? বৌদিকে ফিরিয়ে দেবে? বকুলের গন্ধে যখন দাদা-বৌদিকে মনে পড়ে যাবে—! সুবর্ণ ই কি আর মাথা তুলে—

সুভাষিণী বলে, কি লো, ভাত লইয়া বইয়া আছস, এক গরাসও তো মুখে দিলি না।

স্বাদ পাইতাছি না মা।

স্বাদ! দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সুভাষিণী বলে, ডাইল আর কুমড়ার ঘণ্টে স্বাদ পাওন যায়! আগে যদি জানতাম—

বাধা দিয়ে সুষমা বলে, হে স্বাদের কথা দিদি কইতাছে না। সর্দিজ্বর হইছে, তাই অরুচি—

সে কী লো! জ্বর হইছে আগে কস নাই? তাইলে দুখান রুটি কইরা—

কইতে লাগব ক্যান। দেইখ্যা বোঝ নাই? নটকার বাঁধাবাড়ি লইয়াই তুমি—

আঃ বুড়ি! আমি না কইলে মায় ক্যামনে জানব?

ক্যামনে জানব! জাননের ইচ্ছা করলেই জানন যায়। চোখ তুইলা চাইলেই—

হইছে! তর মত সবজান্তা দিগ্‌গজ হকলে হয় নাই।

অন্যদিন হলে এই নিয়েই চিৎকার চেঁচামেচি করে একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসত সুভাষিণী। সুষমার বিরুদ্ধে তার জমানো নালিশগুলি একসাথে উজাড় করে দিত। কেঁদে কেঁদে সালিশ মানত সুবর্ণকে।

আজ সে একটুও উত্তেজিত হয় না। বরং আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শান্ত স্বরে বলে, বুড়ি ঠিকই কইছে! দোষ আমার! আমারই দোষ! বলে ঘাড় নিচু করে পাতের চারপাশ থেকে খুঁটে খুঁটে এঁটোকাঁটা তুলতে থাকে।

শোবার ঘর থেকে সুরমা তাড়া দেয়, তাড়াতাড়ি আইস না মা। আন্নার খিদা পাইছে, আর রাখন যাও না।

সুবর্ণ বলে, তুমি যাও মা। বুড়ি আর আমি থালাবাটি মাইজা—

সুষমা বলে, যাও যাও। তোমার মাইয়ায় চিক্কইরে শ্যাষে পাড়ার লোকে লাঠি নিয়া আইব।

গলায় পাড়া দিয়া থুইলেই তো আপদ যায়।

যায় তো। কিন্তু পাড়াটা দেয় কে? বাপ মা থাকতে পরে ক্যান দিব?

বুড়িকে ধমকে থামিয়ে দেয় সুবর্ণ।

কিন্তু ধমক দিয়েই তার মনে হয়—ধমক না দিলেও চলত। বুড়ির কথা হয়ত শুনতে পায়নি সুভাষিণী। মুখ বুজে যেমন নিঃশব্দে উঠে গেল!

প্রতিবারই শোয়া নিয়ে হাঙ্গামা বাধে।

আম্না হওয়ার পর থেকেই অবিনাশ আলাদা শোওয়ার ব্যবস্থা করেছে। সুবর্ণ এলে তিনটি রাত তাকে বউয়ের সাথে এক বিছানায় কাটাতে হয়।

কিন্তু তাই নিয়ে সে এমন গজগজ শুরু করে যে ভাইবোনদের সামনে লজ্জার সীমা থাকে না সুবর্ণর। যেন সুভাষিণীর সঙ্গে তার সম্পর্কটা ধর্মসাক্ষী স্বামী-স্ত্রীর নয়। যেন পরের বউয়ের সাথে শোবার জন্যে তাকে ঠেলে পাঠাচ্ছে তারই ছেলেমেয়েরা।

আড়ালে করে সুষমা বলে, ঢং ছ্যাখ বুড়ার। তাও যদি না মাঝ রাতে হামাগুড়ি দিয়া দিয়া—

চোপ!

চোপ! ভয় পাইয়া আমি উইঠ্যা বইতে, কয় কি, ম্যাচ বাক্সটা—

মুখপুড়ি! হেসে ফেলে সুবর্ণ। কিন্তু এতে অবাক হবার কী আছে? বউয়ের প্রতি অবু মাস্টারের মাত্রা-ছাড়ানো টানের কথা গাঁয়ে কে না জানত! ছাত্ররা পর্যন্ত এ নিয়ে হাসাহাসি করত। বোর্ডে ছড়া লিখে রাখত।

বন্ধুদের কাছে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারে না—কতদিন অবনী এসে বলেছে ছোটবোনকে। মা-বাপের খুনসুটিতে বড় লজ্জা পেত অবনী।

কিন্তু লজ্জা পাওয়া দূরে থাক—মা বাপের দিকে তাকিয়ে খুশিতে মন ভরে যেত সুবর্ণর। এই বয়েসেও অবিনাশ সুভাষিণী নতুন বর-বউয়ের মত খুনসুটি করে, মান-অভিমানের পালা চালায়—ছেলেমেয়েদের নিয়ে পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তখন রেষারেষি পড়ে যায়—কী ভালোই যে লাগত তার! মা-বাবার মধ্যে ভাব না থাকলে সংসারে শান্তি থাকে।

আর সকলের বাপ-মার মত তার মা-বাবাও দিন-রাত এটা-ওটা নিয়ে বাড়ি মাথায় করছে, যার-তার সামনে স্ত্রীর নিন্দা করছে অবিনাশ, স্বামীর কথা তুলে পা ছড়িয়ে বসে পাড়ার মেয়েদের কাছে নিজের দুর্ভাগ্যের কাঁদুনি গাইছে সুভাষিণী—ভাবলেই গা ঘিনঘিন করে।

সে সব দিনের কথা তো সুষমা জানে না। জানলেও মনে নেই। তখন কতটুকু ও! মা-বাবার মধ্যে ভাব থাকার অদ্ভুত আনন্দ জ্ঞান হয়ে সুষমা পায়নি।

জ্ঞান হয়ে ও শুধু দুজনকে ঝগড়া করতেই দেখছে। তাই অতি সাধারণ এই ব্যাপারটাও ওর কাছে অসাধারণ নোংরা হয়ে উঠেছে।

আজ আর অবিনাশকে নতুন করে ঘরে শোওয়ার কথা বলতে হয় না। নিজেই সে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। তামাক টানার শব্দও শোনা যাচ্ছে না। কে জানে, ঘুমিয়েই পড়েছে হয়ত।

সুভাষিণীও এরি মধ্যে খিল দিয়ে বসেছে। অন্যদিন যে-সুভাষিণী-মাঝ রাত্তির পর্যন্ত মেয়ের সাথে কাটিয়ে যায় সুখ-দুঃখের গল্প করে।

'মাইয়াটারে অখন ঘুমাইতে দাও' বলে বার বার ঘর থেকে তাড়া দিতে দিতে অবশেষে অবিনাশ রেগে ওঠার ভান না করলে যে সুভাষিণী নড়ে না।

সুষমা জিজ্ঞেস করে, বাইরে যাবি নাকি লো?

ক্লান্ত গলায় সুবর্ণ বলে, গ্যালে হইত—থাউক!

সুষমা বলে, রাতে যদি বাইরস, দাদার টর্চবাতিটা টাঙ্কের উপর থাকল লইয়া যাস। কলঘরের আলো ফিউজ হইয়া গ্যাছে।

পাশাপাশি শুয়ে দু বোন। উসখুস্ করে সুষমা।

তর শীত শীত করে, না লো? ল্যাপ আনুম?

সুবর্ণ বলে, শীত! কাঁথাতেই হাফ ধরে!

শিয়রের জানলা খুইলা দিমু?

চুপ কইরা তুই শুইয়া থাক দেখি। ঘুমা!

আমার ঘুম আইত না দিদি।

তয় আমারে ঘুমাইতে দে। ছটফট করিস না।

না, তরেও আজ ঘুমাইতে দিমু না। বলেই পাশ ফিরে সুবর্ণর বুকে মুখ গোঁজে সুষমা। আমারে একটু সোহাগ করনা লো।

ক্ষেপী!

সুষমাকে আদর করতে গিয়ে সুবর্ণর মনে পড়ে যায়—টুলু আজ একবারও তার কাছে আসেনি। সুরমা তার সাথে একটিও কথা বলেনি।

বড় পিশি গল্প বলে মাথায় হাত না বুলিয়ে দিলে ঘুম আসে না যে-টুলুর।

প্রতিবারই ব্লাউজের ছিট হোক, চুল বাঁধার ফিতে হোক—কিছু-একটা না নিয়ে এলে শিশুয়ালী অভিমানে টসটসে হয়ে ওঠে যে-সুরমার মুখখানি। 'কথা দিয়া তুই কথা রাখস না—তর লগে আড়ি। আড়ি আড়ি আড়ি!' ঠোঁট দুটি থরথর করে যে-সুরমার, দু চোখ চিকচিক করে। কিন্তু সুটকেসে সে হাত দেওয়া মাত্র পিঠে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, 'তবেরে মিথ্যাবাদী কলার কাঁদি!'

সুরমাকে বুকে টানলে টুলুকেও দূরে রাখা চলবে না। তখন তাকে নিয়ে দুজনের শুরু হয়ে যায় সে কী টানাহেঁচড়া!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে ফনী। মুখ তার গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর হয়।

চোখোচোখি হতে হাসার চেষ্টা করে যদিও।

হাসস কি! আমারে যে শ্যাষ কইরা ফেলল।

বেশ করতাছে! খুউব করতাছে। আমি ধম্ম দেখি। বলে আর দাঁড়ায় না ফনী।

হাসি পায় সুবর্ণর।

নিরুপায় বেচারা! বয়েসটা বেড়ে গিয়ে কা মুশকিলেই যে পড়ে গেছে!

কিন্তু কী আসে যায় বয়েসে? ষোল বছরের এই ফনীর সঙ্গে আঁতুড় ঘরের সেই ফনীর কি কোন তফাত আছে? সুবর্ণর কাছে?

আঁতুড়ে ফনীকে কোলে নিয়ে তাকে বসে থাকতে দেখে রাঙা ঠানদি বলেছিল, বাঃ, বেশ মানাইছে। অ মাইজা বউ—মাইয়ার অখন বিয়া দে। রান্না শিইখ্যা গ্যাছে, পোলা মানুষ করতে পারে—আর দেরি কিয়ের! অবইনা ঠিকই কয়—আর জন্মে ও—

ধেৎ! বলে লজ্জায় সুবর্ণ মুখ ফেরায় বটে, মনে মনে ভাবে—আর জন্মে কেন, এ জন্মে এই ছেলেই কি তার নিজের ছেলে হতে পারত না? তের বছরে কি ছেলেপুলে হয় না মেয়েদের? জুবেদার হয়নি?

জুবেদার মত ন বছরে বিয়ে হলে সে-ও আজ জুবেদার মত তেরো বছরে মা হতে পারত।

জুবেদার ছেলে মানুষ করে তার শাশুড়ী—কিন্তু নিজের ছেলেকে মানুষ সুবর্ণ নিজেই করত। ন বছরের মেয়ে হয়ে ননীকে, এগারো বছরের মেয়ে হয়ে সুষমাকে কোলে-কাঁকে করে মানুষ করল—আর তের বছরে মা হলে নিজের ছেলেকে পারত না? শাশুড়ীর মুখ চেয়ে থাকত? কোন্ দুঃখে?

রাঙা ঠানদির ঠাট্টায় জিদ চেপে গিয়েছিল। মাই খাওয়াবার সময়টুকুর জন্যেও ফনীকে সে কাছ ছাড়া করতে চাইত না। দেখুক সবাই—মা না হয়েও মায়ের মতই ছেলে মানুষ করতে পারে কিনা সুবর্ণ।

সুভাষিণী শেষের দিকে বলত, আর জন্মে তুই অর মা আছিলি সোনা। ও-ও চিইনা গেছে। হারামজাদা পোলার গরজ ছাড়া আমার লগে সম্পক্ক নাই! আমার কোলে আইলেই কান্দন! আমি য্যান শত্তুর!

ফনীর জন্যেই সুরমার আঁতুড়ে সে ঢোকেনি। অসময়ে স্নান করলে যদি তার অসুখ হয়? তার ফনীকে তাহলে কে দেখবে?

সেই ফনী আজ বড় হয়ে উঠেছে। বড় হয়ে উঠেছে বলে সে আর সকলের সামনে দিদির আদর কাড়তে পারে না—আবার অন্য কাউকে দিদি আদর করছে চোখ চেয়ে তা সইতেও পারে না।

ফনী আজ নেই। পড়াব অজুহাতে টুলু আর সুরমাকে কাছে আসতে দেয়নি ননী।

ননী আজ শক্ত হয়েছে। অভিভাবক হয়েছে। সংসারটাকে বাঁচাবার জন্যে মরিয়া হয়ে গেছে।

দুলালের বোনকে বিয়ে করে দেশে ফিরে যাবে। তারপর—

কিছুক্ষণ থেকে একটা অস্বস্তি বোধ করছিল সুবর্ণ। সচেতন হয়ে হদিস নেবার চেষ্টা করতেই টের পেয়ে যায় অস্বস্তির কারণ।

সুষমার মাথাটা ঠেলে দিয়ে বলে, কী সব বাজে গন্ধ ত্যাল মাখস! গা গুলায়। ওয়াতে চুল উইঠা যায় জানস না!

সুষমা বলে, খবদ্দার খবদ্দার! অমন কথা মুখেও আইন না। শুনলে ছুটকি চটব, অর বাপেও ক্ষেপব। এই ত্যাল কে দিছে জান নি? আমি যে-শাড়ি

পইরা গেছিলাম সেই শাড়ি, আমি যে-গওনা পইরা গেছিলাম সেই গওনা, আমি যে-জুতা পায় দিয়া গেছিলাম—সেই জুতা যে দিছে। ডাক্তারকাকা!

পোলাপানরে সব মানায়।

পোলাপান! ডাক্তারকাকা বাপের বাড়ি চইলা গ্যাল ক্যান জানস? ছুটকির লেইগা। সোয়ামীর লগে কাইজ্যা কইরা। এক্কেরে নাকি হাতেনাতে—

মুখ খইসা পড়ব রে মুখ খইসা পড়ব! যা-তা—

হ্যাশ সুদ্ধা ঢি-ঢি পইড়া গেছে—তুই কস যা-তা!

সুবর্ণ চুপ করে থাকে। ব্যাপারটা নতুন নয়। আগেও কিছু কিছু শুনেছে সে।

প্রথম আভাস দেয় ননী। হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল।

সুষমার স্পষ্টাস্পষ্টি কথাগুলি একদিন ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিল।

চৌদ্দ বছরের মেয়ে সুরমা—আর চুলে পাকধরা ওই ডাক্তারকাকা! মাথা খারাপ! বউ বাঁজা না হলে ডাক্তারকাকার না দাদু হওয়ার বয়েস।

লোকে অমন অনেক কিছুই বলে। নিজের ছেলেপুলে নেই বলে সুরমাকে আদর করে এটা-ওটা দেয় ডাক্তারকাকা, গাড়ি করে বেড়াতে নিয়ে যায়, সিনেমা দেখায়। ঘন ঘন সুরমার সিনেমায় যাওয়া নিয়ে সে অবশ্য রাগারাগি করেছে—কিন্তু এমনি বেড়াতে গেলে দোষ কি? লোকের সহ্য হয় না। তা পরের ভালো তো সহ্য লোকের হবেই না।

অবিনাশও যে এতে খারাপ কিছু দেখে না—জানিয়ে দিয়েছিল সুবর্ণকে।

তাই শুনে সুষমা বলেছিল, তরে আর কি কমু। তরে কিছু কইয়া লাভ নাই। বাপেরে তুই বড় বিশ্বাস করস—বড় বেশি বিশ্বাস করস!

নিজের বাপেরে বিশ্বাস করুম না? নিজের বুইনরে বিশ্বাস করুম না?

না, কেউরে না। মা বাপ ভাইবুইন কেউরে না।

ক্ষেপী! তর মাথার গোলমাল এখনতরি—

আমি ক্ষেপী! আমার মাথায় গোলমাল! তেতে উঠেছিল সুষমা, মারে ছুটকি কি কইছে জানস? কয়, দিনরাত টিকটিক না কইরা, পড়ার

নছল্লা বাদ দিয়া—বিয়া দাও না ক্যান আমার? তোমারও আপদ নামে—আমিও দম ফেইলা বাঁচি!

বিয়া বইতে চায় কার লগে? ওই বুড়ার?

বুড়া হউক ছুঁড়া হউক—পুরুষ হইলেই হইল। হারামজাদা দিনরাত ওই এক জ্বালায় জ্বইলতাছে।

সুবর্ণ চুপ করে গিয়েছিল। কেন না প্রমাণ না পেলেও এর কিছু কিছু আভাস সে-ও পেয়েছে।

চোদ্দ বছরের মেয়ে, কিন্তু এক‌েক সময় সুরমার চোখমুখ দেখে মনে হয়—বয়েসে সে বুঝি সুষমারও বড়। ছোট্ট বোনটি হয়ে কথা বলতে বলতে হঠাৎ যেমন সখী হয়ে উঠতে চায়!

সামলে নেয় অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু অত সহজে সামলে নেওয়াতেই খটকা লাগে আরও।

তখন খেয়াল হয়, চোদ্দ বছরও কম না। দেশে থাকলে, পড়াশোনা না করলে—সুরমার চালচলন আজ অন্য রকম হয়ে যেত। এই ছেলেমানুষি ভাবসাব আর থাকত না। মেয়ে না চাইলেও মা-দিদিরাই মেয়েকে সব জানিয়ে-বুঝিয়ে পাকা করে দিত।

যেমন দিয়েছিল চিনুর মা দিদিরা চিনুকে। এগারো বছরে এমন পাকাই হয়ে উঠেছিল চিনু যে সইয়ের কথা শুনতে শুনতে সুবর্ণর কান পর্যন্ত ঝাঁ ঝাঁ করে উঠত।

চিনুর মত পাকা না হোক, এই বয়েসে সুরমার মত ছেলেমানুষ ছিল না সুবর্ণও।

রানুবৌদির ফুলশয্যায় আড়ি পেতে যেবার বেশ কিছুদিনের জন্যে রাতের ঘুম তার উবে গিয়েছিল, তখন তো সে চোদ্দতেও পা দেয়নি। ঘরে খিল দিয়ে ইচ্ছে করে ফনীকে কাঁদিয়েই সঙ্গে সঙ্গে কান্না-থামানোর গতানুগতিক কায়দাটা যখন খাটাতে শুরু করেছিল—তখন তো সে তেরো পেরিয়েছে সবে।

সুবর্ণ জিজ্ঞেস করে, বাবায় কিছু কয় না? এয়ার পরেও ডাক্তারকাকীরে লইয়া কইনারে বর্ধমান যাইতে দিল?

কইব ! আরও উসকাইয়া দেয়। টাকার লেইগা—

জিব টাইনা ছিড়ুম কইল বুড়ি !

নাইলে বউয়ের গওনা হয় ক্যামনে ? পুরানা গওনা ভাইঙ্গা করছে ? কইলেই হইল ? শাঁখা আর লোহাগাছ রাইখা তুই না সব বেইচা দিছিলি—মনে নাই ?

সেকথা মনে না থেকে পারে !

মনের ভুলে সোনা-বাঁধানো লোহাটাও খুলে ফেলে হঠাৎ সুভাষিণীর সে কী কপাল চাপড়ে হাউ হাউ কান্না।

এখনও কানে বাজে। চোখ বুঝলে এখনও দৃশ্যটা হুবহু দেখতে পায় : দু হাতে চুল ধরে দেয়ালে কপাল ঠুকছে সুভাষিণী, পিছন থেকে তাকে জড়িয়ে ধরেছে অবিনাশ—অগো না না, তোমায় ফেইলা আমি মরুম না গো মরুম না ! নাইলে আস্ত পাথান গ্যালেও বাঁইচা আছি !

নিজে থেকেই স্বর্ণ মায়ের গয়নাগুলি চেয়ে নিয়েছিল। বছরের মাঝখানে ননীদের ভর্তির ফি, মাইনে, বইপত্র, জামাকাপড়—এক সঙ্গে অনেকগুলি টাকার ধাক্কা। এতদিন পড়াশোনার দিকে তেমন নজর না দিলেও আর ওটা উপেক্ষা করা চলে না।

লেখাপড়া শিখে ননীরা মানুষ হয়ে উঠলেই না সব কিছুর ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে ? নইলে কোন সান্ত্বনা সম্বল স্বর্ণর ? শুধু খেয়ে বেঁচে থাকা ? সে তো জন্তু-জানোয়ারেও থাকে !

সুষমা বলে, আমিও মন বাঁধছি। আমারে তো দশ হাজার দিয়া কেউ বিয়া করব না। দুলাল গো সেই ভাড়াইটারেই আমি—

তাই নাকি !

ত্যাখ না !

একটা যক্ষ্মারোগীরে তুই—

দোষ কি—এদেশী না তো ! আমাগো লগে খুব মিশ খাইবরে দিদি ! সংসারে একটা মানুষের খরচ কমব—

যমে যার হাত ধরছে—

ধরুক। ধইরা নিয়া যাক। বিধবা হইলেও খাওয়া-পরা আটকাইব না। হের কত টাকা জানসনি! দুলালরে খাতির করি সাধে!

টাকা, টাকা আর টাকা! কেন টাকার জন্যে ননী আর সুষমা এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে?

সুবর্ণকে দেখেও আক্কেল হল না?

সস্নেহে সুবর্ণ বলে, বাজে মতলব ছাড়ান দে। পরথম দিন কিছু কইলাম না—এয়ারপর ঝাটাপিটা করুম কইয়া থুইলাম।

অঃ! বড় ডর তরে!

দেখন যাইব! শাড়ি পইরা লায়েক হইছ, না? আমি দিদি, মনে থাকে য্যান! আমি থাকতে তগো টাকার ভাবনা কি লো! আর বাবাই বা পরের টাকা দিয়া গওনা গড়াইব ক্যান? সংসার খরচ বাঁচাইয়া—

সংসার খরচ বাঁচাইয়া! নুন আনতে পান্তা জোটে না। সংসার খরচ বাঁচাইয়া বউয়ের হার গড়ায়েন!

পুরনো গয়না ভাঙার কথাটা অবশ্য সুবর্ণরও বিশ্বাস হয়নি—তবে প্রতিবাদও করেনি। মনই তার প্রতিবাদ করতে চায়নি।

ছাখ তো মা জিনিসটা কেমুন হইছে—কয় তো নতুন ডিজাইন। কই, সিধা হইয়া খাড়াও না গো।

ভাঙাচোরা মুখখানিতে অপরূপ হাসি ফুটিয়ে আলোয় বুক খুলে সোজা হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল সুভাষিণী—অবিনাশের কথায় যত্তসব ইয়ে' বলে ছিটকে ঘর থেকে চলে যায়। যেতে যেতে বলে, দিন দিন বয়স কমে না বাড়ে? এ হার আমি অখনি খুইলা—

চিৎকার করে অবিনাশ বলে, না না—খুইল না, খুইল না। তুমি অখন পইরা থাক, বুড়ির বিয়ার সময় রঙ কইরা অরে দিমু। গিন্নী মাইনষেরে খালি গলা বড় খারাপ ছাখায়, নারে সোনা?

ঠিক কইছ বাবা। ও হার মায়ে পরুক—বুড়ির বিয়ার গওনার লেইগা তুমি ভাইব না। সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়েছিল সুবর্ণ। কতদিন পরে মায়ের মুখে এমন হাসি

দেখল ! এমন পুরনো-পরিচিত সুরে মার সাথে বাবা কতদিন পরে কথা বলল ! এর পরেও কি মন তার সায় না দিয়ে পারে ?

আন্না হওয়ার পর থেকেই মেজাজ যা তিরিক্ষি হয়ে গেছে অবিনাশের ! সুবর্ণর তো রীতিমত ভয়ই করে : মা বাবার ঝগড়াঝাঁটির জন্যেই না বাড়ি আসা তাকে বন্ধ করতে হয়। তিন দিনের জন্যে এসেও অশান্তি !

পরের মাস থেকে টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। সংসার খরচ বাঁচিয়ে যদি হার হতে পারে—এবার নাকছাবি হোক। সধবা মানুষের নাকে সোনা না থাকলে চলে ? তারপর দু হাতে দু গাছ করে রুলি হোক—মা রাগারাগি শুরু করলে পাল্টা চেঁচিয়ে উঠে মার চিৎকারকে বন্ধ করে দেবার বদলে হাত দুটি বাবার যেন সুড়সুড় করে ওঠে মার হাতের দিকে চোখ পড়া মাত্র হাত ধরে মাকে কাছে টানার জন্যে।

সুভাষিণীর অভিমান ভাঙাতে কী না একদিন করত অবিনাশ ! শুধু দুহাত ধরে ক্ষমা চাওয়া নয়—ছেলেমেয়ের সামনেই পায়ে হাত দিতে যেত পর্যন্ত।

সে-সব দিনের কথা কি সুবর্ণ ভুলতে পারে ! ভুলতে কি চায় সুবর্ণ !

কিন্তু ভুলতে না চেয়ে কী প্রচণ্ড ভুল করে বসেছে ! সংসার খরচ বাঁচানোর টাকায় হার হয়নি বুঝেছিল কিন্তু ডাক্তারকাকার থেকে টাকা নিয়েছে বাবা ? নিয়েছে ওই ভাবে ? এখনও নিচ্ছে ?

বাবাকে এত ছোট কী করে ভাবে সুবর্ণ ! কী করে সে ভাবে যে ডাক্তার-কাকার টাকায় তৈরি হার গলায় পরে তার সামনে দাঁড়িয়েছিল মা ? মুখ তুলে ?

দাঁত দিয়ে সুবর্ণ ঠোঁট কামড়ে ধরে !

দিদি ! ফিসফিস স্বরে সুষমা বলে, ফের তারে স্বপ্ন দেখছি !

কারে ?

রাইক্ষুসীরে ! পোড়ারমুখীরে !

বুকটা সুবর্ণর ছ্যাঁৎ করে ওঠে। সত্যিই রাক্ষুসী ! পোড়ারমুখী ! সেই রাক্ষুসী পোড়ারমুখী শুধু সুষমাকেই স্বপ্নে দেখা দেয়নি, একটু আগেই দেশে ফিরে যাওয়ার স্বপ্নের সুতো ধরে তারও চোখের সামনে দাঁড়িয়েছিল এসে। জাগ্রত অবস্থায়।

কাইন্দা কাইন্দা কয়—আমাগো একটা গতি করলা না ঠাকুরঝি! তোমার দাদারে শিয়ালে ছিইড়া ছিইড়া খাইল—আমারে—

কইস না! কইস না!

কয়—তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুরঝি, একটা গতি কর, বাবারে কইয়া আমাগো একটা গতি কর। নাইলে এ পোড়া ভিটার মায়ায় যে আমরা—

শুধু ভিটার মায়ায়? শুধুই পোড়া ভিটার মায়ায়? আর কিছুর মায়া নেই?

আর কিছু কয় নাইরে রাইক্ষসীটা? আর কিছু কয় নাই?

আর কী কইব! খালি কান্দে হাত ধরতে আসে। কয়—লজ্জায় তোমার দাদা মুখ লুকাইয়া পলাইয়া আছে ঠাকুরঝি। জিগাইলাম, লজ্জা ক্যান বৌদি? লজ্জা ক্যান? কয়—বড় পোলা হইয়াও সংসারের কামে লাগল না—হেই লজ্জা! মুখ বুইজা মইরা গ্যাল একটারেও নিয়া মরতে পারল না—হেই লজ্জা!

শুধু এই!

আর কিছু বলেনি? বলেনি যে, ঠাকুরঝি, এতদিন পরে গাছ ভরে বকুল ফুটেছে, বকুলের গন্ধে সারা বাড়ি ম ম করছে—আজও আমায় মনে পড়ছে না ঠাকুরঝি? মনে পড়ছে না? মনে পড়ছে না!

তবে কেন একটু আগেই বাড়ির কথা মনে পড়তে, সেই সেদিনের সেই ছবিটাও মনে সুবর্ণর পড়ে গিয়েছিল?

সব সময় বাপের বাড়ির গল্প করত বৌদি. বাপের বাড়ির ফুলবাগানের নানান গল্প। ফুল বড ভালোবাসত বৌদি। ডাকনাম যার পুষ্প ছিল।

অথচ ফুলের গাছ এ বাড়িতে একটাও নেই। শিউলি ফুল কি ফুল নাকি' করবী ফুল ফুল নাকি! যে-ফুলের গন্ধ নেই সে-ফুল ফুল নাকি!

বটে!

হঠাৎ একদিন বাবুদের বাড়ি থেকে বকুল ফুলের একটা চারা নিয়ে আসে অবনী। নিজে হাতে মাটি কুপিয়ে চারা লাগায়।

উৎসাহে কোমরে আঁচল জড়ায় বৌদি। গাছে জল দেবার ভার যেচে নেয়।

আমি আউটসাহী গ্যালে, এই ফুলের গন্ধে আমারে তোমাগো মনে পড়ব ঠাকুরঝি। মনে পড়ব তো ঠাকুরঝি? বলে আড়চোখে অবনীর দিকে চাইত বৌদি।

আমি ঢাকায় থাকলে এই ফুলের গন্ধে আমাবে তগো মনে পডব। মনে পড়ব তো রে সোনা-বুড়ি? বলে আড় চোখে বৌয়ের দিকে চাইত অবনী।

দশ বছরের মেয়ে সুষমা সায় দিত ঘাড় নেড়ে।

দুজনের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বেহায়ার মত সুবর্ণ বলত, এ গাছে যখন ফুল ফুটব, আমি তো তখন পরের মাইয়া!

সেই গাছে আজ ফুল ফুটেছে। আট বছরেরও বেশি তো হয়ে গেল!

সেকথা একবারও বলেনি রাক্ষুসীটা? বলেনি? তবে কেন শত শত মাইল দূর থেকেও খানিক আগে হঠাৎ বকুলের গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করে উঠেছিল সুবর্ণর? বাসী বকুলে থইথই বকুলতলার একটি ছবি স্পষ্ট চোখে ভেসে উঠেছিল? দাদা-বৌদির সেই আড়ে আড়ে চাওয়া মনে পড়ে গিয়েছিল? কেন? কেন!

গুমরে গুমরে কাঁদে সুষমা।

বোনকে কাঁদতে দেয় সুবর্ণ। আহা, দাদা-বৌদিকে উপলক্ষ্য করেও একটু কাঁদুক! কাঁদুক! প্রাণ খুলে একটু কাঁদতে পাবা কি কম সৌভাগ্য! যে-সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত সে।

তারপর বলে, আমার একটা কথা রাখ বুড়ি—গৌররে তুই বিয়া কর। আমি ব্যবস্থা করতাছি। বিয়ার পর হগ্‌গলটি মিলা—

খেপছস! এদেশী! মাথা গরম!

পুরুষ মানুষ মাথা গরমই তো ভালো রে।

গরিব!

গরিব তো কী হইছে। তর লেইগা কত গওনা গড়াইয়া রাখছি জানস—

তর মায়েরে দে! বাপে খুশী হইব।

গৌরের লগে বিয়া হইলে তুই সুখী হবি, বুইন, আমি কইতাছি তুই সুখী হবি—শান্তি পাবি—

গরিবের সুখ! গরিবের শান্তি!

বোকার মত কথা কইস না।

বোকা! তুইও কস আমি বোকা!

সেলাইয়ের কামকাজ কইরা তুইও রোজগার করবি, গৌরও—

ঝাড়া হাত পা হইয়া পার্টি কইরা বেড়াইব!

চটে যায় সুবর্ণ। গৌরের পার্টি করা নিয়ে গৌরকে বহুবার খোঁচা দিয়েছে সুষমা। গৌর শুধু হেসেছে।

আর বলেছে, আচ্ছা বলুন তো দিদি, সাধ করে কেউ পার্টি করে? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়? আপনার বোন কেন বোঝে না যে, লড়াই না করে আমাদের মত মানুষ আজকাল টিকতে পারে না। নির্ঝঞ্ঝাটে সংসার করতে কে না চায় দিদি! কিন্তু—

ঠিকই বলত গৌর। শান্তিতে কি আজকের পৃথিবীটা বাঁচতে দেয় মানুষকে? এত বুদ্ধিমতী মেয়ে সুষমা, এত বোঝে—দিদির দিকে তাকিয়েও এটা বোঝে না?

চটা সুরে সুবর্ণ বলে, পার্টি করে তো করব! না খাইয়া তুই সোয়ামীর ঘর করবি! সোয়ামীর লগে না খাইয়া মরবি!

বলা সহজ, করা না। খিদার জ্বালা বড় জ্বালারে! শ্যাষকালে তর মা-বাপের মত মাইয়ার রোজগারে—! তর বাপে যেমুন—

আমার বাপ তর বাপ না?

না। অমন বাপ থাকনের থেইকা—

বুড়ি!

হুঁঃ। বাপেরে তুমি খুব চিনছ। সামনে সোহাগে গইলা পড়ে, তুই চইলা গ্যালে কী সব কয়—

কী কয়?

কী না কয়! পোলাপানগো সামনে! সেদিন—

হঠাৎ সুষমা চুপ করে যায়।

থামলি ক্যান? সেদিন কী?

কিছু না!

কিছু না মানে—তরে কইতেই লাগব। বলে জোর করে সুষমাকে কাছে টেনে আনে সুবর্ণ।

হে কথা আমি মুখ ফুইটা—

ক কইতাছি!

না না না!

চাপা চিৎকার করে সুবর্ণ বলে, এখনও ক কইতাছি—নাইলে অখ্খনি আমি গিয়া বাবারে উঠামু—তারেই জিগামু—

তয় তাই যা লো, তাই যা—তর বাপেরে গিয়া জিগাইয়া আয়—জামাইবাবু খাওনের পর টুলুর সামনে মায়ের লগে কী কথা কইছিল হেয়? কী কথা কইছিল! বলতে বলতে দিদির বুকে মুখ লুকোয় সুষমা। ক্যান টুলু খাওনের সময় ছোড়দারে জিগাইল—খানকী কারে কয় মেজকা? খানকী অইলে কি হয়? বড় পিশি—

বুড়ি!

বড় পিশি খানকী হইছে মেজকা? টুলুর কথা শুইনা—

বুড়ি!

টুলুর কথা শুইনা ক্যান ছুটকি হাইসা ফেলছিল? তাইতে ক্যান ফইনা—

অরে থাম বুড়ি, থাম থাম—!

তাইতে ক্যান ফইনা টুলুরে থাপ্পড় মারতে তর বাপে তারে মুখ ঝামটাইয়া উঠছিল—টুলুরে মারস ক্যান হারামজাদা? কথাটা কি ও মিছা কইছে? বড় মাইয়া আমার খানকী হইয়া গ্যাছে কে না জানে!

হঠাৎ সুবর্ণ উঠে বসে। হঠাৎ সুবর্ণর দম আটকে আসে।

পৃথিবীতে যেন হাওয়া নেই এক ফোঁটা।

পুরনো বাড়ি থেকে উচ্ছেদের নোটিশ পেয়ে মানদা মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল।

বাড়ি অবশ্য সে না ছাড়লেও পারত। শুধু ভাড়াটে বদলালেই চলত।

কিন্তু গেরস্থ ভাড়াটে আর কত ভাড়া দেবে? তাও কি দেবে ঠিক মত? বাকিবকেয়া ফেলে জ্বালিয়ে মারবে। তা নিয়ে কিছু বলতে গেছ কি—পুরনো কথা তুলে হইচই বাধাবে। নিজেই তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি বলে পালাবার পথ পাবে না।

গেরস্থ ভাড়াটেরা যা ত্যাঁদড়! থাকমণির হাল দেখেই আক্কেল তার গুড়ুম হয়ে গেছে।

গুইরাম বলেছিল, দুদিন বাদে মরবি, এখনও তোর ট্যাকার লালচ গেল না! বলি দরকারটা কী ফের বাড়িউলী হবার? চিলেকোঠার ঘরখানা রেখে বাড়ি ছেড়ে দে—এ কটা দিন রাধাকেষ্টর নাম জপে কাটা।

মুখে না হয় রাধাকেষ্ট করলাম রে মুখপোড়া, পেট? বুড়ি হয়েছি বলে পেটটা তো ফৌত হয়ে যায়নে রে ড্যাকরা!

পুঁজি ভেঙে খা। ব্যাঙ্ক থেকে তোল। ও টাকা ফুরোতে ফুরোতে তুই ফৌত হয়ে যাবি নির্ঘস। তুই ফৌত হলে ও ট্যাকা তোর খাবে কেরে ঠকিবুড়ি?

ব্যাঙ্ক! ওরে গুয়োর ব্যাটা! সেই হাজরার পো যে কী সব্বনাশটা মোর করে গেছে, জানিসনি তুই? মনে নাই তোর? নাকি জেনেশুনে চৈতন সাজা হচ্ছে? সুদে আসলে বাড়বে বলে মোর সব্বস্ব—। বলতে বলতে তামাদি হয়ে যাওয়া টাকার শোকটা উথলে ওঠায় ডুকরে উঠেছিল মানদা। হাজরাকে যা-নয় তাই বলে গালাগাল শুরু করেছিল।

গুইরামকেও ছেড়ে কথা কয়নি।

মানদা যখন চড়া সুদের লোভে ব্যাঙ্কে রাখার জন্তে টাকাগুলি পুঁটলি বেঁধে নিয়ে হাজরার হাতে তুলে দেয়—গুইরাম তো সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল? সে

তখন একবার চোখ টিপতে পারেনি? মাসির ওপর না বড় দরদ গুইরামের? সিকিটা-আধুলিটা দরকার পড়লে মাসি বলে না একেবারে গলে পড়ে গুইরাম? সে কি স্রেফ সিকিটা-আধুলিটা আদায়ের মতলবে?

দোষ কবুল করে সখেদে গুইরাম বলেছিল, ও শালার ব্যাঙ্ক যে রাতারাতি গোঁত্তা মারবে কি করে বুঝব বল! নইলে আজকাল তো ব্যাঙ্কে-পোস্টাপিশে টাকা সবাই রাখে। ভালো ভেবেই আমি—

ভালো ভেবে! তোরও ষড় ছিল। আমাকে ফাঁসাবার তরেই—

মওকা পেইচিস—বলে নে! বাধা দিয়ে গুইরাম বলেছিল, তালে ওই চাপোষা হাজরা কেন—ব্যাঙ্কের সেই হোমরা-চোমরা কত্তাদের সাথেই ষড় ছিল বল? নইলে হাজরার সাথে গিয়ে ট্যাকা জমা করিয়ে রসিদ তো তোকে বুঝিয়ে দিয়েছিলুম! তবে? যাক, মাসি তালে গুইরামকেও একটা কেষ্টবিষ্টু ঠাওরায়? বেশ বেশ! জিতা রহ মানী বাড়িউলী—

দূর হ মুখপোড়া ঢ্যামনা! বেরো—বেরো!

কিন্তু গুইরামকে সে দূর দূর করলেও গুইরামই বাঁচিয়ে দেয় শেষ অবধি।

প্রাণটা আর কতকাল টিকে থাকবে ঠিক নেই। তাই নতুন করে জমানো হাজার দুয়েক নগদ আর পুরানো টুকিটাকি গয়নাগুলি দিয়ে না মরা পর্যন্ত কী করে প্রাণওলা দেহটাকে খাওয়ানো-পরানো যায়—বাড়ি ছাড়ার নোটিশের মেয়াদ ফুরোবার দুদিন আগে এই ভাবনায় মানদার যখন মাথা খারাপের যো হয়েছিল, নিভাননীর কথা মত একেবারে ফতুর হবার আগেই মানের বালাই শিকেয় তুলে পানের স্যুটকেস আর বালতি নিয়ে আপিশ-পাড়ায় রওনা দেবে কিনা ভেবে ভেবে দিশা পাচ্ছিল না—গুইরাম এসে বলে, জবর খবর আছে মাসি। জবর সুখবর!

প্রথমে মানদা পাত্তা দেয় না। যা যা—এখন দিক্ করিস নি। ভাগ!

না শুনেই ভাগ্যে দিচ্ছিস?

তোর কথা শুনলে মোর পিত্তি জ্বলে। তোর মুখ দেখলে মোর—

বেশ। তালে আঙুর মাসিকেই খবরটা গিয়ে দি। ও বাড়ি পেলে তড়াক্সে আঙুর লুফে নেবে। গুইরাম পেছন ফেরে।

তাড়াতাড়ি তাকে হাত ধরে বসায় মানদা। হঠাৎ-হাসিতে গলে পড়ে।

বাড়ি? পেইচিস? কোথায়? অ্যাঁ?

উহুঁ বাব্‌বা, গায়ে হাত বুলোলে গুইরামের কথা ফুটবে নি—এক নম্বর দমভর।

মাইরি বাড়ি পেইচিস?

খোদা মালুম! ছাড়, উঠি। আঙুর মাসির সাথে দেখাটা করে আসি।

গুইরাম ছাড়াবার নাম মাত্র চেষ্টা না করলেও আরও জোর তাকে ধরে রাখে মানদা। বলে, তোকে কি আমি মাল খাওয়াই না শুয়ে, না, বেঁচে থাকলে খাওয়াব নি! ঘরে নেই, ট্যাকা দি—কেমন?

সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়ায় গুইরাম।

খবর না শুনেই খবরের দাম দিতে বড় দোটানায় পড়ে গিয়েছিল মানদা।

কিন্তু না, গুইরাম তাকে ধাপ্পা দেয়নি। ট্রাঙ্ক খুলে তিনটি টাকা গুণে বার করতে সে মিনিট দশেক সময় নিয়েছিল বটে, বাড়ি দেখে মনে হয় তিন কেন—দাঁ করে দশ টাকার একটা নোটই উচিত ছিল তার দিয়ে ফেলা।

বড় রাস্তার ওপর নতুন দোতলা। নিচে পাশাপাশি পাঁচখানা দোকান ঘর: মনোহারী, জ্যোতিষালয়, ড্রাইংক্লিনিং, সোনারূপা আর পানবিড়ি। পানবিড়ির গায়ে প্যাসেজ। প্যাসেজে ঢুকে ক পা গেলে বাঁ দিকে সিঁড়ি। দোতলায় সিঁড়ির মুখ থেকে পাশাপাশি চারখানা ঘর। ভেতর দিকে বারান্দা, রাস্তার দিকেও বারান্দা। ভেতরের বারান্দা ডান দিকে মোড় নিয়ে আরও দুটি ঘরের বারান্দা হয়ে পায়খানা-কলঘরের দরজায় হারিয়ে গেছে।

বাড়ি দেখে খুশি মানদার উথলে পড়ে।

গুইরাম বলে, কিন্তুক কথা আছে।

মানদা বলে, সেলামি? সেলামির তরে—

উহু—অন্য কথা।

সাড়ে তিনশ ভাড়া বলে বলছিস? তা—

ধেত্তেরি! এ বাড়ি পেলে ভাড়া-সেলামির পরোয়া যে মানী বাড়িউলী করবে না, সে গুইরাম জানে। কথা হল গিয়ে—

এখানে ঘর নিলে ওখানকার চালচলন ছাড়তে হবে। এটা ভদ্রপাড়া। এ বাড়িরই ওপাশটায় থাকে কয়েকটি মাড়োয়ারী পরিবার। নিচেও ভেতরের দিকে আছে অন্য ভাড়াটে। অবশ্য উঁচু দেওয়ালের আড়াল থাকায় কারো সাথে কারো মুখ দেখাদেখি নেই। কিন্তু বড় রাস্তার ওপর বাড়ি! দিনের বেলা বাইরের দিকে সব জানালা বন্ধ রাখতে হবে। রাতে পর্দা টেনে খোলা চলতে পারে বটে কিন্তু সদরে দাঁড়ানো দূরে থাক বাইরের বারান্দাতেও উঁকিঝুঁকি চলবে না।

এখন বুঝে দেখ!

পুলিশ? লাইসেন—?

ভাট! পুলিশ জানবে। পুলিশ না জেনে পারে? কিন্তুক বেচাল দেখলে, পাড়ার লোকে উঁ-আঁ করলে, ঘাড় পাকড়ে উঠ্যে দেবে। তখন নো ছাড়ান-ছোড়ান।

শর্ত শুনে মানদা হাঁ হয়ে যায়: বাইরের মানুষ নিয়ে কারবার যাদের, তারা সেজে থাকবে ঘরের বউ?

গুইরাম অবশ্য আছে, কিন্তু গুইরাম-রঘুনাথরা থাকা সত্ত্বেও বড় বাড়ির, লাল বাড়ির, আঙুরের বাড়ির মেয়েরা কি থেকে থেকে বারান্দার রেলিংয়ে এসে বুক চেপে দাঁড়ায় না? পান কেনার ছলে বাইরে থেকে হুটহাট চক্কর দিয়ে আসে না? কেউ কেউ ধরমতলার হোটেল পর্যন্ত ধাওয়া করে না?

একেবারে পরের মুখ চেয়ে থাকলে চলে?

কি মাসি—ঘাবড়ে গেলি মনে লিচ্ছে? গুইরাম হেসে বলে, তুই বড় সেকেলে মাসি। বড্ড সেকেলে! জানিস, আজকাল ভদ্দরলোকে ও পাড়ায় যায় না। এই রাস্তার ওপরেই এমনি বাড়ি আরও খান কয়েক আছে? তেরো নম্বরের যা রোজগার—তোর ওই তামাম নবাব বক্স বাই লেনের তার আদ্দেকও না।

তবু মনের কিন্তুটা যায় নি মানদার। মোটা সেলামি! মাসে সাড়ে তিনশ করে ভাড়া! সাত তারিখে দারোয়ান এসে কড়া নাড়া মাত্র ডান হাতে টাকা দিয়ে বাঁ হাতে রসিদ নিতে হবে! রান্নার ঘর নেই, ঘরে রান্নাও চলবে না! কম খরচ হোটেলে খাওয়ার!

গুইরামের হাতে-পায়ে ধরে ঘণ্টা কয়েকের সময় নিয়েছিল মানদা।

কিন্তু-কিন্তু করে কুন্দদের কাছে কথাটা পেড়েছিল :

বাড়ি তো শুধু মানদাকে একা ছাড়তে হচ্ছে না। কুন্দদেরও এখানকার পাট তুলতে হবে। কী করবে ওরা? ওরা কি পাঁচুবালার ওখানে গিয়ে উঠবে? না, বড় রাস্তায় মানদা যে-বাড়িটা—

প্রস্তাবটা লুফে নিয়েছিল কুন্দরা।

ঠিকই বলেছে গুইরামদা। একেবারে প্রাণের কথাটা বলেছে কুন্দদের এ বাড়িতেই অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল, এর পর পাঁচুবালার ওই কানা গলিতে ঢুকলে সবাইকে নির্ঘাত উপোসে মরতে হত: ভদ্রঘরের মেয়েদের জন্যে কি বাঁচার যো আছে! নেহাত আমাড়ী-আহাম্মক ছাড়া এ পাড়া কেউ মাড়ায় আজকাল?

আর আসে ঘাগীরা। আধ ঘণ্টার কড়ারে ঢুকে তিন ঘণ্টা কাটিয়ে যায় কথায় কথায় হল্লা বাধায়।

ভদ্র না সাজলে ভদ্রঘরের মেয়েদের সাথে পাল্লা দেবে কি করে কুন্দরা? ওরা যেমন তাদের ভাতে মারছে, তারাও তেমনি ওদের জাতে মারবে। দুদিন বাদে ভদ্রলোকেরাই ভড়কে যাবে নিজেদের মা বোনের দিকে তাকিয়ে।

হাঁ! এই লাখ কথার এক কথা বলে রাখল বুলবুলি, সবাই যেন মনে রাখে।

চিন্তিতভাবে মানদা বলে, কিন্তুক ভাড়া কত জানিস! ছখানা ঘরে পাঁচশ! গোরখানা বাদ দিলে থাকে গিয়ে পাঁচ—কমসে কমসে সোয়াশো করে না দিলে— সেলামির হাজার ট্যাকা তো উশুল করতে হবে?

ওতে আটকাবে না মাসি। রেটও তেমনি ডবল তিন ডবল হয়ে যাবে রোজগারপাতি হলে কি ভাড়ার তরে এসে যায়? না কি বালসরে লিলি?

ঠিক ঠিক।

রান্নার কোন হাঙ্গাম—

ওইতো বললুম—ভগবান মুখ তুলে চাইলে, ঘরে বসে দুবেলা হোটেলের খানা পাব। একবেলা মাছঝাল-ভাত, আরেক বেলা চচ্চড়ি-ভাত গেলার দায় থেকে বেঁচে যাব।

তা দয়া ভগবান করেছেন।

ভালোভাবেই আছে মেয়েগুলি। সকলেরই গায়ে মাংস লেগেছে। সত্যিকারের সোনার গয়না দু চারখানা করে বাক্সে ঢুকেছে। বছর পুরতে না পুরতে ঘর-সাজানোর ভাড়া-করা জিনিসগুলি জন্মের মত আপন হয়ে গেছে।

এখন আর রেডিও শোনার জন্যে ছাদে উঠে আঙুরের বাড়ির দিকে কান খাড়া করে থাকতে হয় না মানদাকে, কুন্দর ঘরে ঢুকলেই চলে। হারমোনিয়ামের দরকার পড়লে এ-ঘর ও-ঘর ছুটতে হয় না পরীকে, ফরাস থেকে হাত বাড়ালেই মেলে। মানুষ পোষার খরচ জেনেই কলের গান কিনেছিল লিলি, প্রতি মাসে নতুন নতুন রেকর্ডও কিনে চলেছে। অমন বেহিসেবী না হলে পটলও ওদের মত গুছিয়ে নিতে পারত।

একবারও সাত তারিখে এসে ফিরে যায়নি দারোয়ান।

ভগবানের দয়া না হলে এমন হয়?

ভগবান যে কী ভীষণ দয়ালু, বুলবুলির ব্যাপারেই তা বুঝে গেছে মানদা। খুনের দায়ে না জেলে যেতে হয় ভেবে সে যখন ভয়ে মরছে, হাঙ্গামার জের মিটলেও যখন তার বুকের কাঁপন থামেনি—মাসের মাথাতেই নতুন ভাড়াটে জুটিয়ে দিলেন ভগবান। ঘর খালি পড়ে থাকলে মানদার ভাহা লোকসান বলেই না?

নইলে হেরম্বর সাথে তার এমন কী খাতির ছিল? আগের বাড়িতে পটলের কাছে মাঝেসাঝে আসত লোকটা। দেখাদেখি তখন মাসি বলে ডাকত। সেকথা মনে রেখে এতদিন পরে খোঁজ নিয়ে সে কি এসেছিল অম্নি—পেছন থেকে ভগবান তাকে ঠিকানা বাৎলে ঠেলা না দিলে?

ভগবান না জোটালে অত সহজে কি ওঘরে ভাড়াটে জুটত? যেমন-তেমন একখানা ঘরের জন্যে যে-শোভা বাড়ি বয়ে এসে রোজ অত সাধাসাধি করেছে—ঘর খালি হয়েছে টের পেয়েও কি এমুখো আর হয়েছিল সে?

শুধু ওই ঘরের ভাড়াটে নয়, মানদার এক মাসের ভাড়ার লোকসান ভগবান পুষিয়ে দিয়েছেন বছর খানেকের মধ্যেই স্থায়ীভাবে তার ঘরেও এক ভাড়াটে ঢুকিয়ে দিয়ে।

গোড়ায় অবশ্য সে রাজী হয়নি : দিনের বেলা না-হয় এক ঘরেই কাটাল —কিন্তু রাতে ?

রাতে ! ধমক দিয়ে উঠেছিল গুইরাম, রাতের ভাবনা অত ভাবছিস কেন ? সব রাতেই সব ঘরেই রাতভোর মাইফেল চলে ? খালি ঘরে এক পাশটিতে পড়ে থাকার জায়গা তোকে দেবে না কেউ ? কে দেবে না শুনি ? বলেই হাঁক পেড়েছিল—কুন্দ ! পটলি ! লিলি ! পরী ! সাবি !

আপত্তি করার বদলে, মানদার কথা শুনে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল কুন্দরা : ওমা ! মাসি তাদের এত পর ভাবে ! ছি ছি ছি ! ওঘর আটকা থাকলে তাদের ঘর খালি থাকলেও রাতটুকু তারা মাসিকে একটু শুয়ে থাকতে দেবে না ? এমন কথা মাসি বলতে পারল !

মেয়েগুলি সত্যি ভালোবাসে মানদাকে। মানদার জন্যেই যে তাদের বাড়বাড়ন্ত, কেউ ভোলেনি।

মানদাও ভোলেনি ওদের কথা। বুলবুলি মরার পর সিঁড়ির মুখের ঘরখানায় কলি ফেরাবার সময় কুন্দদের শখ বলে নিজের খরচে সে সকলের ঘরের দেওয়ালেই সবুজ রঙ করে দিয়েছে। ইলেকট্রিক বাবদ মাসে দশ টাকা করে দেবার কথা থাকলেও মালা আসার পর সেটা মাপ করে দিয়েছে। নিজের খরচে ওদের জন্যে চাকর রেখে দিয়েছে। ঠাকুর মশাইয়ের মাসকাবারী প্রণামীটাও মানদাই দেয়। তার রোজকার ফুলের খরচও। এমন-কি ধূপধুনোরও যোগানদার পর্যন্ত মানদা।

ভগবান যখন মানদার জন্যে এত করলেন, মানদারও কর্তব্য নয় ভগবানের পাওনা কড়ায়গণ্ডায় মিটিয়ে যাওয়া ? কুন্দ, মালা আর পরীর ঘরে আছে কালীর পট, লিলির ঘরে রাধাকৃষ্ণ, তেলে-ঝুলে-হলুদে পটলের মায়ের আমলের পটটা আজকাল আর ঠাহর হয় না ঠিক ঠিক—না হোক, পট মাত্রেই ভগবান। সাবিত্রীর জন্যে নিজে মানদা কালীঘাট থেকে পট কিনে এনেছিল—তাই দেখে সাবিত্রী মুখ বাঁকাতে মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়েছিল, অমন মেলেচ্ছগিরি এখেনে চলবে না বাপু। তালে তুমি মানে মানে পথ দেখ বাছা ! মাসির কাছে সব রীত-রেওয়াজ মেনে চলতে হবে।

একেক সময় মানদার মনে হয়, সে যেন সত্যিই এই মেয়েগুলির মাসি। এদের মায়েরা তারই মায়ের মেয়ে। পেটের দায়ে তার বোনঝিরা ঘরে লোক বসাবার কাজে নেমেছে বটে, কিন্তু ইচ্ছে করলে এরাও অবিকল গেরস্থ ঘরের বউ হতে পারত।

কেননা, কুন্দকে পটলকে পরীকে লিলিকে দেখে কে আজ বিশ্বাস করবে যে সকাল-সন্ধ্যা এই মেয়েগুলির গলার চোটে নবাব বক্স বাই লেনের সেই বাড়ির ছাদে একদিন কাক-চিল বসতে পারত না? শেষ পর্যন্ত গুইরামকে এসে একেকটার চুলের মুঠি ধরে কিল-চড়-ঘুষি-লাথি হাঁকিয়ে চুলোচুলি থামাতে হত?

এদের জন্যেই মোড়ের পাহারাওলাকে রাত বারোটা অবধি দৈনিক সেই বাড়ির সামনে টহল দিতে হত?

মেয়েগুলির মুখের আদল কথার ধরন পর্যন্ত বদলে গেছে!

এ কি শুধুই ভদ্রপাড়ার খাতিরে? ভদ্রভাবে থাকার কড়ারে ঘর ভাড়া নিয়েছিল বলে? তাহলে পুলিশের পরোয়া না করে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল কেন বুলবুলির বমি-মাখা পিঁপড়ে-ধরা ইঁদুরে-একটা-চোখ-খুবলে-খাওয়া মুখটার ওপর? যে-মেয়েটা তাদের থানা পর্যন্ত দৌড় করাল তারই জন্যে কেন সবাই গুমরে গুমরে কেঁদেছিল কদিন? খদ্দেরের সামনেই হঠাৎ বুলবুলিটার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় কেন ঘর থেকে ছিটকে এসেছিল পটল? কেন সারারাত পরীকে জড়িয়ে থেকে দাপিয়েছিল কুন্দ?

ভূতের ভয়ে?

ভূতের ভয়ে হলে ওই ঘরেই বুলবুলিরই বালিশে মুখ থুবড়ে আরেকটা রাত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কুন্দ পারত কি?

শুধু ওরা কেন—মানদারই বা কি দায় পড়েছিল পিরীতের মানুষের ওপর মান করে চুরি করে তার আফিঙের ভাগ মেরে এক মাসের ঘরভাড়া ফেলে যে-ছুঁড়ি তার নাকালের একশেষ করে গেল—সকলের সামনে তাকে গালাগাল দিলেও আড়ালে তার জন্যে চোখের জল ঝরাতে, করকরে দু শ টাকা ফুঁকে দিয়ে ঘটা করে তার শ্রাদ্ধ করতে?

তবে কি একেক সময় মানদার মনে পড়ে যায় : ইচ্ছে করলে সে-ও মা হতে পারত, সেই অবুঝ বয়সে সেই মারাত্মক ভুলটা না করে ফেললে ? সেই ভুলের জের টানতে গিয়ে মা হওয়ার পথ চিরতরে না বন্ধ করে দিলে ?

বিয়ের জন্যে সবুর করলে মানদারও এমনি ছটি মেয়ে হতে পারত ? ছ মেয়ের মা মানদার মায়ের মত অবিকল ?

মানদা ফের এসে তাড়া দেয়।

উঠি মাসি। বলে চাদরটা মালা আরও ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে গুড়িসুড়ি মেরে শোয়।

ঘুম ভাঙে মালার সেই ভোরে—ঘুমোক যত রাতেই—কিন্তু ওঠার সময় রোজই একটা বেয়াড়া রকমের আলসেমি তাকে পেয়ে বসে। হাত বাড়িয়ে পুবের জানালাটা খুলে দেবার পরই।

সামনের তেতলা বাড়িটা সূর্যকে আড়াল করে রাখলেও সবটুকু আলো সূর্যের শুষে নিতে পারে না। জানালা খোলা মাত্র আলোয় ঘর ভরে যায়। বিরক্ত হয়ে মেঝের বিছানায় পাশ ফেরে মানদা। গজগজ করতে করতে কয়েকটা গড়ান দেয়। তারপর রেগেমেগে উঠে যায়।

মালা তাকিয়ে থাকে জানালা দিয়ে।

বারকয়েক মানদা এসে তাগাদা দেয়। 'উঠি মাসি' 'উঠি মাসি' করেও সহজে তার ওঠা হয় না। ওবাড়ির জানালার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে চেতনাটা ঝিমিয়ে পড়ে সবকিছু ভুলিয়ে দেয়, হুঁশ থাকলে তো।

ঝিমুনি ছোটে মানদার ধাক্কায়।

এখনও জানলা বন্ধ করিসনি! বলে নিজেই মানদা দড়াম দড়াম করে জানালার পাট দুটি দেয় বন্ধ করে। একদিন বললে শুনিস না কেন বলত ?

দীর্ঘশ্বাস গিলে মালা তখন উঠে বসে।

মিছে আশা! ও-জানালা আর খুলবে না।

খুলবে না তারই জন্যে। সে-ই বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল বলে।

বেশ তো দুজন দুজনকে অবাক চোখে দেখছিল—কেন যে বারেক ছেলেটার গলার আওয়াজ শোনার সাধ ·জেগে বসল! কেন যে মরতে তার নাম সুধোতে গেল!

অম্নি কোত্থেকে মা-টা ঝাঁপিয়ে এসে এক ঝটকায় ছেলেকে সরিয়ে সশব্দে বন্ধ করে দিল জানালা।

সেই যে ও-জানালা বন্ধ হয়েছে, আর খোলেনি। সারা দিন সারা রাত এ-জানালা বন্ধ থাকলেও খোলে না।

আর খুলবেও না।

মিছেই সে মানদাকে লুকিয়ে জানালায় একটা ফুটো করে নিয়েছে!

দরজা থেকে মানদা বলে, বংশী চলে যাচ্ছে। এরপর কিন্তুক ঘর ঝাঁট দেওয়া হবে না। ওঠ শিগগীর। ওকি—এখনও তুই জানলা—

তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করে দিয়ে মালা বলে, আমার ঘর আবার বংশী কবে ঝাঁট দেয় মাসি!

বংশীর কি দোষ? আটটায় যদি রানীর ঘুম ভাঙে—

বেশ! মুখ ভার করে মালা বলে, তা নিয়ে আমি কি কিছু বলেছি?

বলবিনিই বা কেন? মাইনে দিয়ে লোক পুষছি তুই ঘর ঝাঁট দিবি বলে? কেউ ঘর ঝাঁট দেয় না, তুই কেন—

ঘাট মানছি বাপু! আমারই সব দোষ। হল তো! নইলে বাসী মুখে তুমি—

অয়! অম্নি মেয়ের মুখ ফুলল। তোদের নিয়ে আর পারিনি বাছা! আরেকজন তো উদিকে এসেই খিল সেঁটেছে। একটা কথার জবাব তক দিলে না। চা আনাব কিনা জানতে চাইলুম—রা কাড়লে না।

মালা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কার কথা বলছ মাসি?

কার আবার! তোমার বন্ধুর গো তোমার বন্ধুর। বাড়ি ঢুকেই বন্ধুর সাথে দেখাটি করে যাওয়া হল, কিন্তুক—

সাবি? সাবিত্রী এসেছে? চমকে মালা উঠে বসে।

ওমা! তুই জানিসনি? এবার অবাকের পালা মানদার। আমি কলঘরে, ফোকর দিয়ে দেখলুম—তড়বড় করে উঠল, বারান্দা পেরিয়ে হনহনিয়ে এঘরে এসে ঢুকল। পটলি সুধোল—কীরে, আজই চলে এলি, রাত না পোয়াতেই—শুধু বললে, হুঁ। তুই সত্যিই জানিসনি?

জানে? সাবিত্রী আজই চলে আসবে মালা কী স্বপ্নেও ভেবেছিল? ভাবলে কখনও ঘুম ভেঙেও ঝিমুনিটাকে লাই দিয়ে জানালার স্বপ্নে মশগুল থাকত?

রাস্তার দিকের বারান্দায় বেরনো বারণ হলেও সাবিত্রীর আসার সময় হলে যে বার বার ওখান থেকে চক্কর দিয়ে আসে, দূরের স্টপে বাস থেকে সাবিত্রী নামা মাত্র আবছা আলোতেও চিনে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে চাবি হাতে সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, সাবিত্রী ওঠা মাত্র তাকে টেনে নিয়ে ঘরে দরজা দেয়, কুন্দদের গায়ে-জ্বালা-ধরা ঠাট্টাতেও ভ্রূক্ষেপ করে না—সে কিনা সাবিত্রী এল, তারই ঘরে এসে ঢুকল, অথচ—

মানদা বলে, তালে চাবি নিতেই এয়েছেল।

দেয়ালে শূন্য পেরেকের দিকে তাকিয়ে মালা বলে, হুঁ।

তুই ঘুমোচ্ছিলি দেখে ডাকেনি।

ঘুমোচ্ছিল! সত্যিই যদি ঘুমিয়েও থাকত—হিড়হিড় করে সাবিত্রী তাকে টেনে তুলতে পারত না?

একদিন সন্ধ্যের আগেই একটা লোক এসে ওঠায় চাবি নিয়ে গিয়েছিল মানদা—সে নিয়ে কম কথা ও শুনিয়েছিল?

শুধু মালাই সাবিত্রীর মা-বাবা-ভাইবোনের গল্প শোনার তরে পথ চেয়ে থাকে—মালাকে প্রাণভরে সব কথা বলার জন্যে সাবিত্রীও কি সারাটা পথ মহড়া দিতে দিতে আসে না? মালা কি জানে না—সে যাবার সময় এবং বাড়ি থেকে সে ফিরে আসার পর কুন্দরা কেমন খোঁচা মেরে মেরে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে তাকে নিয়ে? মালা যদি তখন কাছে না থাকে—! গলা বুজে এসেছিল সাবিত্রীর।

তাড়াতাড়ি মালা উঠে পড়ে। ঘর থেকে বেরোয়।

কলঘরের দরজা ঠেলতেই ভেতর থেকে পরী 'এই' 'এই' করে ওঠে।

মালা বলে, শিগগীর বেরো।

বারে! আমি তো এই ঢুকলুম। মাইরি বলছি!

একবারটি খোল—চোখে-মুখে জল দি।

ষাঃ! এখন কী করে খুলি!

তাহলে আমি কিন্তু জোর করে—

না না!

খোল্ তবে।

ধুৎ! ভারি ইয়ে করিস! দাঁড়া একটু—দরজা ঠেলিসনি—খবর্দার! এমন দিক করিস...।

ভেতর থেকে বিড়বিড় করে পরী।

ইদানীং পরীর বড় লজ্জা হয়েছে।

ওর 'দাঁড়া একটু' মানে একেবারে শরীর ঢেকে ও দরজা খুলবে। কিন্তু এক লহমা দেরি আর সইলে তো মালার!

যাকগে, দরজা খুলতে হবে না। এক মগ জল দে বরং—

তা বেশ বলেছিস মাইরী। দি—এই দিলুম বলে।

মালার পাশেই পটলের ঘর। ঘরের চৌকাঠে শুধু সায়া পরে দু হাতে দুই হাঁটু আগলে শরীর সামলে থুতনি উঁচিয়ে বসে আছে অমানুষিক মোটা পটল।

পটল ওঠে সকলের আগে। বেলা দশটা পর্যন্ত এমনি ঝিম ধরে বসে থাকে। সকলের স্নানটান ধোওয়াধুয়ির পালা চুকলে কলঘরে ঢোকে। বেরোয় চৌবাচ্চার জলে তলানি তুলে। তারপর কোনমতে দুটি গিলে টানা ঘুম দেয় বিকেল পর্যন্ত। সকলের তখন ঘরে ঢোকা বারণ।

বিকেলে পটলের অন্যমূর্তি। ও একাই তখন জমিয়ে রাখে বাড়িটাকে। নিজের বেঢপ দেহটাই ওর লোক-জমানোর তুরুপের টেক্কা।

সাবিত্রীর ঘরের দিকে চোখ মেরে পটল বলে, বাড়ি যাবার নাম করে কার কাছে কাল গেছল রে?

কেন ?

একেবারে যে— !

মানে ?

মানেটা পটল খুলে বলে না। সোজা হয়ে বসে বেণী-খোলায়-পাকিয়ে-থাকা চুলগুলি বুকে টেনে এনে ঘাড় গুঁজে সে একটা একটা করে চুল চিরতে শুরু করে দেয়।

কইরে ধর। দরজা ফাঁক করে দরজার আড়ালে দেহ লেপ্টে মগটা বাড়িয়ে দেয় পরী। ঘোড়ার ডিমের এটা আবার ফুটো ! নতুনটা কুন্দদি আটকে রেখেছে। সব জল পড়ে গেল—ধর তাড়াতাড়ি—ধরলি !

তাড়াতাড়ি চোখে-মুখে জল দিয়ে মালা সাবিত্রীর ঘরের দিকে এগোয়।

পটলের ঘরের পর বাঁদিকে বাঁক নিয়েছে বারান্দা। এদিক থেকে প্রথম ঘরখানা লিলির। তারপরের খানা পরীর। পরীর পরে কুন্দর। সিঁড়ির মুখে সাবিত্রীর ঘর।

সিগারেট টানতে টানতে নানা ভঙ্গিতে আয়নায় লিলি মুখ দেখছিল, মালার দিকে ফিরে বলে, অত ছোটা ছুটো না রাই—ঘরে খিল। কাউকে ডাকাডাকি করতে মানা করে দিয়েছে।

রাইয়ের সাড়া পেলে চিচিং ফাঁক হবে দেখ।

প্রথমে দরজায় টোকা দেয় মালা। সাড়া না পেয়ে ডাকে, এই সাবি—সাবি ভাই !

সাবিত্রী চুপ।

মালা দরজা ধাক্কায়—সাবি ! সাবিত্রী ! দোর খোল। ভালো হচ্ছে না বলছি।

ওপাশ থেকে লিলি হেসে ওঠে খিলখিল। উঁহু, অমন মেজাজ দেখালে হবে না গো রাই। নাকি-নাকি সুরে বল্—ভাই সতী-সাবিত্রী কেষ্ট আমার, আজ তোমার বাঁশির সুর মোর কর্ণে যায়নি—আয়ান ঘোষের তরে টাইম মাফিক আজ হাজরে দিতে পারিনি—কিন্তুক প্রাণেশ্বর—রাতগুলি মোর আয়ান ঘোষদের হলেও দিনগুলো তো তোমারই ছিচরণে সঁপে দিয়েছি, নাথ !

এবার মালা আরও জোরে দরজায় ধাক্কা মারে।

আঃ! ভেতর থেকে সাবিত্রী বলে, কেন জ্বালাতন করছিস।

লক্ষ্মীটি ভাই! খোল—

আমি এখন ঘুমোব। যা।

আমি কি করে জানব বল্ আজই সাত-সকালে তুই—

বকবক করিসনি।

খুলবি না?

না। বলছি আমি এখন ঘুমোব—

নিকুচি করি তোর ঘুমের! ক্ষেপে গিয়ে মালা দরজায় এক লাথি হাঁকায়।

মানদা ওদিক থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, আঃ! বলি হচ্ছেটা কী? ঘর-দোর ভাঙবি নাকি লা? ও যদি দরজা না খোলে—

খুলবে না মানে! ফের মালা প্রাণপণে দরজায় লাথি হাঁকাতে যাচ্ছিল, চায়ের কেটলি আর তেলেভাজার ঠোঙা হাতে বংশীকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখে থেমে যায়।

সাবির চা এনেছিস বংশী?

বংশী বলে, সাবিদি চা খাবে না বলেছে। আগের বারেও সাধাসাধি করলুম, বললে—গা গুলোচ্ছে।

তার মানে ব্যাপার গুরুতর। এমন গুরুতর যে, সব সময় বংশী থাকে না বলে খুশিমত চা খাওয়ার অসুবিধের জন্যে ভোরবেলা পর পর তিন কাপ খেয়েও যে ছ আনার চা দুপুরের জন্যে ফ্লাস্কে রাখে মজুত করে—তার চায়ে গা গুলোয়?

কাছে এসে বংশী ফিসফিস করে বলে, এভাবে দরজা না ধাক্কে ওপাশ দিয়ে যাও না গো।

ভালো মনে করিয়ে দিয়েছিস।

বংশীর ঘর ঝাঁট দেওয়ায় কুন্দর মন ওঠে না। তাই বংশী ঘর ঝাঁট দিয়ে গেলে কোমরে গামছা জড়িয়ে দরজা ভেজিয়ে সে ফের নতুন করে ঘর ঝাঁট দেয়।

দিয়ে, বালতি বালতি জল এনে ঘর ধোয়। ধুয়ে, ন্যাতা দিয়ে সারা ঘর মোছে। রোজ বেশ-কিছুক্ষণ ধরে চলে তার এই ধোয়া-মোছার পালা।

মুখ বেঁকিয়ে লিলি বলে বটে, ছুঁচিবাই! বলুক। নোংরা কুন্দ দু চোখে দেখতে পারে না। তাই ঘর মোছার পর নিজেই সে আর বেলা পড়ার আগে ঘরে ঢোকে না। দুপুরটা লিলি কি পরী কি মালার ঘরে কাটিয়ে দেয়।

বলতে নেই, এত সাফ-সুফ বলেই না লিলির মত তার বয়েস কম ফরসা রঙ শরীরের বাঁধন না হলেও রোজগারটা তার লিলির চেয়ে ভালোই? শুরু থেকেই লিলি লোকের পকেট হাতড়ায় বলেই কি শুধু ওর কাছে কেউ দুবার আসে না— ব্লাউজটা চটকদার সিল্কের হলেও ছোট জামাটা কি লিলি জন্মে কাচে? তাই দেখে কুন্দরই বলে গা গুলিয়ে ওঠে, ফুর্তি-কিনতে-আসা মানুষের কোন্ ছাড়!

মালা ঘরে পা দেওয়া মাত্র কুন্দ হাহাকার করে ওঠে।

চমকে মালা থমকে দাঁড়ায়।

কী করলুম?

কী করলুম! দ্যাখ—ওরে চোখথাকী, চেয়ে দ্যাখ—কেমন কাদা-পায়ের ছাপ পড়ে গেছে! এত করে আমি মুছলুম—

তাই ভালো!

তাই ভালো মানে! নিজে তো এতক্ষণে শয্যে ছেড়ে উঠলেন, আর আমি মাগী সকাল থেকে উবু হয়ে হয়ে—

ওদিকে কী কাণ্ড তা তো জানিস না কুন্দদি। সারা মুখে আতঙ্ক ফুটিয়ে মালা বলে, সাবির ঘর বন্ধ! ডেকেও সাড়া পেলাম না!

অ্যাঁ! আঁৎকে ওঠে কুন্দ। ন্যাতা হাতে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। ঘর বন্ধ? ডেকেও সাড়া মিলল না? পলকে তার মনে পড়ে যায় বুলবুলির কথা।

ওই ঘরেই ছিল বুলবুলি। একদিন সকালে তারও ঘরের দরজা খোলেনি। ডেকে ডেকে গলা ভেঙেও সাড়া মেলেনি।

সেই থেকে কেউ দরজা খুলছে না সাড়াও দিচ্ছে না শুনলেই বুক কুন্দর ধড়াস

ধড়াস করে। এই সেদিনও কলঘরের দরজা খোলা নিয়ে লিলি তাকে অমন বেকুব বানানো সত্ত্বেও আতঙ্কটা যায়নি।

সে কী রে! সত্যি সাড়া দিচ্ছে না? উঁ-আঁ-ও করল না? কোন শব্দটব্দ—

কই আর করল! বলতে বলতে কুন্দর ঘরের মধ্যে দিয়ে বাইরের দিকের বারান্দায় মালা চলে যায়। সাবিত্রীর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

এপাশের দরজায় ছিটকিনি আছে বটে, কিন্তু জানাশোনা মানুষ খড়খড়ি ফাঁক করে হাত গলিয়ে সেটা খুলে ফেলতে পারে। বুলবুলির কাণ্ডের পর সব ঘরের বাইরের দিকের বারান্দার দরজায় খিলের বদলে এই ব্যবস্থা করেছে মানদা।

ভর সন্ধ্যেয় বুলবুলি ঘরে খিল দিয়েছিল। একটা লোককে ফিরিয়ে দিয়েছিল। গুইরামের গালাগাল মুখ বুজে হজম করে গিয়েছিল।

ভাত নিয়ে মানদা সাধাসাধি করতেও দরজা খোলেনি। এমনিতেই লোক ফিরিয়ে দেওয়ায় চটে ছিল মানদা—ভাত না খাওয়ায় আরও চটে গিয়ে খিস্তি করে উঠেছিল।

আহা! তখন কি মানদা জানত—ফুলশয্যার জন্যে পিরীতের মানুষটা আজ আসতে পারবে না বলে বুলবুলির মত ছেনাল ছুঁড়ি বিবাগী হয়ে গিয়ে ওইরকম কাণ্ড করে বসবে? জানলে কি সে দাঁড়িয়ে থেকে গুইরামকে দিয়ে দরজা ভাঙিয়ে চুলের মুঠি ধরে হারামজাদীকে বার করে এনে মারের চোটে বেবুশ্যের অমন বেআক্কেলে পিরীত ঘুচিয়ে দিত না!

দরজার কাছে একটু দাঁড়ায় মালা। না, ও টের পায়নি। আস্তে আস্তে অতি সাবধানে মালা খড়খড়ি তোলে। তারপর খুট করে ছিটকিনি খুলেই দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ে।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে খাটে বসে ছিল সাবিত্রী—বসে থাকে তেমনি। নির্বিকার। যেন এ-পাশের দরজা দিয়ে চোরের মত এইভাবে তার প্রাণের বন্ধু মুক্তোমালা আসবে বলেই প্রতীক্ষা করে আছে।

সাবি!

আমার রূপ একবার না দেখলে আর চলছিল না—নারে ?

সত্যিই যেন চলছিল না মালার ! সত্যিই চলছিল না !

তিনদিন বাড়িতে কাটিয়ে এলে যাকে দেখে মনে হয় বিদেশ থেকে বুঝি হাওয়া বদলে এল—তার দিকে চেয়ে এখন মনে পড়ে যায় পটলের কথা ? যে-কথাটা বলতে পটল গিয়েও বলেনি ?

মালা বিমূঢ় হয়ে চেয়ে থাকে।

যত্ত সব ন্যাকামো ! পেছন থেকে মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে কুন্দ, সোহাগীদের সোহাগের ঢং দেখলে হাড়পিত্তি জ্বলে যায়।

সাবিত্রী বলে, যা বলেছ কুন্দদি। সোহাগ না সোহাগ ! দাও না হাতের ন্যাতাটা মুখে ঘষে।

দেয়াই উচিত। শুধু ওর নয়, তোরও। অত করে আমি ঘর মুছলুম—! ধুমধুম পা ফেলে কুন্দ চলে যায়।

সাবিত্রী বলে, শুনলি তো ?

জবাব দেয় না মালা।

ক্লিষ্ট হেসে সাবিত্রী বলে, কী, অমন করে কী দেখছ ? তুমিও খদ্দের বনলে নাকি ?

কাল কোন্ চুলোয় যাওয়া হয়েছিল শুনি ?

কেন বলো তো ভাই ?

বাড়ি যাবার নাম করে—

ভাবছ পটলির কথাটা সত্যি কিনা ? আমি শুনেছি—

তাই।

তাই ? থতমত খেয়ে যায় সাবিত্রী। সঙ্গে সঙ্গেই সচেতন হয়ে ওঠে, হ্যাঁ, তাইরে তাই ! তাই ! অবাধ্য গলাটা তার বুজে আসছিল, কেশে নিয়ে বলে, তুই ঠিকই বলেছিলি। তখন বুঝিনিরে, এতদিনে বুঝলাম !

কী বলেছিলুম ? থতমত খেয়ে যায় মালাও।

আপন মনে সাবিত্রী বলে, সেই বোঝা বুঝলাম,সেই সম্পর্ক চোকাতে হল—

সাবি!

তাই!

মনে মনে বার বার কথাটার পুনরুক্তি করে সাবিত্রী: তাই! তাই! তাই!

কথার ধাক্কায় যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় অতীতের পর্দা: তাই। তাই! তাই!

স্তম্ভিত মালার মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয় সাবিত্রী।

তাকায় সুবর্ণর মুখোমুখি।

তাই!

মালা যেন ভবিষ্যৎ দেখতে পায়।

সবাই তার বাড়ি যাওয়া নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করলেও মালা কোনদিন ওদের সাথে সায় দেয়নি। তবে একদিন বলেছিল, এ হয় না।

হয় না? কেন?

অসম্ভব বলে।

অসম্ভব?

ভাঙা কাঁচ কি জোড়া লাগে?

লাগে। আমি নিজের চোখে দেখেছি—

সে আমিও দেখেছি। কিন্তু জোড়া লাগলেও জোড়ের দাগ যায় নারে।

তা যায় না বটে। ভাঙা কাপটার টুকরোগুলো ননী কী দিয়ে যেন জোড়া লাগিয়েছিল, দাগগুলি মেলাতে পারেনি।

কিন্তু বাইরের লোককে সেই কাপে চা না দিলেও নিজেরা কি ওটা কাজে লাগায় না?

প্রয়োজনে সবকিছু মানিয়ে নিতে হয়—মালা কি তা সাবিত্রীর চেয়ে বেশি জানে? অবিনাশের মত মানুষও যে কেমন প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল, হাজার বললেও মালা কি তা বুঝবে?

সামান্য নগদ যা অবিনাশ এনেছিল, মাস ছয়েকেই খতম হয়ে যায়। তারপর কয়েক মাস চলে স্বর্ণর গায়ের গয়না বেচে।

অবিনাশ অবিশ্যি আপত্তি করেছিল: বিয়ে-হয়ে-যাওয়া মেয়ের গয়নায় কোন অধিকার নেই বাপের। বাপের সংসারের জন্যে নিজের গয়না কেন বিক্রী করবে স্বর্ণ? এরপর ভুজঙ্গ এসে যদি—

ভুজঙ্গ এসে যদি!

ভুজঙ্গ যে ফিরে আসার জন্যে ওভাবে পালিয়ে যায়নি, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে না—স্বর্ণ তা বুঝে গেছে ঢের আগেই।

বিধবা হয়ে কি গরিবের মেয়ে বাপের বাড়ি চলে আসে না? স্বর্ণ না হয় সধবা থাকতেই এল। অমন স্বামী থাকার চেয়ে না থাকা যে-স্বর্ণর হাজার গুণে ভালো।

বাপের দেওয়া দুল, নাকছাবি, চুড়ি, রুলির সাথে ভুজঙ্গর দেওয়া পৌনে চার ভরির হারটা নিজের মা-বাপ-ভাইবোনের জন্যে বিক্রি করতে পেরে বড় তৃপ্তি পেয়েছিল স্বর্ণ।

বিয়ের পর থেকে কেবল দূর দূর ছাই ছাই শুনতে শুনতে নিজের ওপর ঘেন্না ধরে গিয়েছিল, অদ্ভুত একটা আত্মবিশ্বাস এখন চাড়া দিয়ে ওঠে।

গয়না বেচার টাকাগুলি এনে বাপের হাতে তুলে দিলে হঠাৎ 'ওরে খোকা' বলে ডুকরে উঠে অবিনাশ তাকে বুকে টেনে নেওয়া মাত্র তারও মনে পড়ে গিয়েছিল দাদার কথা—মাসের প্রথমে ঢাকা থেকে এসে দাদাও এইভাবে টাকা তুলে দিত বাপের হাতে।

অবিনাশের কান্নায় বাড়িতে নতুন করে কান্নার রোল পড়ে গেলেও স্বর্ণর চোখে জল আসেনি।

আত্মবিশ্বাসটা তখন জোরালো এক নেশা হয়ে বসেছে।

স্বর্ণ আজ অবনী!

তাই তার গয়নার টাকায় মাস ছয়েক অনায়াসে চলবে জেনেও একটি দিনও সে নিশ্চিন্ত থাকেনি।

মেয়েরা কি আজকাল চাকরি করে না? কত মেয়েই তো চাকরি করে সংসার টানছে? বাপ কি স্বামীর সংসার। তবে?

জবা বলে, কেন করবে না? আমি করছি না?

ও ছাড়া অন্য কোথাও—

তবে যা—কাগজ দেখে দেখে দরখাস্ত কর, আপিশে আপিশে হাঁটাহাঁটি কর—

লেখাপড়া যদি জানতুম জবাদি!

তবে ওকথা তুলছিস কেন? নার্সগিরি খারাপ? হাসপাতালে নার্সগিরি করলে মান যায় না, মেসেজ ক্লিনিকে কাজ করলেই—

ওখানে নাকি—

কোন্‌খানে না? কণ্বমুনির আশ্রমে কেলেঙ্কারি হয়নি?

এদেশেরই এক গেঁয়ো মেয়ে জবা। গৌর বলে, বাঙাল দেশের গাঁয়ের মেয়েদের মত চটপটে নাকি এদেশের গাঁয়ের মেয়েরা হয় না। কিন্তু বছর খানেক কলকাতায় এসেই এমন চটপটে জবা হয়ে উঠেছে যে জবাদি বলে তাকে ডাকতে হয়—সুবর্ণর চেয়ে বছর খানেকের ছোট হবে বুঝেও!

কাল রোগ বাধিয়ে চাকরি খুইয়ে মরবার জন্যে স্বামীটা তার মেস ছেড়ে গিয়ে বাড়ি উঠেছিল, সেই স্বামীকে জবা কলকাতায় এনে চাকরি করে চিকিৎসা চালাচ্ছে। বাঁচবে কি বাঁচবে না ঠিক নেই জেনেও ভিজিটওলা ডাক্তার দেখাচ্ছে। সুবর্ণদের ভাড়া দিয়ে থাকতে হলেও দিব্যি রিফিউজী সেজে বিনা ভাড়ায় দুখানা ঘর দখল করে আছে।

জবার কথার প্রতিবাদ করতে না পারলেও সায়ও দিতে পারে না সুবর্ণ। অগত্যা সে ভরসায় থাকে ভগবানের: ডিগ্রি না থাক অভিজ্ঞতা আছে অবিনাশের। সেকালের এণ্ট্রান্স পাশ, তবু ছোটখাটো কোনও ইস্কুলে ছোটখাটো একটা মাস্টারিও পাবে না? মাস্টারি পেলে কয়েকটা টিউশানিও? তাহলে আর ভাবনা কি। হে ভগবান!

দিনরাত অবিনাশ টো টো করে ঘোরে!

মাস্টারি দূরে থাক—দপ্তরিগিরি পেলেও বর্তে যায়।

জোটে না দারোয়ানীও।

একদিন সন্ধ্যায় অবিনাশ ফেরে না। সারা রাত সকলের কাটে মহা দুশ্চিন্তায়। পরের দিন সকালে তার খবর আসে হাসপাতাল থেকে।

হাসপাতাল থেকে ফিরে ননীকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে সরাসরি সুবর্ণ গিয়ে ঢোকে জবার ঘরে।

তোদের ওখানেই আমি কাজ করব জবাদি। দে ভাই ব্যবস্থা করে।

সাজগোজ শেষ করে বেরোবার মুখে স্বামীর একটু তদারক করছিল জবা। ইশারায় সুবর্ণকে থামতে বলে বেরিয়ে আসে। চুপচাপ তাকে নিয়ে রাস্তায় নামে।

নিরাসক্ত গলায় বলে, আমাদের ওখানে আর খালি নেই। একজন নেবার কথা, বাইশজন এসে হাজির।

তাহলে! পথেই যেন বসে পড়বে সুবর্ণ। আমাদের যে সর্বনাশ হয়ে গেছে জবাদি! বাবা বাস চাপা পড়েছিল, হাসপাতালে একটা পা কেটে—

জবার একটা হাত ধরে সুবর্ণ ককিয়ে ওঠে। বাপের পা কাটা যাওয়ায় চোখের জল এই প্রথম তার।

হাসপাতালে অজ্ঞান অবিনাশকে দেখে সুবর্ণর শুধু মনে হয়েছিল—ভালো ভাবে বাবা তার জীবনে আর চলাফেরা করতে পারবে না। বাবা চাকরি করে সংসার চালাবে—একেবারেই অসম্ভব।

এইবার তাকে সত্যি-সত্যিই অবনী হয়ে উঠতে হবে।

এইবার সে চোখ বুজে জবার দ্বারস্থ হতে পারবে।

এইবার যদি প্রতিশোধ নেওয়া যায় ভুজঙ্গর ওপর।

চোখে জল আসার বদলে দুই চোয়াল তখন জুড়ে এসেছিল।

তোর হাতেপায়ে ধরি জবাদি, যে-করে হোক, যে-কাজ হোক—তোর তো অনেক জানা-শোনা আছে ভাই—

রাস্তায় কাঁদিসনি। চেষ্টা করব। কথা দিচ্ছি।

সেকথা রেখেছিল জবা। বেশি মাইনেয় নিজে ওয়েলেসলীতে চলে গিয়ে হেরম্বকে বলে পাইয়ে দিয়েছিল তার চাকরিটা।

স্বর্ণকে বারেক আগাপাশতলা দেখেই রাজী হয়েছিল হেরম্ব।

কিন্তু চাকরি নিয়েও মায়ের গয়নায় টান পড়ে যে! কী হয় ষাট টাকায়!

জবা তাহলে ষাট টাকায় কী করে যক্ষ্মা রোগী স্বামীর চিকিৎসা চালিয়েও নতুন নতুন শাড়ি কিনত?

জবাবটা জানার জন্যে জবার কাছে যেতে হয় না।

হেরম্বর ধমকানিতেই জানা হয়ে যায়।

ক্লায়েন্টের সাথে খারাপ ব্যবহার করলে তো তোমায় রাখতে পারব না, স্বর্ণ।

খারাপ ব্যবহার?

এর আগেও তোমায় সাবধান করে দিয়েছি।

মুখ নিচু করে স্বর্ণ বলে, আসল ব্যাপারটা আপনি জানেন না, হেরম্বদা। সব লোক সমান নয়—

সবাই কি সমান হয়? হাতের পাঁচটা আঙুল সমান? তাই বলে আঙুল ছেঁটে বাদ দেওয়া যায়? বলো, যায় ছেঁটে বাদ দেওয়া?

মোক্ষম যুক্তি! মুখটা স্বর্ণর আরও নিচু হয়ে যায়।

ব্যবসায় কি অত বাছবিচার করলে চলে, স্বর্ণ! নিজেরই প্রয়োজনে সকলের সাথে আমায় মানিয়ে চলতে হবে। এটা দরকার, বুঝলে, প্রয়োজন।

দরকার! প্রয়োজন! মানিয়ে চলা!

সে জানে স্বর্ণ। প্রয়োজনে যে কী বেমালুম মানিয়ে চলেছে অবিনাশ, সুভাষিণীর চোখের ওপর দেখছে। ননীকে সাথে না নিয়ে স্বর্ণকে বাড়ির বার হতে দিত না যে-অবিনাশ, পাড়ায় কারো বাড়ি গেলেও টুলুকে সাথে পাঠাত যে-সুভাষিণী—সেই অবিনাশ সেই সুভাষিণী কী চমৎকার এখন মানিয়ে চলেছে।

দরকারে! প্রয়োজনে!

হেরম্ব বলে, মেড়োটা তোমার নামে কমপ্লেন করে গেল—তুমি অভদ্রতা করেছ বলে।

স্বর্ণ বলতে যায়, অভদ্রতা আমি করিনি—ওর অসভ্যতায় বাধা দিয়েছিলাম শুধু—কিন্তু, কী লাভ সে-কথা তুলে? আহাম্মক তো নয় হেরম্ব?

অথচ এই লোকটাই জবার কত প্রশংসা করত! জবা থাকতে হপ্তায় চারদিন আসত। আর আজ হুমকি দিয়ে গেল—

আর আমার ভুল হবে না, হেরম্বদা!

দরদী গলায় বলে, তোমার ভালোর জন্যেই বলছি স্বর্ণ। তোমারও ওতে লাভ বই লোকসান নেই। জবার চেয়ে তুমি—

ঠিকই বলছিল হেরম্ব।

এমনি ঠিক যে ভাইবোনদের পরের মাসেই ইস্কুলে ভর্তি না করে দিয়ে পারেনি স্বর্ণ।

অবিনাশ বলে, এত খরচ কী কইরা সামলাবি মা? ননী বরং—

বাবা!

না, স্বর্ণ তা সইতে পারবে না। এর পরেও যদি ভাইবোনগুলি তার লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে না ওঠে, কী কৈফিয়ত সে দেবে নিজেকে? কোন্ সান্ত্বনা তার থাকবে নিজের?

নিজে থেকেই মায়ের গয়নাগুলি চেয়ে নেয় স্বর্ণ। বছরের মাঝখানে ভর্তি— একসাথে অনেক টাকার ধাক্কা। বাইরে বেরোবারও জামাকাপড় কিছু কেনা দরকার। অভাব কি সংসারে একটা!

অভাবকে পাত্তা না দিলে ভালো কথা। গরিবের অভাবকে। কিন্তু একটা অভাবকে খুশী করেছ কি—হাজারটা এক সাথে হাঁ করে আসবে।

আসুক!

অবিনাশই যখন সব মানিয়ে নিতে পেরেছে, সুভাষিণীও পেরেছে—স্বর্ণর আর কিসের দ্বিধা?

বড় ছেলে হলে ভাইবোনের বাপ হয়ে উঠতে হয়, বড় মেয়ে হলে মা। অনেক দিনের পুরনো কথাটা নতুন করে মনে পড়ে।

অবিনাশ মরে গেলে অবনী বেঁচে থাকলে সে-ই সংসারের ভার নিত।

অবিনাশ বেঁচে মরে আছে। অবনী মরে বেঁচে গেছে। স্বর্ণ আজ অবনী হয়ে উঠেছে।

অবিনাশের ব্যবহারেও সেটা বোঝা যায়: তাকে আজকাল সমীহ করে চলে অবিনাশ। তার সুবিধে-অসুবিধের দিকে সবচেয়ে বেশি নজর অবিনাশের। চাকরি থেকে সে ফিরলে নিজের কাছে তাকে ডেকে পাঠানোর বদলে নিজেই অবিনাশ ক্রাচে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেরিয়ে আসে।

একেক সময় সুবর্ণ বড় অস্বস্তি বোধ করে: আরেকটু যদি কম মানিয়ে নিত অবিনাশ! হোক প্রয়োজন যতই জোরালো—আজকের এই অবিনাশই তো অতীতের অবু মাস্টার?

অবিনাশের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা যে সীমাহীন, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল থানায়।

মেঝেয় ঘাড় হেঁট করে সুবর্ণ, রানী, ছায়া, দীপ্তি, আশা।

সামনে চেয়ারে দারোগা, হেরম্ব, অবিনাশ আর সেই লোকটা।

আমি হগ্‌গলি জানতাম।

জানতেন?

জানতাম!

জেনেশুনেও মেয়েকে ওইখানে চাকরি করতে পাঠিয়েছিলেন?

পাঠামু না!

বাপ হয়ে আপনি—

বাপ হইয়া আমি! দ্যাখেন, বড় বড় কথা কওনের গোঁসাই হগ্‌গলেই, কামের বেলা কেউ না। বলি মশয়, সরকারের হইয়া অখন তো খুব কথা শুনাইতে আছেন! কই আমাগো মাইনষের মত বাঁচনের কোন্ পথটা খুইলা রাইখছেন সরকারবাহুর?

অবিনাশকে ঢুকতে দেখেই ঘাড় হেঁট হয়ে গিয়েছিল সুবর্ণর। ঘাড় হেঁট করে বসে ছিল এতক্ষণ।

চুরি করে একবার বাপের মুখখানা দেখতে গিয়ে এখন সে আর চোখ ফেরাতে পারে না।

জবাব দেন না যে মশয়?

কী আর বলব বলুন! গবর্নমেণ্ট তো ম্যাজিক জানে না যে—

ম্যাজিক জানইন না! হ্যাশ ভাগের ম্যাজিক দেখাইতে কইছিল কেডা—যদি না সামাল দিতে পারব?

আপনাদের জন্যে গবর্নমেণ্ট এত করছে, এতেও যদি—

আমাগো মন না ওঠে? কেমুন? হয় হয়, সব দোষ আমাগো! ঠিকই কইছেন আপনে—হালার যত দোষ বাঙালগো! সুখে থাইকতে ভূতে কিলাইছিল—তাই পোলারে খুন করাইয়া, পোলার বউরে খুন করাইয়া, সবকিছু ফেলাইয়া থুইয়া আপনাগো হ্যাশে আইছি, আপনাগো হ্যাশে আইসা পাথান মাশুল দিছি—অখন—

ওটা ভাগ্য! এ-দেশের লোক গাড়ি চাপা পড়ে না?

ভাইগ্যে থাকলে পড়ব না!

তবে? তাই বলে নীতি-ধর্ম বিসর্জন দিয়ে—

নীতি! ধর্ম! যেন ক্ষেপে যায় অবিনাশ:

—ছাগলগাদা হয়ে কোন রিফুজি ক্যাম্পে জানোয়ারের জীবন কাটাতে পারলে নীতি বজায় থাকত। না খেয়ে মরতে পারলে ধর্ম। মুখ বুজে সব সয়ে যাওয়া মানেই নীতি-ধর্ম বজায় রাখা। কিন্তু ভদ্রভাবে বাঁচতে চেয়েছ কি—গেল নীতি গেল ধর্ম!

—বড় বড় কত বাড়ি চারপাশে খালি পড়ে আছে, এত জায়গা-জমি পতিত হয়ে আছে, কিন্তু খবর্দার! ওদিকে পা বাড়িয়েছ কি গুণ্ডারা ছুটে আসবে। তাদের পেছন পেছন পুলিশ। পুলিশের লেজ ধরে মালিক। সাধ্য থাকে দশ টাকার জমি দুশোতে কেনো, পাঁচ টাকার বাড়ি পঞ্চাশে ভাড়া নাও। নইলে থাক্ পড়ে বাঙাল ব্যাটারা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কি ক্যাম্পের আস্তাবলে কি রাস্তার ফুটপাথে। ভিক্ষেয় হাত না ওঠে, খয়রাতিতে পেট না ভরে—ভালো কথা! নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করে নে। দেশে কি সবাই লাট-বেলাট ছিলে? নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করে নিতে পারো না?

—পারে না! চোদ্দ পুরুষের ভিটে ছেড়ে যারা আসতে পারে—তারা সব পারে। ছেলের বয়েসী দারোগার মুখে নীতি-ধর্মের উপদেশ শোনা কোন্ ছার!

—তাইতো নিজেদের ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করে নিচ্ছে, তবে কেন—

কাঁদিস না সোনা, কাঁদিস না! এ লজ্জা তর না মা, তর না! আর কেউর যদি নাও হয়—তর বাপের। বাপ হইয়া আমি—। মেয়েকে কাঁদতে বারণ করতে গিয়ে নিজেই অবিনাশ তাল রাখতে পারে না।

কিন্তু, সত্যিই কি কাঁদছিল স্বর্ণ? বেখেয়ালে চোখ দুটি তার জল ঝরানো শুরু করলেও সে আসলে কাঁদে নি। সে তাজ্জব হয়ে গেছে বাবার কথায়। বাবা? তার বাবা? সেই অবু মাস্টারের মুখে এই কথা! সেই শান্তশিষ্ট অবু মাস্টারের এ কী মারমূর্তি!

আর স্বর্ণর লজ্জা কাকে? দুনিয়ার হালচাল যখন তারই মত অবিনাশও বুঝে গেছে।

নইলে এতটুকুও অনুতপ্ত হয়নি স্বর্ণ। একটুও নার্ভাস হয়নি।

বরং পুলিশ আসা মাত্র অমন তুখড় মেয়ে দীপ্তি বাথরুমে গিয়ে লুকোলেও, রানী আর আশা একসাথে অফিসারের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেও, ভয়ে ছায়া ঠকঠক কাঁপন শুরু করে দিলেও—স্বর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

খানিক আগেই যে-লোকটা গা টিপিয়ে নেওয়ার ছলে হাতে পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে উল্টে তারই শরীরটা খানিক ঘাঁটাঘাঁটি করে গেছে—তাকেই এখন প্রধান সাক্ষী দেখেও সে অবাকটুকু হয়নি।

লোকটার ন্যাকা ন্যাকা প্রেমের কথাগুলিই কি তখন বিশ্বাস করেছিল যে অবাক হতে যাবে এখন?

থানাতে এসেও মুখে মুখে জবাব দিয়েছিল—বেশ তো, করুন মামলা। পারবেন প্রমাণ করতে?

সাক্ষী আছে!

সই-করা নোট তো? হ্যাঁ, নোটটা হাতে গুঁজে দিয়ে লোকটা আমায় জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিল, আমার এক থাপ্পড়ে পালিয়ে যায়।

আচ্ছা!

সাক্ষী আছে!

বটে ? কে ?

মেয়েরা। হেরম্ববাবুও। উনিও—

আঃ! একটু চুপ করো তো স্বর্ণ। ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিল হেরম্ব। তাকে থামিয়ে দিয়ে আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছিল দারোগার।

বাইরে মুখ বন্ধ করলেও মনে মনে ফোঁসে স্বর্ণ। কথা কাটাকাটি করতে করতে হাতাহাতিটা যদি বাধাতে পারত! সে একা, থানার সকলের সাথে! রক্তারক্তি কাণ্ড একটা ঘটাতে পারত যদি!

তার দেহ নিয়ে কেন এত মাথা ব্যথা ওদের? কী দাম এই পোড়া দেহের? এ-ই দেহের লোভে তাকে বিয়ে করে আনলেও মাসকয়েকেই কি সেই লোভটা একজনের উবে যায়নি? তার এই লোভনীয় দেহটাই জঞ্জালের মত শিয়ালদর আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে সে পালিয়ে যায়নি?

শাড়ি পরার বয়েস থেকেই নিজের দেহটি সম্পর্কে ধাপে ধাপে যত মমতাই জমে উঠুক, স্বর্ণ জেনে গেছে, বউ হিসেবে দাম এটার কানাকড়িও না।

অথচ দেখতে-সুন্দর এই মাংসপিণ্ডটার জন্যেই কেউ যদি পাঁচ-দশ টাকা দিতে চায়—না নিয়ে পারে স্বর্ণ? না নেওয়া সাজে স্বর্ণর?

তার মা বাবা ভাইবোন ভাইঝি যদি না খেয়ে মরে, কেউ দেখতে আসবে? নিবারণ আচায্যির মেজ ছেলে দু মাস সময় দিয়ে মরেও এক ফোঁটা ওষুধ পেয়েছিল? পথ্য পেয়েছিল? বলাই কর যে একগুষ্টি নিয়ে একবেলা খেয়ে একটু একটু করে মরছে—কেউ কি ভুলেও একবার উঁকি মারে? মরার পর লাশ সরানোর গরজে ছাড়া কেউ ও-বাড়িতে ঢুকবে?

হেরম্বর ওপর চটে গিয়েছিল স্বর্ণ: দারোগার সাথে অত কি ফিসফিসানি? তাদের ফাঁসিয়ে একা বাঁচতে চায়? দেবে নাকি সে-ও এখন পাল্টা ধমক?

ধমক দেবার জন্যে দম নিতে গিয়েই আচমকা স্বর্ণকে দম বন্ধ করে ফেলতে হয়েছিল: কনেস্টবলের সাথে ক্রাচে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঢুকছে অবিনাশ।

সঙ্গে সঙ্গে তার ঘাড় হেঁট হয়ে গিয়েছিল।

বাপের কথা শুনে বাপের মুখ দেখে এখন বড় ভরসা পায় সুবর্ণ : আর তার লজ্জা কি !

হাকিমের ধমকানিতেও তাই ভ্রূক্ষেপ করে না। বরং মুখ বুজে তারা ধমক হজম করলে এবং চোখ বুজে হেরম্ব তিন হাজার টাকা জরিমানা দিলে মামলা খতম হয়ে গেল দেখে হাকিমকে মনে মনে প্রণাম করে।

আদালত থেকে বেরিয়ে রানী বলে, এবার কী হবে ভাই ? সরাসরি গিয়ে—

আশা বলে, তাতেও আপত্তি ছিল না রে। কিন্তু ওগুলোকে কার জিম্মায় রেখে যাই ! বলে মরা স্বামীকে একপ্রস্থ যাচ্ছেতাই গালাগাল দেয় : সেই মরা মরল লোকটা, বাপ হবার আগে মরতে পারল না ? অন্তত চারটের বদলে একটার বাপ হয়েই ? একটাকে গলা টিপে কি আর মারতে পারত না আশা ? লতিকার মত ?

সন্ধ্যার আপসোস : তার স্বামীকে ওরা চিত করে ফেলে টাঙি উঁচিয়েছে দেখেই সে যদি জ্ঞানহারা হয়ে পাটক্ষেতে না পালিয়ে যেত—আজ কেমন চমৎকার স্বামীর সাথে হাওয়া খেতে পারত স্বর্গের ! শুধু স্বামী নয়—সকলের সাথে।

দীপ্তি বলে, একসাথে সকলের স্বগ্যের হাওয়া খাওয়া না-ও হতে পারত, ভাই। আমায় দেখছিস না। অর্ধেক স্বগ্যে গেল, অর্ধেক পালিয়ে গেল—দিন কতক পরে রেহাই পেয়ে—ঈশ্ ! কী ভুলই যে করেছিরে, সন্ধ্যা। থেকে গেলে আজ বেগম বনে যেতুম। বাদশা বেগম ঝম-ঝমাঝম—

মনে মনে দীপ্তির ওপর চটে যায় সুবর্ণ। ভয়ানক হিংসা হয় বলে। ওই নাকি আপসোসের ঢঙ ? তা দীপ্তির ভাবনা কি—তুখড় মেয়ে দীপ্তির।

পেছনে পেছনে আসছে হেরম্ব আর অবিনাশ।

সকলের শেষে দারোগা।

দারোগা কাছে এসে অবিনাশকে ইশারায় ডাকে, সেই সাথে সুবর্ণকেও।

ধরা গলায় বলে, একটা খবর দিচ্ছি—কিছু মনে করবেন না—নোয়াখালীতে আমার মা বাবা ভাইবোন স্ত্রী ও ঠাকুর্দাকে নিয়ে এগারোজন—বুঝলেন—একেবারে ঝাড়া হাত-পা !

কী কও বাবা!

হ্যাঁ মাস্টার মশায়। দারোগা অদ্ভুত হাসে, আজ মনে হচ্ছে—ভাগ্যিস!

অবিনাশ ফের বলে, কী কও বাবা!

চলি মাস্টারমশায়! হাসি বজায় রেখেই নাটকীয়ভাবে দারোগা পেছন ফেরে।

হেরম্ব জিগ্যেস করে, ব্যাটা কি বলছিল?

স্বর্ণ বলে, প্রেমের কথা। বলেই তাকায় বাপের দিকে: শুনতে পেল না তো অবিনাশ?

কিন্তু অবিনাশ চেয়ে আছে দারোগার দিকে। হাঁ করে।

চোখ টিপে হেরম্ব বলে, যদি হাতে রাখতে পার—

সে আর বলতে!

যাক, অফিস ছুটি হল—এই ভিড়ে ট্রামে-বাসে কি করে উঠবেন, দাদু?

থতমত খেয়ে ফিরে তাকায় অবিনাশ। কী কইলা? অ—ট্রামে-বাসে যাওনের কি কাম?

হেঁটে? এখান থেকে বেলেঘাটা?

জবাবের অপেক্ষা না করেই হেরম্ব ট্যাক্সি ডাকে। আপত্তি সত্ত্বেও ট্যাক্সিতে তুলে দেয় অবিনাশকে।

দীপ্তি বলে, হেরম্বদা—

হেরম্ব বলে, তোরা এখন আয়। সকলের ঠিকানাই তো আমার জানা। দিন সাতেকের মধ্যেই—

আশা বলে, মনে রেখো, হেরম্বদা। রাখবে তো?

সন্ধ্যা বলে, তোমারি পথ চেয়ে থাকব, হেরম্বদা!

রানী বলে, সত্যি হেরম্বদা!

সবাইকে হেরম্ব অভয় দেন. কেন ভাবছিস। ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবেই।

মাঝখানে অবিনাশ। একপাশে হেরম্ব, আরেকপাশে স্বর্ণ।

কাজের কাজ নেই অকাজের শিরোমণি। এই যে দিন দুপুরে হর্দম ডাকাতি হচ্ছে—তার কোন হিল্লে করতে পারছে! বুঝলেন দাদু, আমাদের পুলিশ হয়েছে

শক্তের ভক্ত নরমের যম। বৃটিশ আমলের পুলিশ তো! স্বাধীন দেশের স্বদেশী পুলিশ হলে—

দুদিকে দুই নীরব শ্রোতা। প্রাণভরে বক্তৃতা দিয়ে চলে হেরম্ব। ফাঁকে ফাঁকে বাঙাল দেশের লোকেদের বুদ্ধির তারিফ করে। বিশেষ করে মেয়েদের। সবচেয়ে বেশি স্ববর্ণর।

নামবার সময় অবিনাশ বলে, অগো ব্যবস্থা কইরা দিবা কইলা বাবা, আমাগোরও একটা গতি—

নিশ্চয়!

আইজ-কাইলের মধ্যেই—

আজকালের মধ্যে—

অবস্থা তো বোঝ বাবা—

বুঝি তো! কিন্তু—

কিন্তু কইলে শুনুম না। তুমি ইচ্ছা করলে সব পার। সে আমি বুঝছি! বড় কামের পোলা তুমি।

বুঝছি! কি কইতে চাও বুঝছি! কিন্তু আমরা রিফ্যুজি বাবা—আমাগো কি—কইরে সোনা, যাস ক্যান—তর হেরম্বদারে তুইও একবার ক। এ্যামনে তো দিনরাত হেরম্বদা হেরম্বদা কইরা মরস—অখন যত লজ্জা!

না। আস্তে আস্তে ঢোঁক গিলে স্ববর্ণ বলে, লজ্জা কিয়ের।

হ্যাঁ, কিসের লজ্জা? অবু মাস্টার যদি প্রয়োজনের সঙ্গে এমন চমৎকার মানিয়ে নিতে পারে, নিজে থেকে হেরম্বর দ্বারস্থ হতে পারে—স্বামী-তাড়ানো আদালত-ফেরা মেসেজ-ক্লিনিকের মেয়ে স্ববর্ণর লজ্জা কিসের?

গাড়ি থামা মাত্র সবাই এসে দরজায় দাঁড়ালেও, আশপাশের বাড়ি থেকে উঁকিঝুঁকি শুরু হয়ে গেলেও, অবিনাশকে যেতে বলে ফের স্ববর্ণ গাড়িতে ওঠে: মাথাটা তার বড় দপদপ করছে—হাওয়াগাড়িতে করে খানিক হাওয়া না খেলে গরিব মেয়ের মাথার ব্যামো সারবে না!

হেরম্ব বলে, দুদিন ভাবো স্বর্ণ। আমি বললাম বলেই হুট করে—

কোন দরকার নেই, হেরম্বদা। আর ভাবলে আমি পাগল হয়ে যাব।

পরে আমায় দুষবে না?

দুষব! চিরকাল তোমার কেনা হয়ে থাকব।

দেখি তবে।

দেখি তবে নয় হেরম্বদা, তিনদিনের মধ্যে তুমি যদি ব্যবস্থা না কর—নির্ঘাত আমি লাইনে মাথা দেব। লিখে যাব—তুমিই এর জন্যে দায়ী।

বড় কাজের ছেলেই শুধু নয়, হৃদয়বানও হেরম্ব। রেলের লাইনে মাথা দিয়ে মরার মত বিতিকিচ্ছিরি মরণ থেকে সে বাঁচিয়ে দিয়েছিল স্বর্ণকে।

দুপুর থেকে যাওয়ার তোড়জোড়ে সাহায্য করলেও বিদায় নেবার সময় ঘর থেকে বেরোয় না অবিনাশ। এক পায়েই বাতের ব্যথাটা তার হঠাৎ এমন চাড়া দিয়ে ওঠে যে স্বর্ণ প্রণাম করতে গেলে উঠে বসা দূরে থাক, মুখ ফেরানো দূরে থাক—মুখ ফুটে আশীর্বাদী কথাগুলি পর্যন্ত স্পষ্ট পারে না উচ্চারণ করতে।

উঠোনে সুভাষিণীকে প্রণাম করে স্বর্ণ। মাকে প্রণাম তার সহজে শেষ হতে চায় না।

স্বর্ণ উঠে দাঁড়ানো মাত্র তাকে প্রণাম করে ননী, ফনী, সুষমা, সুরমা। টুলুও।

কাউকে স্বর্ণ বাধা দেয় না: এইভাবে আর কোনদিন কি তাকে ওরা প্রণাম করবে!

সুভাষিণী বলে, ওই চাকরির কথা কাইলও তো কইস নাই, মা। হঠাৎ আইজই—

আইজই বিহানে যে খবর পাইলাম মা। হ্যাঁ, আজই সকালে হেরম্ব এসে সব ঠিক করে গেছে।

কাইল গ্যালে হইত না? ভর-সন্ধ্যায়—

এই তো যাওনের সময় মা! হ্যাঁ, এই তো যাওয়ার সময়। শুধু ভর-সন্ধ্যায় নয়—এটা যে বৃহস্পতির বারবেলা মার হয়ত তা খেয়াল হয়নি।

ননী বলে, এ চাকরি কদ্দুর দিদি ?

অনেক দূর ভাই ! অ-নে-ক দূর !

একে একে সুবর্ণ সব ভাই বোনের কাঁধে হাত রাখে, চুলে হাত বুলোয়। মন দিয়া পড়াশুনা করিস ভাই। এয়ার পরও তরা যদি না মানুষ হস—

কথার খেই হারিয়ে যায়। কী বলবে ? বলবে কি—এর পরেও যদি ভাইবোনেরা তার মানুষ না হয়ে ওঠে, কুচি কুচি করে নিজেকে কেটেও সুবর্ণ তাহলে শান্তি পাবে না ?

ননীকে জড়িয়ে ধরে সুবর্ণ, দেখিস নইনা—অরা য্যান—

দেখুম দিদি। তুই কিছু ভাবিস না—দেখুম।

তুমিও দেইখো মা। বাবারেও কইও। টাকার লেইগা ভাইব না। আমি না আইলেও টাকা ঠিকই—

অনেকক্ষণ কান্না চেপে ছিল ফনী—নাকের বাঁশি তার ফুলে ফুলে উঠছিল, ঠোঁট দুটি তার থরথর করছিল—দেখেও না দেখার ভান করে ছিল সুবর্ণ : ফনীর চোখে চোখ পড়লে কি সে যেতে পারবে !

হঠাৎ ফনী এসে পেছন থেকে তাকে আঁকড়ে ধরে, তুই আইবি না, দিদি ভাই ? আর তুই আইবি না ? তাইলে তরে আমি যাইবার দিমু না !

দিশেহারা লাগে সুবর্ণর। অত বুঝিয়ে-সুঝিয়ে-রাজী-করানো মনটা তার বেঁকে বসে হঠাৎ। আস্তে আস্তে ফনীর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েও পা বাড়াতে পারে না। একে একে তাকায় সকলের মুখের দিকে।

ককিয়ে ওঠে টুলু, তুমি যাইও না বড় পিশি—তুমি যাইও না !

আঁচলে টান পড়া মাত্র সচেতন হয়ে ওঠে সুবর্ণ। টুলুর মিনতিকাতর মুখ-খানির দিকে তাকাতেই মনে পড়ে যায়—শুধু তিন বছরের ওই টুলু নয়, এতগুলি প্রাণী চেয়ে আছে তারই মুখের দিকে, অবিকল এইভাবে। তিন বছরের টুলুর চেয়েও অসহায় অবিনাশ।

টুলুসোনা ছাড়রে ! আমারে যাইবার দে। দেরি হইয়া গেল—মানুষটা খাড়াইয়া আছে।

টুলুকে ছাড়ায় তো হাত চেপে ধরে ফনী, না, দিমু না! দিমু না! ক্যান তুই আর আইবি না!

অত দূর থেইকা—

দূর! নটকার কথা কইস না। দূর! আমি গিয়া তরে নিয়া আমুম।

তুই?

হ হ—আমি। আমি বড় হইছি না? আমি গিয়া তরে নিয়া আমুম দিদি ভাই।

তাইলে কি না আইসা পারিরে! তুই যদি গিয়া আমারে নিয়া আসস—আমি কি না আইসা পারুম মানকু। না আইসা পারুম! তাই আনিস ভাই, বড় হ। মানুষ হইয়া ওঠ। তখন গিয়া তুই আমারে—আমি তর পথ চাইয়া থাকুমরে ফইনা!

আমি ফইনারে নিয়া যামু দিদি।

এক সাথে দুই ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে স্বর্ণ: ওরা যদি তাকে ফিরিয়ে আনতে যায়—ফিরে না এসে কি পারবে সে!

নিজের বুকে কচি কচি দুটি বুকের কাঁপন অনুভব করতে করতে স্বর্ণর মনে হয়—পারবে। ননী আর ফনী তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে। নিশ্চয় পারবে। পারবেই।

এই ননী আর এই ফনী একদিন বড় হবে—শক্তসমর্থ পুরুষ হয়ে উঠবে। কচি কচি এই বুক দুখানাই সেদিন হাতখানেক করে চওড়া হয়ে যাবে।

সেদিন যদি তার সামনে গিয়ে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় দু ভাই, মুখ ফুটে যদি বলে, চল দিদি, তোকে আমরা ফিরিয়ে নিতে এসেছি—না বলার সাহসটুকুও হবে? কে জানে, তাহলে হয়ত চুলের মুঠি ধরেই দিদিকে টেনে নিয়ে আসবে দুই ভাই।

পুরুষ মানুষ—সব পারে। ওদের অসাধ্য কিছু নেই।

যেমন গণি মিঞা।

আর আফজল চাচা।

গণি মিঞা আর আফজল চাচার কাণ্ডকারখানা অবশ্য অবিনাশের কাছে শুনেছে স্বর্ণ। কী ভাবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গণি মিঞা অবনীর মাথায় কাটারির কোপ বসিয়েছিল, বৌদির শাড়ি কেড়ে নিয়েছিল, ছুটে গিয়ে বৌদি রান্নাঘরে খিল দিলে একসাথে চারপাশের বেড়ায় আগুন ধরিয়ে শিকল তুলে দিয়েছিল—স্বর্ণ দেখেনি।

স্বর্ণ দেখেনি—কী ভাবে এসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানো মাত্র বুকে বল্লমের খোঁচা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল গণি মিঞারই জাতভাই আফজাল চাচা। পড়ে, খোদাতালার দোহাই দিয়ে সবাইকে শান্ত হতে বলতে বলতে নিজেই হয়ে গিয়েছিল চিরশান্ত।

কিন্তু ভুজঙ্গকে সে দেখেছে। গৌরকে সে দেখেছে।

শৈলর মুখে মুখে একদিন জবাব দিতে ঘাড় ধাক্কায় তাকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে শৈলকে নিয়ে খিল দিয়েছিল ভুজঙ্গ। সে শব্দ করে কাঁদতে লাথি মেরে বাড়ি থেকেই একেবারে দূর করে দেবে বলে শাসিয়েছিল।

আর গৌর—কারখানার কুলী রোগা-ডিগডিগে ছেলেটা ভুজঙ্গরই দেশী ভাই। কিন্তু ওই তো শিয়ালদহের নরক থেকে উদ্ধার করে সেই বাড়িটাতে নিয়ে প্রথমে তাদের তোলে? নিজের দলবল নিয়ে গুণ্ডার হামলা রোখে? পুলিশের কথায় অবিনাশ বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার গোঁ ধরতে—চটে যায় অবিনাশের ওপর? চটে গিয়েও সস্তায় একটা বাড়ি ঠিক করে দেয়?

হাতে ধরে অবিনাশ ধন্যবাদ জানাতে গেলে, গৌর বলেছিল, খেসারত শুধু আপনারা কেন দেবেন, মেসোমশায়? স্বাধীন কি আমরাও হইনি?

সব সময় সুভাষিণী কাঁদত বলে চটে গিয়ে একদিন গৌর বলেছিল, দিনরাত কী কাঁদেন মাসিমা! মনে করুন, ছেলে আপনার দেশের জন্যে শহীদ হয়েছে। রামেশ্বরের মত দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে। পুলিশের গুলী আর দাঙ্গার ছুরিতে কি কোন তফাত আছে, মাসিমা! মাসিমা, একটু থেমে গাঢ় গলায় গৌর বলে, একটি ছেলের মা ডাক শুনতে পাও না বলে তোমার যদি বুক ফেটে যায় মাসিমা, এখন থেকে আমি তোমায় মা বলে ডাকব। মা-মরা ছেলে আমি...

রামেশ্বরের মাকে একবার মা বলে ডাকার বড় সাধ ছিল মা, কিন্তু চিনি না তো—

সুভাষিণী আরও জোরে ফুঁপিয়ে ওঠে।

সুভাষিণীকে গৌর জড়িয়ে ধরে। বলে, এক ছেলের বদলে এক ছেলে পেয়ে মন যদি না মানে, মা—আমার একশ কমরেডকে এনে দেব। সবাই তোকে মা ডাকবে। কাঁদিস না মা, কাঁদিস না। মানুষের কান্না দেখলে মাথায় আমার খুন চেপে যায়।

সুটকেশ হাতে তুলে নেয় সুবর্ণ।

যাবার সময় গৌরের সাথে একবার দেখা হলে হত! জেলে গিয়ে বসে আছে শয়তানটা! কালও ওর দিদি এসে বলছিল—জেল থেকে প্রতি চিঠিতেই সে নাকি ননীদের খোঁজ নেয়।

ননী আর ফনী গৌর হয়ে উঠবে চোখের জলে ফেরার পথ যদি ঝাপসা হয়ে আসে সুবর্ণর, মন যদি বেঁকে বসে সুবর্ণর—ওদেরও মাথায় খুন চড়ে যাবে।

সুভাষিণীর মত গৌরের বদলে দুই ভাইয়ের কপালে তখন চুমো দিয়ে সুবর্ণকেও বলতে হবে—তগো মনে দুঃখু দিতে কি আমি পারি রে!

ননী বলে, বাকসটা আমারে দে দিদি।

সুবর্ণ বলে, না। তরা গিয়া পড়তে বয়।

সুটকেশ নিয়ে এগোয় সুবর্ণ। পাশে পাশে তার আঁচল ধরে চলে ফনী। থেকে থেকে আঁচলে টান দেয়। মুখ তুলে তাকায়।

সুবর্ণ যেন টের পায় না কিছুই।

সুভাষিণী হঠাৎ ডুকরে উঠে, সইহু হয় না! আর আমার সইহু হয় না!

মনে মনে সুবর্ণ বলে, সইতেই হবে মা। তুমি যে শহীদের মা!

দরজায় এসে আরও একবার সুবর্ণ মাকে প্রণাম করে। মাকে প্রণামের সাধ যেন তার মেটে না কিছুতেই। মাগো!

শরীরের যত্ন নিস, মা।

নিমু, মা। শরীরের যত্ন নেবে না? হেরম্বর কথাগুলি মনে পড়ে যায়: নাচগান জানো না। শেখারও আর সময় নেই। সুতরাং শরীরটাকে সামলে রেখ, সুবর্ণ। উঁহু, সাবিত্রী। ওখানে তোমার নাম সাবিত্রী।

আমি যাই মা।

যাই না, আসি।

মনে মনে সুবর্ণ বলে, না যাই! আমি যাই! যাই!

দুর্গা! দুর্গা!

অকথ্য আক্রোশে সুবর্ণর মন বলে, গু খা! গু খা!

কিন্তু পরে সুবর্ণর মনে হয়েছিল, ভগবানের ওপর এই আক্রোশ অনর্থক।

মানদার নতুন পটের গুণ কিনা ভগবানই জানে, সত্যটা বুঝিয়ে দিয়েছিল ভগবানই। সবকিছু স্বাভাবিক করে দিয়েছিল।

আসলে ভগবানটা ষোল আনা বদমাইস নয়। শুধু ভয়ানক খেয়ালী। বড়লোকের বখাটে ছেলের মত।

কিন্তু বড়লোকের বখাটে ছেলে মাত্রেই কি গরিবের বখাটে ছেলের চেয়ে খারাপ? তবে।

ভগবানের দয়ায় মাসকয়েকেই প্রয়োজনের মাহাত্ম্যটা বুঝে গিয়েছিল বলেই মালার কাছে সে মন খুলে দিয়েছিল। এ-বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে দরদী মেয়ে মালার কাছে। সবচেয়ে ভদ্র মেয়ে গুণী মেয়ে মালার কাছে।

কিন্তু কে জানত যে অমন দরদী মেয়ে ভদ্র মেয়ে গুণী মেয়ে মালা সব শুনে সহানুভূতিতে চোখ ছলছলিয়ে ভাঙা-ভাঙা গলায় বলে বসবে, কিন্তু ভাঙা কাঁচ কি আর জোড়া লাগে?

লাগে। আমি নিজের চোখে দেখেছি—

সে আমিও দেখেছি। কিন্তু—

সেদিন মালার ওপর অকথ্য চটে গিয়েছিল সুবর্ণ।

ভাবে কি মালা তাকে? খাতির করে ঘরে এনে খাটে বসিয়ে মনের কথা বলেছে বলে—সে আর সে এক! কী স্পর্ধা মালার! কী সাহস! প্রয়োজনের মুখ চেয়ে কদিনের জন্যে তাকে এখানে আসতে হয়েছে বলে অবু মাস্টারের মেয়েকে জাত বেশ্যা মালা—

এখন মালার প্রতি শ্রদ্ধায় তার মাথা নুয়ে আসে।

অবু মাস্টারের মেয়ে যা পারেনি, মালা তা পেরেছিল—ভবিষ্যৎটা দেখতে পেয়েছিল। স্পষ্ট।

ভগবানই মালাকে দেখিয়ে দিয়েছিল। দুমুখো ভগবান। বড়লোকের বখাটে ছেলের মত খেয়ালী ভগবান।

তাই!

তাই! তাই! তাই! মিনিটের পর মিনিট ধরে কথাটা মালার কানে বেজে চলে।

ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝতে বাকি নেই তার।

সাবিত্রীর মিথ্যে আশাকে সময়মত সে-ই চেয়েছিল ভেঙে দিতে।

পারেনি।

পারেনি বলে আপসোসও করেনি। বরং পাল্টা তখন প্রশ্রয় দিয়ে চলেছিল। খুশী মনে নিজের হার স্বীকার করে নিয়েছিল : আহা, ভগবান করুন—ওর ওই মিথ্যে আশাই যেন সত্যি হয়। সত্যি হয়। সত্যি হয়। সাবিত্রী তো মুক্তোমালা নয়!

সাবিত্রীর একটি হাত হাতে নিয়ে পটে-আঁকা-ছবি হয়ে মালা বসে আছে। দেয়ালের ফোকরে খাড়া-করা পটটার দিকে ঠায় সাবিত্রী চেয়ে আছে। মালাও চেয়ে আছে।

যেন পাশাপাশি দুই সখি ছোঁয়াছুঁয়ি করে বসে কালীমার্কা ভগবানের দিকে ঘণ্টাখানেক চেয়ে থাকলেই ছ আনার ওই থ্যাবড়ানো-ছাপা ছবিটা হঠাৎ জলজ্যান্ত ভগবান হয়ে গিয়ে নাটকীয় এক কাণ্ড করে বসে কথা শুরু করার সুযোগ এনে দেবে দুজনকে।

বাইরে থেকে মানদা বলে, ঠাকুরমশায় এয়েছেরে, সাবি।

মালা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়।

ঘরে ঢোকে ভবতারণ।

আগে সে থিয়েটারী স্বগতোক্তির মত মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে ঘরে ঢুকত। হাতের কমণ্ডলু থেকে গঙ্গাজলের ছিটে দিতে দিতে।

খাট, ড্রেসিং টেবিল, পাপোষ, জুতো, সায়া, মায় নর্দমার কাছের জলের বালতি পর্যন্ত গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে দিয়ে যেত।

কিন্তু উড়ে রসময় দেশে গিয়ে ফিরে না আসায় কাজ তার বেড়ে গেছে বলে চটপট নিঃশব্দে এখন ডিউটি শেষ করে ভবতারণ।

কালীর পরে সে মালার মাথায় গঙ্গাজল ছিটোয়। মালার না-ছোঁয়া প্রণাম নেয়।

তারপর সাবিত্রীর গায়ে ফোঁটা কয়েক জল বিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সঙের মত।

প্রণাম করবার জন্যে উঠেই ধপ করে বসে পড়ে সাবিত্রী। বলে, মালা, আমার ব্যাগ থেকে একটা পয়সা—

এক পয়সা!

থাক। ব্যাগ খুলিসনি, মালা।

ভবতারণ বলে, ভাঙানি না থাকে, থাক না আজ। কাল দিওখন—পরশু দিওখন।

আজ নিলে একটা ফুটো পয়সা পেতেন—কাল আধলাও না।

ঘাবড়ে গিয়ে ভবতারণ বলে, অ্যাঁ!

সাবিত্রী বলে, হ্যাঁ। মাসি তো আপনাকে প্রণামী দেয়ই—

ভবতারণ বলে, তা দেয়। দেয় না বলব কেন মা—অধম্ম হবে। আমার পাওনা আমি আলাদা পাই। তবে কি জানো মা—গরিব ব্রাহ্মণকে তোমরা দয়াধর্ম করে—

আমরাও গরিব ঠাকুরমশায়। বাপের সম্পত্তি ভাঙিয়ে আমরা খাই না, গতর খাটিয়ে পাইপয়সাটি রোজগার করতে হয়। দান-খয়রাতের—

সাবি ! তাড়াতাড়ি মালা এসে সাবিত্রীর কাঁধে হাত রাখে।

চড়া গলায় সাবিত্রী বলে, অন্যায়টা কি বলেছি ? ওতে আমার স্বগ্যের কোন্ সিঁড়ি তৈরি হবে শুনি ? দয়া ধর্ম ! মুখে ঝাঁটা !

সাবিত্রীর গলা শুনে দরজায় এসে দাঁড়ায় মানদা। তাকে ঠেলে-সরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে লিলি। লিলির সাথে সাথে পরী।

দেখেশুনে বেকুব বনে যায় ভবতারণ।

মালা বলে, আপনি এখন যান ঠাকুরমশায়। সাবির মন-মেজাজ ভালো নেই—

তুই থাম ! মন-মেজাজ ভালো নেই ! কেন ? মন-মেজাজ ভালো না থাকার কী হয়েছে ? সত্যি কথাটা চেঁচিয়ে বললেই বুঝি—

কাঁচুমাচু হয়ে ভবতারণ বলে, আমি কিছু অন্যায় বলেছি মা ? বলো, মালা-মা, তুমিই বলো ? সাবি-মা দয়া করে রোজ দু আনা দেয় বলেই—

বাধা দিয়ে মানদা বলে, দয়া করে দেয় বলে আজ বুঝি আপনি তাগাদা দিয়েছিলে ? আশ্চয্যি বামুন তো ! না বাপু না, এমন জুলুমবাজি হেথা চলবে নি। তা কারো পোষায় ভালো, না পোষায়—

সাবিত্রী বলে, তাগাদা দেবার কথা তোমায় কে বলল ? তুমি আবার গলা বাজাতে এলে কেন ?

আঁক করে ওঠে মানদা : ওমা ! কোথা যাব গো !

সুবর্ণ বলে, তাগাদা তো উনি দেননি। তাগাদা মোট্টে দেননি, তবে—আমার যেন মনে হল—দেবেন—নিশ্চয় দেবেন। তখন আমি না দিলে জোর করে ছিনিয়ে নেবেন—গলায় পাড়া দিয়ে—আর, তাই মনে হতেই—

আরেক দফা হতভম্ব হয় মানদা : এই রকম তোর মনে হল ?

হলতো ! কিন্তু—। কিন্তু কেন হল, আস্ত দু-দুটো ঠ্যাং থাকতেও কেন যে ভবতারণকে দেখে অবু মাস্টারের কথা মনে পড়ে গেল—ভেবে সাবিত্রী হদিস পায় না।

ছড়া কেটে ওঠে লিলি, কত ঢঙই জানোরে পদি অম্বলে দিলি আদা !

মুখ বেঁকিয়ে গা দুলিয়ে বেরিয়ে যায় লিলি।

কিন্তু যাই বলো, ব্যবহারটা সাবিত্রীর বড়ই বেমানান ! ঢঙ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তাদের শত খোঁচাও হাসি মুখে পাশ কাটিয়ে যায় যে-মেয়ে—অমন মাটির মানুষ ভবঠাকুরের ওপর সে অমন তেড়ে উঠল ? আবার মানদা তার হয়েই বলতে গেলে তাকে দু কথা শুনিয়ে দিল ? নিজের দোষ কবুল করে ?

অস্বস্তিতে লিলি ছটপট করে।

বাড়ি থেকে এসেও চকাচকীর আজ ছাড়াছাড়ি ?

কৌতূহলে পরীর বুক ফাটে।

নিজের দরজায় খিল দিতে গিয়ে সাবিত্রীর দরজার দিকে নজর পড়তেই পোষা ঘুম পটলের উবে যায় !

ভাত খাবে না বলে রুটি-তরকারি আনিয়েও স্নান করে সাবিত্রী শুয়ে পড়েছে—আতঙ্কে বুক কুন্দর গুরগুরিয়ে ওঠে : বুলবুলিও সে-রাতে খায়নি ! সে-ও সেদিন সকাল থেকেই এই রকম মন গুমরে ছিল !

বুলবুলির মত সাবিত্রী অবশ্য দরজায় খিল দেয়নি। কিন্তু দরজায় এখন খিল দিয়েও লাভ নেই বটে তো ?

ছোট-জামায় কুশির কাজ করছিল কুন্দ। সন্ধ্যে থেকে মিথ্যে প্রতীক্ষা ছাড়া কাল রাতে কোন হাঙ্গামা পোয়াতে হয়নি। একটা দিন বরবাদ—এই ভেবে মন খারাপ করে রাত বারোটায় শুয়ে পড়লেও এক ঘুমে রাত কাবার হয়েছে। শরীরটা তাই ঝরঝরে লাগছে।

নিজের ঘরেই আজ ছিল কুন্দ। ভেবেছিল—কুশির-কাজ-করা ছোট-জামা পরে চক্রবর্তীকে আজ থ বানিয়ে দেবে। যত দিন যাচ্ছে ছোকরা বনছে ঘাটের মড়াটা : এগারো নম্বরের পুঁচকিটার দিকে যে ওর নজর পড়েছে—গুইরাম জানাবার আগেই আন্দাজ খানিকটা কুন্দ করেছিল বইকি।

আজ এসে দেখুক ঘাটের মড়া—বয়েস কমাবার কী মন্তর জানে কুন্দ।

আতঙ্কে এখন হাত অবশ হয়ে আসে কুন্দর।

তাড়াতাড়ি সে হাতের কাজ ফেলে উঠে পড়েঃ তার আতঙ্কের কথাটা মালাকে জানিয়ে রাখা ভালো। মালাই তো সাবিত্রীর প্রাণের বন্ধু।

মালা চুপ করে। দু কথায় তার কথা শেষ করে।

ফের পান সাজা শুরু করে সালিশের সুরে মানদা বলে, তা সত্যিই তো বাপু, ওরা সন্‌সারী মানুষ। ওরা কী করে—

হয়েছে! পটল মুখ ভেঙিয়ে ওঠে, সংসারে কে কত সতী জানা আছে। এখানে যারা ফুর্তি মারতে আসে—তারা সংসারী না?

মানদা বলে, তারা ব্যাটাছেলে।

ব্যাটাছেলে! মরে যাই! পরী তেতে ওঠে, ব্যাটাছেলে যখন সাত খুন মাপ!

মাপই তো! নইলে জগৎ চলত?

বটে! জগতের চলা নিয়ে গলা ছেড়ে একটা খিস্তি করতে যাচ্ছিল পরী 'আঃ!' বলে তাকে থামিয়ে দেয় লিলিঃ এক কথায় কেন এরা আরেক কথা আনছে? তাছাড়া পরী কি জানে না—ব্যাটাছেলের সাত খুন মাপ না হলে জগৎ ঠিক মত চলতে থাকলেও তাদের চলত না?

কুন্দও ক্ষুব্ধ হয় পরী ও পটলের ওপরঃ সব শুনেও ওরা চেঁচিয়ে কথা কইতে পারছে!

কুন্দ বলে, তা এখানে সবাই জটলা না পাকিয়ে চল না ওর ঘরে। না খেয়ে বেচারি শুয়ে আছে। জানালা দিয়ে দেখলুম যেমনকে খাবার তেমনকে ঢাকা। এ-সময় কাছাকাছি—ওঠ না পটলি।

হাই তুলে পটল বলে, আমার ঘুম পাচ্ছে।

পরী বলে, ঘুম তোর পালিয়ে যাবে না। চল। কুন্দদি ঠিকই বলেছে—এখন আমাদের কাছে কাছে থাকা দরকার।

লিলিরও তাই মত। সাবিত্রীর ওপর জ্বালাটা তারই সবচেয়ে বেশি। একই

বাড়ির বাসিন্দা হয়েও, একই কাজের কাজী হয়েও—এতদিন কী ডাঁটে চলত! নয় ডাঁট? তার ঘরে ভুলেও কখনো ঢুকেছে? তাব পুরনো রেকর্ডগুলিই শোনার জন্যে এগারো নম্বর থেকে কুমকুমরা পর্যন্ত আসে, অথচ নতুন রেকর্ড বাজালেও সাবিত্রী ঘর থেকে উঁকি মারে না!

সত্যিই যেন সতী-সাবিত্রী!

এই নিয়ে কম খোঁচা দেয়নি লিলি। দিয়েছে আজও। না জেনেই দিয়েছে যদিও, তবু সেই ভেবেই যে এখন মনটা তার বড়ই কামড়াচ্ছে।

পটলকে পরী টেনে তুলতে সকলেই উঠে দাঁড়ায়।

আসতে না চেয়েও মালা রেহাই পায় না।

খেতে বসেছিল সাবিত্রী: কেন মিছে নিজেকে কষ্ট দেওয়া?

কিন্তু খাওয়ার নামে তরকারি ঘেঁটে ঘেঁটে সে যেন খুঁজছিল হারানো মানিক।

দল বেঁধে সবাইকে ঢুকতে দেখে ঘুরে বসে। আয় বোস। ঢকঢক করে এক গেলাস জল খেয়ে উঠে পড়ে। ব্যাপার কি! গরিবের ঘরে—

লিলি বলে, হুঁ। আমরা সব হুকুমচাঁদের নাতনী এলুম—শিগগীর খাতির আত্তি কর। শুধু খাওয়া ফেলে উঠলে চলবে না সই, সবাইকে কোলে-কাঁকালে নিয়ে বসে থাকতে হবে।

সাবিত্রী বলে, তোদের জন্যে খাওয়া ফেলে উঠিনিবে। খিদের মুখে খেতে বসলুম, কিন্তু তরকারিটা একেবারে পানশে। বমি আসছে। তোরা না এলেও—

কথা কেড়ে নিয়ে কুন্দ বলে, যা বলেছিস। আজকের তরকারিটা যা-তা! আচার এনে দেব খাবি ভাই? আমার কাছে পচছে। বড্ড ঝাল বলে আমি মুখে ঠেকাতে পারি না। সেদিন পরীকে বললুম—জিভে ছুঁইয়ে ও-ও—

সাবিত্রী হেসে বলে, আমি বাঙাল বলে তাই বুঝি—

ছিঃ! সাবিত্রীর হাসিতে গম্ভীর হয়ে যায় কুন্দ। খাওয়ার আবার বাঙাল ঘটি কি ভাই—যার যা রোচে।

শুধু খাওয়ার নয় কুন্দদি, গরিবেরও বাঙাল ঘটি নেই। বিশেষ করে আমাদের মত খানকিদের—

সাবি!

তুই যেন আকাশ থেকে পড়লি, মালা। সাবিত্রী বলে, কথাটা মিথ্যে? আর খবদ্দার, যখন-তখন অমন ধমক দিসনি আমাকে।

মালা মুখ ঘুরিয়ে নেয়ঃ ধমক সে দেয়নি, সাবিত্রী জানে। এবং কথাটা হুবহু সত্যি, সন্দেহ নেই। তবে কেন একদিন মুখুজ্জেবাবার মুখে ওই কথা শুনে আড়ালে কেঁদে ভাসিয়েছিল?

কুন্দ তাড়াতাড়ি গিয়ে আচার নিয়ে আসে:

এই নে। আচার দিয়ে রুটি কখান খেয়ে নে। চা আনাসনি আজ? ও মা! বংশী হারামজাদা বুঝি—

পরী বলে, চা না খেয়ে একটু দুধ খাক বরং। শরীরটাও তো কদিন ভালো যাচ্ছে না। দুধে রুটি ভিজিয়ে—আমার অবিশ্যি গুঁড়ো দুধ—তা গুঁড়ো দুধও তো—

লিলি বলে, বকবক না করে, যা না। হীটারটা ধরিয়ে—দুধ আছে তো তোর কাছে? না থাকে আমার আলমারির ওপরের তাকে বাঁ দিকে—

তোরা ক্ষেপলি নাকি! সাবিত্রী বলে, এখন খেতে ইচ্ছে করছে না, খাব না—যখন ইচ্ছে করবে, খাব। ব্যস, ফুরিয়ে গেল। দুধ আমার ঘরেও আছে, হীটারও আছে।

পটল বলে, অত খুশিমত খেলে চলে? শরীরটা তোর হুকুমের চাকর? মুখুজ্জেবাবা মিছে বলে—ওটাকে তোয়াজ না করলে—

দেখিস, তোয়াজ না করেও হুকুমের চোটে ওটাকে কেমন চাকরের মত খাটাই। কুন্দদি, আমার চুলটা আজ বেঁধে দিবি ভাই? ও কিরে মালা, চললি যে বড়? দল নিয়ে এসে নিজেই কেটে পড়ছিস!

দল নিয়ে আমি আসিনি।

দলের আগে আগে তো এসেছিস?

ওরা বলল বলেই—

ওরা কি তোকে এখন যেতে বলেছে ? বলেছে কি—মুক্তোমালা, তোমায় সাথে না নিলে সাবিত্রী আমাদের ঢুকতে দিত না, কিন্তু এখন তো ঢুকে পড়েছি—এবার তুমি যেতে পার ?

সাবিত্রীর কথার ধরনে হকচকিয়ে যায় সবাই : সাবিত্রী কি ভেবেছে মজা দেখার জন্যে তারা দল বেঁধে এসেছে ?

বার বার হাই গিলেও পটল তাই দাঁড়িয়ে আছে ?

আচার আনতে গিয়ে ছোট-জামাটা খাট থেকে হাওয়ায় মেঝেয় পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে দেখেও যে ভ্রূক্ষেপ না করে কুন্দ চলে এসেছে—সে কি পাছে তার মজা দেখায় কিছু কম পড়ে যায় বলে ?

পরীর এ-সময় দরজায় খিল দিয়ে নিজেকে খানিকক্ষণ যাচাই করে দেখার কথা—মাদুলিটা ঠিক ঠিক কাজ করছে কিনা—তাও সে মুলতুবি রেখেছে কি এই জন্যে ? মজা দেখার জন্যে ?

কালই বিকেলে কেনা রেকর্ড চারখানা মাত্র বার পাঁচেক করে বাজিয়েই রেখে দিয়েছে যে-লিলি—আজ দুপুরে ব্যথা উঠলে গজল শুনতে শুনতে ভুলবে বলে—তলপেট চিনচিন শুরু করা সত্ত্বেও সেই লিলির যে একবারও সেকথা এতক্ষণ মনে পড়েনি—সে কী নিছক মজা দেখার লোভে ?

সবচেয়ে বেশি অবাক হয় মালা।

সাবিত্রীর যত আক্রোশ যেন তারই ওপর। কিন্তু কেন ? তার আশঙ্কাটাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হল বলে ?

দরদে উথলে না উঠে তখন এ-ঘর থেকে যাওয়ার সময় সে 'যাক, এ এক রকম ভালোই হল!' বলেছিল বলে ?

কিন্তু হতভাগী কি বোঝে না—দরদ কারো চেয়ে কম দেখাতে জানে না মালা ?

কথায় কথায় ঝোঁকের মাথায় একদিন নিজের আশঙ্কার কথাটা বলে ফেললেও সেইটাই ও মনে করে রেখেছে ? আর এতদিনের সব কিছু গেছে মিথ্যে-বরবাদ হয়ে ?

এত সহজে তাকে ভুল বুঝল সাবিত্রী ? সাবিত্রীর মিথ্যে আশাই সত্যি হয়ে উঠলে কারো চেয়ে কম খুশী হত মালা ? মুক্তোমালা !

হ্যাঁ, ইচ্ছে করেই এই হঠাৎ-দরদীদের মত দরদে মালা গলে যাবে না। অনর্থক দরদে। কোন মানে হয় না যে-দরদের।

এখনও মনটা কাঁচা রয়ে গেছে সাবিত্রীর। দরদ দেখিয়ে ওই মনকে উসকে দিলে রক্ষে আছে !

দুদিনের দরদে কি সারা জীবনের সমস্যাটা মিটে যাবে ?

বরং সমস্যাটা আরও পাকিয়ে উঠবে।

বুলবুলিকে মালা দেখেনি। তবে কুন্দদের মুখে তার কথা অনেক শুনেছে। আজও বুলবুলির পিরীতের কথা বলতে গলা বুজে আসে কুন্দদের।

আগে না জানি কী হত !

তাইত বোকাসোকা সেই মেয়েটা মনে করে বলেছিল—পিরীত ভয়ানক দামী জিনিস। পিরীতের কারবারীদের পিরীতও। সেই পিরীতের মান রাখতে হলে আফিঙের ডেলা গেলা ছাড়া উপায় নেই।

রুটিতে আচার লাগিয়ে সাধাসাধি করছে কুন্দ, খাটের তলা থেকে হীটার টেনে এনে প্লাগে লাগাচ্ছে লিলি, কৌটো থেকে চামচ দিয়ে দিয়ে দুধ তুলছে পরী, কলসি কাত করে কেটলিতে জল ভরছে পটল—আর একটানা না না করছে সাবিত্রী।

মালা বলে, কেন মিছে তোরা হুজ্জোত করছিস ! রেখে দে।

কুন্দ বলে, তাই বলে—

কচি খুকি তো নয় যে জোর করে খাওয়াবি। ও যখন খেতে চাইছে না—

লিলি বলে, কিন্তু—

তার চেয়ে আমি একটা গল্প বলি শোন। শুধু ওর নয়, এ গল্প শুনলে তোদেরও পেট ভরে যাবে।

চোখ কুঁচকে সাবিত্রী বলে, দয়া করে নিজের ঘরে গিয়ে—

মুখ টিপে হেসে মালা বলে, তুই কি আমার পর !

না, সাত জন্মের গাঁটছড়া বাঁধা।

বাঁধাই তো। দে না ঘর থেকে বার করে—কেমন পারিস।

পারি না ভেবেছিস ?

দেখি না গায়ে কত জোর !

পটল অসন্তুষ্ট হয় : মালাই কোথায় জোর করে খাওয়াবে সাবিত্রীকে, তা নয়, কেমন জেদাজেদি লাগিয়েছে দেখ ! আবার গল্প ফাঁদতে চায় ! বলিহারী আক্কেল !

মালা খাটে উঠে বসে। আয় সবাই। পাশটিতে বোস।

সাবিত্রী বলে, তার মানে আমায় দুদণ্ড স্বস্তিতে থাকতে দিবি না। একটু গড়াব ভেবেছিলুম—

গল্প শোনায় মহা উৎসাহ পরীর। বলে, সে তুই আজ সন্ধ্যে থেকেই—

সন্ধ্যে থেকেই ! আহা ! মুখে তোর ফুলচন্দন পড়ুক ! এমন দিলবাহার খোঁপাই যেন বেঁধে দেয় কুন্দদি যে—

আজও তুই—!

দুনম্বর এক পাঁট টেনে নিলেই—

তুই !

মালা বলে, কেন ? এ্যাদ্দিন খায়নি বলে কোনদিনও খাবে না এমন কোন লেখাপড়া আছে ? এ্যাদ্দিন যা হয়নি—

হাই তুলে পটল বলে, আমি চলি—

বোস ! তাকে টেনে বসায় মালা। গল্প শুনতে মন না চায়, চোখ বুজে শুয়ে থাক। যদি ঘুম পায়, ঘুমোস। সাবি তো আর পর নয় ? সাবির বিছানাও যা তোর বিছানাও তা। না কিরে সাবি ?

ঠিক বলেছিস মাইরি ! হঠাৎ অপরূপ হাসি হেসে সাবিত্রী সায় দেয়। দিয়েই আচমকা মালাকে জড়িয়ে ধরে প্রচণ্ড একটা চুমো খেয়ে বসে। তোর কী ভীষণ বুদ্ধিরে মালা !

যন্ত্রণায় চোখে জল এসে যায় মালার।

তবু সে-ও হাসে। ওই অপরূপ হাসি।

হয়েছে তো ! এবার চুপটি করে বসে শোন।

কথকতা বুঝি ?

তাই !

প্রাণ বড়াল স্ট্রিটের মণিকাকে তোরা চিনিস ? চিনিস না ? যাক গে। এ-গল্প মণিকারই গল্প।

প্রথম দিন সুধাময় যখন কথাটা বলে, মণিকা হেসে বলেছিল, বেশত।

ঠিক ? তুমি রাজী ? রাজী ? বলতে বলতে সুধাময় হড়হড়িয়ে বমি করে ফেলেছিল।

মনে মনে হেসে মণিকাকে তখন সুধাময়কে নিয়ে ব্যস্ত হতে হয়েছিল। কৈলাসকে ডেকে ওর মাথায় জল ঢালিয়ে বাইরে চালান করে দিয়ে নোংরা ফরাসের দিকে তাকিয়ে প্রাণভরে সুধাময়কে গালাগাল দিয়েছিল : কত ন্যাকামোই জানেন গুণধররা ! একেকটি এক অবতার !

পরের দিন দুপুরে এসে হাজির সুধাময়। বরাদ্দ ঘুমটা নষ্ট হওয়ায় সুধাময়ের ওপর যত-না বিরক্ত হয় মণি, তার চেয়ে বেশি রেগে যায় সে নিজের ওপর : হুট করে দরজা না খুলে তার কি উচিত ছিল না দেহটাকে একটু সাজিয়ে নেওয়া ? দিনের আলোয় ময়লা শেমিজ ছেঁড়া শাড়ি পরে এলো চুল তেলতেলে মুখ নিয়ে সুধাময়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় বলে বড অস্বস্তি বোধ করে মণি : এর পর কি আর এ ঘর মাড়াবে মানুষটা ?

কিন্তু তার বেশবাসের দিকে সুধাময় চাইলে তো।

সে এসেছে ক্ষমা চাইতে : বড় কেলেঙ্কারি কাল করে ফেলেছে। ওই ভাবে বমি করে ঘরদোর ভাসানো—

হেসে মণি বলে, তাতে কি হয়েছে। ও অনেকেই—

আমি অনেকের মধ্যে নই, মণি ! গম্ভীর হয়ে সুধাময় বলে, মদ আমাদের রক্তে। তবু কেন যে কাল—

হয়ত খালি পেট ছিল—

তা ছিল।

তায় বিনা সোডায় এক নিশ্বাসে যেমন চোঁ চোঁ করে—

ঠিক বলেছ। যাক, সেকথা মনে আছে তো?

কোন্ কথা?

ভুলে গেলে! এরি মধ্যে—

ভুলেই গিয়েছিল মণি, সুধাময়ের অভিমানী মুখ দেখে স্বর শুনে মনে পড়ে যায়।

কেন যাবে না ভুলে? রাতটা যেমন মণিদের মিথ্যে নয়, রাতের কথাগুলিও তেমনি সত্যি হয়ত। কিন্তু রাতের কথা দিনে মনে রাখলে চলে? ও রকম কথা কি সুধাময়ই প্রথম বলছে?

হাত ধরে মণি বলে, পাগল! সেকথা কি ভোলা যায় গো! এসো। বোসো। কী খাবে বলো?

তোমার মাকে ডাকো।

মা? মা তো এখন নেই।

নেই? তবে যে কাল বললে—

থাকার কথাই ছিল, কিন্তু মাসি তারকেশ্বর যাচ্ছে দেখে—

স্রেফ ধাপ্পা। ধাপ্পা না দিয়ে উপায় কি। লোকটার মাথায় ছিট আছে নির্ঘাত। তাই নেশার ঘোরে বলা রাতের কথাটা এখনও মনে রেখেছে, দিনের আলোয় মণির দিকে তাকিয়েও ফের বলতে পারছে। অন্নর সামনেও হয়ত বলবে। কিন্তু তারপর?

এর চেয়েও চটচটে প্রেমের কথা তো কম শোনে নি মণি? বয়েস বাড়লেও বড়ঘরের লেখাপড়া-জানা যেসব পুরুষের ছেলেমানুষি ঘোচে না তাদের মুখ থেকে?

ওর কথামত যদি অন্নকে এখন ছাদ থেকে সে ডেকে আনে—অন্নর কাছেও প্রস্তাবটা ও পেড়ে বসবে। এক কথায় রাজী হয়ে যাবে অন্নও।

নিজের মাকে চিনতে বাকি নেই মণির। কিন্তু তারপর?

দুদিন পরেই এ যখন বেমালুম ডুব মেরে বসবে—তখন? তখন কী করে মণি সামলাবে মাকে?

কখন ফেরার কথা?

সন্ধ্যে হতে পারে।

ঠিক আছে।

রাত হওয়ায়—

বেশ ত।

আবার আজ নাও ফিরতে পারে। মাসি হত্যে দেবে কিনা—

আমাকে ভাগাতে চাইছ, মণি! অমনি অভিমান হয়ে যায়।

তাড়াতাড়ি তার দু হাত মণি জড়িয়ে ধরে: ছি ছি, মণিকে সুধাময় ভাবে কী! মণি ইয়ে বলে কি—আশ্চর্য! সুধাময় কি বিশ্বাস করবে এতক্ষণ ঘরে খিল দিয়ে তারই কথা ভাবছিল মণি? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিল—আজই যেন সুধাময়ের সাথে একবার দেখা হয়? সুধাময়কে অমন অবস্থায় একা একা কাল পাঠিয়ে দিয়ে সারাটা রাত যে মণির কী দুশ্চিন্তায় কেটেছে! নিজের আহাম্মুকির জন্যে হাত কামড়াতে—

তুমি সত্যি বলছ, মণি?

সুধাময়ের মুখের দিক তাকিয়ে এবার মায়া হয়। আপসোস জাগে নির্ভেজাল: কথাটা যদি হত! দুশ্চিন্তা করার কেউ যদি থাকত!

সন্ধ্যের মুখে দরজায় টোকা পড়ে।

মণি বেরিয়ে যায়।

সাঁঝ পেইরে গেল। গা ধুবিনি?

আর কেন বল—জ্বালাতন!

কে?

কদিন আসছে। আজ দুপুরেই এসে জুটেছে!

শাঁসালো?

মনে তো হয়।

তবে ঠিক আছে, যা। তা হ্যাঁরে, ই কী চেহারা করে রেখেছিস!

ঘরে ঢুকে আয়নায় দাঁড়ায় মণি। কিন্তু সাজা দূরে থাক, চুলটা পর্যন্ত সুধাময় বাঁধতে দেয় না।

কী দরকার। দুদিন বাদে যে ঘরনী হবে, তার এই ঘরোয়া বেশই ভালো। বরং ওসব মুলতুবি রেখে সুধাময়ের পাশে এসে বসুক মণি। বসে থাকুক। কথা বলুক। কথা। ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে। কথা আর কথা!

কত কথা যে সুধাময়ের বলার আছে! কত কথা যে সুধাময় শুনতে চায়!

খাবারের জন্যে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করে দেওয়া সত্ত্বেও মণি হাত সরিয়ে না নেওয়ায় সুধাময় আঙুল থেকে হীরে-বসানো আংটিটা খুলে পরিয়ে দেয়।

হাতে হাতে টাকা দেওয়া সে আগেই বন্ধ করেছিল। হাতে টাকা ধরে দিয়ে সে অপমান করতে পারবে না মণিকে। এ অপমান কি শুধুই মণির?

এই আংটিতে অবিশ্যি মণির সাত রাতের রেট পুষিয়ে যাবে, কিন্তু তা নয়—টাকা চেয়েছিল সে—।

বাধা দিয়ে সুধাময় বলে, ও জিনিস আর ছোঁব!

কিন্তু অভ্যেস—

বদলাব। সব কিছু আমি বদলে দেব। জানো মণি—

নেশা না করেও ভয়ঙ্কর একটা নেশায় পেয়ে বসে সুধাময়কে। কথা বলে যায় সুধাময়। অনর্গল কথা। অসম্ভব কথা। আজগুবি কথা। অদ্ভুত অদ্ভুত কথা।

মণির হাত ধরে থেকে সুধাময় যেন আরেক জগতে চলে যায়।

এবং নেশা লাগে যেন মণিরও।

নির্ঘাত ছিট আছে লোকটার মাথায়। থাকুক। কিন্তু অসম্ভব আজগুবি অদ্ভুত অদ্ভুত কথাও এমন জোর গলায় বললে কি তা অতিসম্ভব সত্যি বলে মনে হয় না? একই মানুষ একই কথা যদি দিনের পর দিন বলে?

তখন কি সেই কথাগুলি আঁকড়ে ধরতে প্রাণ চায় না? বিশেষ করে মণিদের?

মিষ্টি-মধুর কথা অনেক শুনলেও ঠিক এই ধরনের কথা যারা বড় একটা শোনে না। শুনলেও একজনের কাছে এক রাতের বেশি নয়।

আহা, করবে নাকি কথাগুলি বিশ্বাস ? করবে নাকি!

মণির মনে পড়ে অন্নর কথা। বারান্দাতেই আছে অন্ন। ডাকা মাত্র ছুটে আসবে। শোনা মাত্র পায়ে সুধাময়ের লুটিয়ে পড়বে—সম্পর্কে তার শাশুড়ী হওয়ার কথা হলেও।

মেয়ে তার গেরস্থ ঘরের বউ হবে—এ কী আজকের সাধ অন্নর!

এর জন্যে একদিন প্রায় ক্ষেপে গিয়েছিল অন্ন। একটি জামাইয়ের আশায় কী না করেছে। শেষ পর্যন্ত আর মানুষ না পেয়ে মনোরমার ছেলেটাকেই পছন্দ করে বসেছিল। অন্নর চেয়ে মনোর মান বেশি বটে তো। মাটকোঠার ভাড়াটে যে-মনো।

হোক মনোর ছেলে ঘুসকির ছেলে—কিন্তু বিয়ে-থা করে ভদ্রভাবে অমন কত মনোর ছেলে সংসারপাতি করছে। খোদ পাড়ারও কত ছেলে। গোবরার বউ হয়েও মণি গেরস্থ ঘরের বউ হয়ে উঠুক। মরে অন্ন শান্তি পাক। তার জন্ম-জন্ম পাপের প্রাচিত্তির হোক।

স্বদেশী উকিলের মত জামাই না জুটলে, কী আর করা। কপাল তো সকলের সমান নয়।

নইলে পুলিশের ভয়ে ছেলেটি অন্নর মায়ের কাছেই এসে উঠেছিল। অন্নর মাকে মা বলে ডেকেছিল। তিন রাত একই ঘরে তিনজন কাটিয়েছিল। তখনই সে দেখেছিল রাধাকে। মাস সাতেক আগে আগের বাড়িউলীর সাথে ঝগড়া করে তাদের পাশের ঘরে এসে উঠেছিল যে-রাধা।

কিন্তু অন্নর চেয়ে কালো রঙ এবং অন্নর চেয়ে রোগা হলেও প্রথম থেকেই কেন রাধার দিকে মনটা তার ঝুঁকে পড়ল ?

এমন ঝোঁকাই ঝুঁকল যে রাধাকে নিয়ে রাখল এক আশ্রমে। লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিল। বোমার মামলায় নিজে সাত বছরের জন্যে জেলে চলে গেলেও বন্ধুদের বলে গেল রাধার দেখাশোনা করতে। সাত বছর পরে ফিরে এসে

বাপ-মায়ের সাথে ঝগড়া করে সাক্ষীসাবুদ রেখে সই-করা বিয়ে করল সেই রাধাকে।

কত বছর হয়ে গেল। কতগুলি বছর! সকলে হয়ত এসব কথা ভুলেই গেছে। ভোলেনি অন্ন।

সেদিনের সেই ছোকরা স্বদেশী উকিল দেশের আজ নামকরা নেতা। গরিবের মা-বাপ। তার বউ হয়ে আছে রাধা। চমৎকার আছে ছেলেমেয়ে নিয়ে। সুখের সংসার।

ভোটের সময় স্বদেশী উকিল আর রাধাকে অন্ন দেখেছিল, দূর থেকে—দুজনেরই বয়েস হয়েছে, চেহারা ভারভরতি হয়েছে। পাশাপাশি কী সুন্দর মানিয়েছিল দুটিকে। মরি মরি—যেন হরগৌরী! রাধাকে মা বলে স্বদেশী উকিলকে বাবা বলে প্রণাম করছিল সবাই। দেখাদেখি অন্নও করে বসেছিল।

রাধা তাকে চিনতে পারেনি। না পারুক। না চিনুক। ভগবান রাধাকে অন্নদের থেকে হাজার গুণ বড় করুন। ভগবান রাধাকে অন্নদেব থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখুন। ছোট-বড় সবার, দেশসুদ্ধ লোকের, মা-বাপ হোক ওরা দুটিতে। দেশের রাজা-রানী হোক।

স্বদেশী উকিলকে ভোট দেবার জন্যে সাধেই অন্ন বাড়ির সবাইকে পাঁচ টাকার তেলেভাজা-মুড়ি খাইয়েছিল? স্বদেশী উকিল রাজা হলে রাধাও না রানী হবে?

কিন্তু বিয়ের যখন প্রায় সব ঠিক, একজনের মাথা ফাটিয়ে বেপাত্তা হয়ে গেল মনোরমার ছেলে গোবরা।

মন ভেঙে গেল অন্নর। মনের সঙ্গে শরীরও। বাধ্য হয়েই কর্পোরেশনের ইস্কুলে ছেড়ে তেরো বছরের রাধাকে তখন—

পরের দিন সকালেও যায় না সুধাময়। অন্নর সাথে দেখা না করে ঘর থেকে সে নড়বে না।

এখন এসো। সন্ধ্যে বেলা ফের—

উঁহু।

বাড়িতে ভাববে না?

না। বাড়ির সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

তাড়িয়ে দিয়েছে বুঝি? মালা ঠাট্টা করেই বলে।

সুধাময় গম্ভীর হয়ে জবাব দেয়, দিলে ভালো হত। দেয়নি বলে আমিই সবাইকে ত্যাজ্য করে দিয়েছি। মণি, আমি নিজের মনোমত করে নিজের সংসার গড়তে চাই। সে-ক্ষমতা আমার আছে, সে-সাহস আমার আছে। জানো, মণি, আমার বংশকে আমি ঘেন্না করি। আমি—

সেরেছে! এই বুঝি ফের শুরু হল! বাধা দিয়ে মণি বলে, বাড়িতে ভাবনার লোক না থাকুক, এখানে সবাই কী ভাববে বলো তো?

যা-খুশি।

তোমার লজ্জা করবে না?

না, আমার লজ্জা এত সস্তা না। জোর গলায় সুধাময় বলে, তোমার মার সাথে দেখা না করে আমি নড়ছি না। অবশ্য তোমার যখন মত আছে—আর কারো তোয়াক্কা না করলেও পারি। তবু মা তো। রাজী হোন না হোন, ওঁকে একবার জিজ্ঞেস করতেই হবে।

এত খাতির করে অন্নর কথা কেউ কখনও বলে নি। কিছুক্ষণ মণি এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে সুধাময়ের দিকে। এক ফোঁটা পেটে না পড়লেও সারাটা রাত মাতালের মত আবোলতাবোল বকেছে। দিনের আলোতেও তার জের টেনে চলেছে। তবে কি—

মণিরও কেমন রোখ চেপে যায়।

বেশ, মাকে ডেকে আনছি।

সুধাময় হেসে বলে, আমি জানতাম!

কী জানতে?

জানতাম আমায় তুমি ভুল বুঝবে না। জানতাম মা তোমার বাড়িতেই আছেন। দুষ্টু! না, মণি, তোমার কোন দোষ নেই। কেন তোমরা অত সহজে আমাদের বিশ্বাস করবে? বিশ্বাসের কোন কাজ কি কোনওদিন আমরা করেছি! বলে মণির হাতটা একবার মুঠো করে ধরেই ছেড়ে দেয় সুধাময়।

বুক মণির উথলে ওঠে। পুরুষের-সোহাগে-অরুচি-ধরে যাওয়া দেহটা তার সুধাময়ের এই সামান্য ছোঁয়াতেই শিউরে ওঠে। নিজে থেকে সে মাথা গুঁজে দেয় সুধাময়ের বুকে।

পুরুষের বুকে এরকম মাথা গুঁজে দেওয়া তার পেশা হলেও, মণির মনে হয় জীবনে আজ প্রথম সে এক পুরুষের বুকে আশ্রয় খুঁজল।

এবং সত্যিকারের কান্না, যে-কান্নার অসহ্য আনন্দে সমস্ত দেহ ভেঙে-গুঁড়িয়ে খানখান হতে চায়, জীবনে আজ প্রথম কাঁদল।

মণি আগে না জানলেও একটা বউ ছিল সুধাময়েব। কলেজে পড়ার সময় বাপের ধরে-বেঁধে বিয়ে-দেওয়া বউ। কিন্তু একটি দিনের তরেও সতীনের ঘর মণিকে করতে হয় নি।

মালাবদলের বউকেই সত্যিকারের বউ বলে পরিচয় দিয়েছিল সুধাময়।

সংসারের সঙ্গে সত্যিই কোন সম্পর্ক ছিল না সুধাময়ের।

থাকত বালিগঞ্জে ভাড়াটে বাড়িতে। বেরোত শেয়ার বাজারে। তবে খুশিমত, মর্জিমাফিক। যেদিন ইচ্ছে হল গেল, না হল গেল না।

অনুপমা (মণি নয়, অনুপমা। বিয়ের পরই সুধাময় নামটা বদলে দেয়।) যদি বলত, ও-কি, খেয়েদেয়েই যে বড় শোয়া হচ্ছে? বেরনো হবে না? এই না কাল বলা হল—

বলেছিলুম তো! আয়েস করে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে সুধাময় বলে, বেরোলে মোটারকম কিছু হাতানোও যেত। কিন্তু মন চাইছে না, অনু।

কয়েক ঘণ্টার তো মামলা। ঘুরে এলে পারতে।

মোটা লোকসানের জন্যে বুঝি আপসোস হচ্ছে? কিন্তু বেশি টাকায় আমাদের কী দরকার, বউ! (অনু নয়, বউ। আদর করে ডাকবার সময় বউ।) বেশি টাকা হওয়া ভালো নয়, বুঝলে?

হয়ত। বেশি টাকা থাকলে মানুষ নাকি সহজে খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু খারাপ-হওয়া মানুষরা সকলেই কি বেশি টাকাওলা?

তাও তো নয়। বরং অতি-বেশি টানাটানি যাদের তারাই না একটা রাত

কি কয়েকটি ঘণ্টা সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলতে চেয়ে প্রথমে পা বাড়ায় খারাপ পথে—সামলাতে পারে না তারপর?

অনুপমার মনে পড়ে—মন্দার কাছে আসত সেই আধ-বুড়ো মানুষটার কথা: মেয়ের বয়েসী মেয়েটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল নাকি। মাসের প্রথম দিকে খরচ করত দুহাতে। মন্দাকেই শেষে সারা মাস তার বাজার খরচ, ওষুধের দাম, ছেলের মাইনে, মুদির দোকান বাবদ টাকা ধার দিয়ে ধাক্কা সামলাতে হত সেই প্রেমের।

বড়লোক হলেই খারাপ হয়ে যায়? ওই তো সামনের বাড়ির কর্তা বড়লোক। বাগানওলা নিজের বাড়ি, নিজের মোটর। বড় চাকরে। কাঁচা বয়েস। কিন্তু ছাখ, সন্ধ্যে হওয়া মাত্র বাড়িতে হাজির। তিন-চারটি আইবুড়ো ভাইবোন। কেমন ফিটফাট হয়ে তারা ইস্কুল-কলেজ যায়, সকাল-সন্ধ্যে চিৎকার করে পড়ে। গলা সাধে, ব্যাডমিণ্টন খেলে। ছেলেকে কাঁধে চাপিয়ে মাঝে মাঝে পড়ার ঘরে গিয়ে দাঁড়ায় ভদ্রলোক, বারান্দায় ছেলের সাথে হামাগুড়ি দিয়ে খেলা করে।

দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

বুঝেছি! সুধাময় মুচকি মুচকি হাসে।

কী বুঝেছ শুনি?

চোখ জুড়িয়ে যাবার মত অবস্থা তোমারও একদিন হবে, বউ। কোলে একটি—

ছাই বুঝেছ! ঘোড়ার ডিম বুঝেছ! দৌড় দেয় অনুপমা।

বলতে কি, এত সহজে লজ্জা তার পেত না। পাওয়ার কথাও না। কিন্তু মার উপদেশগুলি মনে করে কথায় কথায় লজ্জা তাকে পেতেই হয়। মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে টের পেয়েও।

কিন্তু মাস কয়েক পরে দেখে, লজ্জা সে সহজে পেতে না চাইলেও, কী সহজে লজ্জাই তাকে পেয়ে বসে এখন।

দিনের বেলা জানালা খোলা থাকলে স্বামীর পাশে দাঁড়াতেও এখন লজ্জা করে। আশেপাশে কোনখানে কেউ আড়ি পেতে নেই জেনেও।

এক ঘণ্টা ধরে নতুন কায়দায় খোঁপা বেঁধেও স্বামী বাড়ি ফেরামাত্র অবাধ্য হাত দুটি তার চটপট দেয় মাথায় আঁচল তুলে। কেন? না, বামুনদিদি যে রান্নাঘরে!

সিঁদুর পরবার সময় আয়নায় পর্যন্ত ভালো করে চাইতে পারে না, নিজের সিঁথির দিকে তাকিয়ে নিজেরই দুই কান এমন ঝাঁ ঝাঁ করা শুরু করে দেয়!

মাঝে মাঝে অনুপমার সত্যিই বড় খারাপ লাগে: এ কী বেআক্কেলে লজ্জা তার! সেকেলে শাশুড়ি থাকতেও ও-ফ্ল্যাটের বউটি কেমন দিব্যি সেজেগুজে রোজ স্বামীর সাথে বেড়াতে যায়, আর সুধাময় এত করে বলা সত্ত্বেও যদি-বা সে সিনেমায় যেতে একদিন রাজি হল, তাও বায়না—নটার শোয়ে, ট্যাক্সি করে, বক্সের টিকিটে?

মাসে পনেরোটা টাকা বাঁচাবার জন্যে বার বার বামুনদিদিকে ছাড়িয়ে দিতে বলে একদিনেই সে কিনা খরচ করিয়ে দিল কুড়ি-বাইশ টাকা—আড়াই-তিনের জায়গায়? বেআক্কেলে তার লজ্জার জন্যে?

নিজের ওপর অনুপমার রাগ হয়ে যায় ভীষণ।

সুধাময় একদিন বলে, গানবাজনার পাট যে একেবারে তুলেই দিলে গো।

তুমিও তো কই শুনতে চাও না। পাল্টা অনুযোগ জানায় অনুপমা।

অ! দোষ আমার? সব কিছুই আমায় চেয়েচিন্তে জোর-জবরদস্তি আদায় করে নিতে হবে? নইলে তুমি নিজে থেকে কিছু দেবে না? বলে আর মুচকি মুচকি হাসে সুধাময়।

সুধাময় ছোঁবে ভেবেই লজ্জায় মুখখানি তার বুকের মধ্যে লুকোতে চাইলেও বেহায়ার মত অনু বলে, সে-ফুরসুত মশায় কত দেন!

দিলে?

জানি না—যাও! সুধাময়ের মুচকি মুচকি হাসির হাত এড়াতে গিয়ে সুধাময়ের দেহটাকেই সে সবচেয়ে বড় আড়াল ভাবে।

না, কিছুতেই সে লজ্জাকে আর মাথায় উঠতে দেবে না।

কাল আমার কয়েকটি বন্ধুকে চা খেতে বলেছি, বউ।

বন্ধু ! বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে অনু আঁতকে ওঠে। কারা? তারা?

আরে না না। এদের তুমি দেখনি। ওরা ছিল শেয়ার বাজারের সাঙাৎ, এরা কলেজের সঙ্গী-সাথী।

তারা আসবে? জেনেশুনেও—?

আসবে না! শোনা ইস্তক আসবার জন্যে সবাই বলে ছেঁকে ধরেছে। ওদের কাছে রাতারাতি আমি একটা কেউকেটা হয়ে উঠেছি জানো?

তুমি রাজি হয়েছ?

হব না! চুরি করেছি না ডাকাতি করেছি যে লুকিয়ে থাকব? ওসব পরোয়া আমি করিনে, অনু! মাকে পর্যন্ত একদিন নিয়ে আসব দেখ।

মাকে আনবে?

আলবৎ।

আসবেন!

আসবেন না আবার! রায় বাড়ির বউ হাজার হলেও। সতু রায় মরার সময় বলেছিল, নিজের স্ত্রী নয়, রামবাগানের হীরেমতী এসে তার সেবা করবে। আপত্তি করা দূরে থাক, সতু রায়ের বউ নিজে গিয়েছিল হীরেমতীকে আনতে। আমার ঠাকুর্দা তো রঙমহলেই—হঠাৎ সুধাময় প্রসঙ্গ বদলায়, মাকে আনব এখন নয়—ঠিক সময়। এনে এমন একটি জ্যান্ত জিনিস কোলে তাঁর তুলে দেব যে ছেলে, ছেলে-বউয়ের কথা ভুলেও বুড়ির মনে পড়বে না।

বলে আর মুচকি মুচকি হাসে সুধাময়।

মাথা তখন অনুপমার ঝিমঝিম করছে। চোখের সামনে পর্দার পর পর্দা নামছে। দেহটা ক্রমেই হালকা হতে হতে বেলুন হয়ে গেছে হাওয়ায় উড়তে শুরু করে দিয়েছে।

পরের দিন সন্ধ্যায় এল জন চারেক বন্ধু।

নিজের হাতে জলখাবার তৈরি করতে বসে অনুপমা। সেই সঙ্গে তার মনটাকেও: যেতে যখন হবেই, যাবে। নিজের হাতে জলখাবার দেবে। হাত

তুলে নমস্কার করবে। মুখ ফুটে কিছু না বলতে পারে, ঘাড় নেড়ে সব কথায় জবাব দেবে। জায়গা মত হাসবেও।

না, বেআক্কেলে লজ্জাটাকে ঘণ্টাখানেকের জন্যে অন্তত মাথায় উঠতে কক্ষনো দেবে না।

কিন্তু সকলের সামনে সুধাময় গানের ফরমাস করে বসতেই হাত-পা তার কাঠ হয়ে যায়। স্তব্ধ হয়ে পলক কয়েক দাঁড়িয়ে থেকে আচমকা চলে আসে।

সুধাময় আসে খানিক পরে।

এত দেরি করছ কেন? ভুলে গেলে নাকি গানের পদ? নাকি হারমোনিয়ামটা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না?

সুধাময়ের দুই হাত ধরে অনুপমা ককিয়ে ওঠে, ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, বলো না—সবার সামনে আমায় গাইতে বলো না! যদি চাও তোমায় আমি সারারাত—

আশ্চর্য! একটা গান গাইবে—

সে আমি মরে গেলেও পারব না।

মরে গেলেও পারবে না! দু পা পিছিয়ে যায় সুধাময়। ঈষৎ-কঠিন গলায় বলে, এ তোমার বাড়াবাড়ি। ওদের বউরা গায় না আমার সামনে?

আমার যে বড় লজ্জা করে গো!

লজ্জা?

বিশ্বাস করো—এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—

বাজে বকো না। হারমোনিয়ামটা সুধাময় বুকে তুলে নেয়। মুখে একটু পাউডার বুলিয়ে তাড়াতাড়ি এসো। বন্ধু-বান্ধবের সামনে আমায় বেইজ্জত করো না—দোহাই তোমার। এসো। একই সাথে মিনতি এবং হুকুম জানিয়ে চলে যায়।

সাতপাঁচ ভেবে অনুপমাও তারপর এগোয় গুটিগুটি।

পাউডার বুলানো আর হয় না: আয়নার সামনে এখন দাঁড়ালে কি নড়তে পারবে সহজে? সারা বিকেল যে-সমস্যায় অস্থির হয়েছে, ফের সেটা নতুন করে দেখা দেবে—কি ভাবে প্রসাধন করে কোন্ সাজসজ্জায় দাঁড়াবে গিয়ে

ওর বন্ধুদের মুখোমুখি ? অনেক কষ্টে রাজি করানো মনটা আয়নায় নিজের মুখখানি দেখেই যাবে না বিগড়ে ?"

আর যাই হোক, স্বামীর সাথে জেদাজেদি করা উচিত না—অনেক করে বলে দিয়েছে মা—মনে পড়ে যায় অনুপমার।

হে মা কালী! আজকের দিনটা ভালোয় ভালোয় কাটিয়ে দে। এরপর সময় বুঝে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক ওকে আমি বাগে নিয়ে আসব। হে মা কালী!

প্রথমে একটা রামপ্রসাদী গায়।

সবাই তারিফ করে।

কৃতকৃতার্থের হাসি হাসে সুধাময়। বলে, রামপ্রসাদী আর কি শুনলি হীতেন। ওর গলায় ঠুংরি যা খোলে! ওগো, শুনিয়ে দাও তো সেইটে—সেই যে—সাথ উনকী হাজারোঁ কো দিল যায়েঙ্গে—দাঁড়াও, বাঁয়া-তবলা নিয়ে আসি।

হারমোনিয়ামের রীডে কপাল ঠুকতে ইচ্ছে করে অনুপমার। তবু গায়। কান্না চেপে চটুল প্রেমের সেই ঠুংরিটাই গায়।

আনাড়ী হাত সুধাময়ের। মাঝে মাঝে ঠেকার ভুল হয়ে যায়, নিজেকেই তখন সামাল দিয়ে তাল রাখতে হয়।

বন্ধুরা চলে গেলে ঘরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে অনুপমা।

প্রথমে সুধাময় বিরক্ত হয়।

পরে করে রাগ।

শেষে অনুতাপ। হাত ধরে ক্ষমা চায়ঃ আর কোনদিন কোন বন্ধুকে সে যদি বাড়িতে আসতে বলে!

গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে।

পায়ে পর্যন্ত হাত দিতে চায়।

কান্না তবু থামে না অনুপমার। তাড়াতাড়ি স্বামীর পায়ের ধুলো নিয়ে নতুন করে কাঁদতে বসে।

কী ভেবে গেল! আমায় ওরা কী ভেবে গেল!

বোকাটা! পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে সুধাময় প্রবোধ দেয়, অত গেঁয়ো নয়

ওরা। জানো, নীতিশের বউ একবার সিনেমায় নেমেছে? চান্‌স্ পেলে আবার—

কিন্তু—

ওই তো তোমার দোষ, অনু। শহরের হালচাল জানো না, জানাতে চাইলেও জানতে চাও না। জানো, পুলকেশের বোন—বুঝলে, পুলকের আপন মায়ের পেটের বোন—সিপ্রা নামকরা নাচিয়ে? পেশাদার, কিন্তু সেজন্যে লজ্জা পাওয়ার বদলে বুক ফুলিয়ে পুলক বরং বোনের গর্ব করে বেড়ায়। এই সেদিন—

কেন তুমি বোঝ না যে—। কথা শেষ না করে অসহায় চোখে স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে অনুপমা।

মুখোমুখি দুজন।

সুধাময়ই আগে মুখ ফেরায়।

আস্তে আস্তে বলে, একেবারে যে না বুঝি তা নয়, বউ। তোমার এই বাড়াবাড়ি রকমের লজ্জার কারণটা কিছু কিছু আঁচ আমিও করতে পারি বইকি। কিন্তু, একটু থামে সুধাময়, কিন্তু এত লজ্জাবতী হলে তো চলবে না, অনু। দিনরাত ঠাকুরঘরে পড়ে থাকে বলেই না মায়ার সাথে আমার আরো বনল না। আজ-কালকার বউ আজকালকার মত না হলে চলে? আমি সবার বাড়ি গিয়ে সবার বউয়ের সাথে আড্ডা-ইয়ার্কি মেরে আসব, আর আমার বাড়ি কেউ এলে আমার বউ তার সামনেও বেরোবে না—এ কেমন কথা! দাঁড়াও, তোমার লজ্জা আমি ভেঙে দিচ্ছি।

এরপর শুরু হয় অনুপমার লজ্জা-ভাঙার পালা।

অনুপমাও তো প্রাণ থেকে তা-ই চায়।

মাঝে মাঝে লজ্জাটা যে কী যাচ্ছেতাই রকম বাড়াবাড়ি করে বসে, সে নিজেই কি জানে না?

সে-ও চায় লজ্জার এই বাড়াবাড়ি থেকে রেহাই পেতে। আর পাঁচজন স্ত্রীর মত স্ত্রী হয়ে থাকতে।

তাই কদিন পরে সন্ধ্যার শোয়ে ট্রামে-বাসে সিনেমায় যাবার প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যায়।

পাশের ফ্ল্যাটের বউটির মতই সেজেগুজে স্বামীর সাথে বেরোয়। পাশাপাশি হেঁটে গলিটাও পেরোয়।

কিন্তু ট্রামে উঠেই সেই অস্বস্তি: কেবলি মনে হয়, তাকে চিনতে পেরেই যেন বসে-থাকা লোক দুটি তড়াক করে উঠে গিয়ে সরে দাঁড়াল। ছোঁয়া তার বাঁচিয়ে।

শুধু ওই দুজন নয়, আশপাশের সবাই। তার ছোঁয়া বাঁচিয়ে ওরা সরে দাঁড়িয়েছে বটে, থেকে থেকে তাকাচ্ছে কিন্তু আড়চোখে। হ্যাংলার মত! সরাসরি না যদিও—সেটা নিজেরা নেহাত ভদ্রলোক বলে, এটা ট্রাম বলে।

অতি-পরিচিত এই চাউনিতেই আতঙ্ক তার সবচেয়ে বেশি। ও চাউনি দেখলে যে কত কথা মনে পড়ে গিয়ে বুকের ভেতরটা বরফ হয়ে যায় হঠাৎ।

সিনেমাতেও একই ব্যাপার। চাইকি আরও মারাত্মক ব্যাপার।

শো আরম্ভ হয়ে গেছে, ঘর অন্ধকার—তবু যেন সকলেই তাকে চিনতে পেরে যায়। আগে আগে চলেছে সুধাময়, পা গুটিয়ে কেউ পথ করে দেয় না, একজন তো খেঁকিয়েই উঠল—কিন্তু পিছনে সে আসামাত্র চেয়ারের সাথে টান টান হয়ে বসে সবাই।

টান টান্ হয়ে বসে বটে, মুখ তুলে মুখে মুখে কিন্তু চাইতে ছাড়ে না।

ইণ্টারভ্যালে তো এপাশ ওপাশ চারপাশ থেকে চুরি করে করে চাওয়ার কমপিটিশন পড়ে যায়।

লোকগুলো কী অসভ্য! ফিসফিস করে স্বামীর কাছে নালিশ জানায় অনুপমা।

বেচারা! বিগলিত স্বরে সুধাময় বলে, আমারই বলে একটা আসল অসভ্যতা করে বসতে মন চাইছে! তোমায় যা মানিয়েছে এই লাল জর্জেটে! আগুন! একেবারে আগুন! চলো না আজ বাড়ি—। দাঁতে দাঁত ঘষে আর মুচকি মুচকি হাসে সুধাময়।

চাষা! সরে বসে অনুপমা।

বউকে দেখে স্বামীকেই যদি না হিংসে করল তো বউ কিসের! সরে আসে সুধাময়। তেমন বউ নিয়ে বাইরে বেরিয়েই বা কী লাভ!

সিনেমার পরে রেস্তোরাঁ। তা রেস্তোরাঁ নেহাত মন্দ না: পর্দা ফেলে দিলেই আলাদা ঘর।

স্বামীর হাজার চাষাড়েপনাও তখন খারাপ লাগে না।

বরং অনেকদিন পরে রেস্তোরাঁর খাবারে মুখ বদলাতে ভালোই লাগে।

দিন কয়েক পরে তাই সিনেমার বদলে সুধাময় শুধু রেস্তোরাঁর নাম করতে উৎসাহিত হয়ে ওঠে অনুপমা।

আজও অবিকল সেই রকম সাজে। উহুঁ, তার চেয়েও আজ জমকালো সাজ। ট্যাক্সি করে যাবে-আসবে—দেখবে না কেউ। অথচ এই বাড়তি একটু সাজগোজেই মানুষটা যেন বর্তে গেছে। পারে তো কোলে তুলে নিয়ে ট্যাক্সিতে তাকে বসিয়ে দেয়।

কোনদিন যেন তাকে ছুঁয়েও দেখেনি!

রেস্তোরাঁয় ঢুকেই কেমন কেমন লাগে। বয়কে সুধাময় একজনের খাবারের অর্ডার দিতে বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে।

তুমি কিছু খাবে না?

খাব। পরে খাব। সুধাময় মুচকি মুচকি হাসে।

প্রথম আসে খাবার।

তারপর—

কাটলেটের একটা টুকরো সবে মুখে পুরেছিল, থু থু করে ফেলে দিয়ে আর্তস্বরে অনুপমা বলে, এ তুমি আমায় কোথায় নিয়ে এলে!

আঃ, আস্তে! সুধাময় চাপা ধমক দেয়, কেন? এখানে কি মানুষ আসে না? না, দু-এক চুমুক খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?

তাই বলে আমায় নিয়ে—

দোষ কি? সুধাময় বলে, মিসেস দত্তর সাথে আলাপ করবে? ঠিক আটটায় আসে, দত্তকে নিয়ে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খায়। বউকে পাশে বসিয়ে ড্রিঙ্ক

করাটা তুমি হয়ত বাড়াবাড়ি বলবে—কিন্তু জানো, ওদের দুজনেরই কী নামডাক সমাজে ? মিসেস দত্তর নার্সারি স্কুলে লাটসাহেব পর্যন্ত যান, আর কাউন্সিলার মিস্টার দত্ত—

একটানা সুধাময় কথা বলে যায়, গেলাস হাতে ধরে। মুখস্থ-করা কথাগুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেন চুমুক দেবে না প্রতিজ্ঞা করেছে। গেলাসটা বার কয়েক ঠোঁটে ঠেকিয়েও তাই বুঝি নামিয়ে রাখে।

হাঁ করে কী দেখছ ?

কিছু না !

নাও, কাটলেটটা তাড়াতাড়ি শেষ করো। তারপর এখানকার চপ খেয়ে দেখ—

গা বমি বমি করছে।

গা বমি বমি করছে ? অ্যাঁ। সে কী ! চাটনি-টাটনি কিছু দিতে বলব ? কাঁচা তেঁতুল তো বারে পাওয়া যাবে না। মুচকি মুচকি হাসে সুধাময়।

তার চেয়ে ওই দাও না, দমভর খাইয়ে, খেয়ে যাতে—

ছি !

ক্ষতি কি ! হাজার হলেও তো আমি—

বউ !

অনুতপ্ত হয় সুধাময়। সত্যিই অনুতপ্ত। বাড়ি ফিরে নির্ভেজাল অনুতাপ জানায় হাত ধরে।

পায়ে ধরতে যায় পর্যন্ত।

অনুপমার লজ্জার বাড়াবাড়ি ভাঙতে গিয়ে সত্যি সে আরও বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

হাজার হলেও মিসেস দত্ত বিলেত ফেরত। ওদের সমাজে বারে গিয়ে স্বামী স্ত্রীর এক সাথে মদ খাওয়া দোষের নয়।

বিয়ের পর অতীন অবিশ্যি বউকে একদিন বারে নিয়ে গিয়েছিল। তা সে আগে থাকতে বউকে রাজী করিয়ে তার মত নিয়ে, তবে। এবং বারে নয়, খাস

সাহেবী হোটেলে। চেনাশোনা কারো সাথে দেখা হয়ে গেলে যাতে বলতে পারে —নতুন বউকে সাহেবী খানা খাওয়াতে এনেছি ভাই।

যাক, এবারের মত অনুপমা ক্ষমা করুক। আর কোনদিন যদি সে মদ ছোঁয় সুধাময় রায় তাহলে এক বাপের—

অনুপমার মনটাও নরম হয়ে এসেছিল। আর যাই হোক, আসলে মানুষটা মন্দ নয়। বড বেশি জেদী, এই যা। ভালো করতে গিয়েই জেদের বশে খারাপ করে ফেলেছে।

আসলে সব দোষ তার বেআক্কেলে লজ্জার।

তাড়াতাড়ি স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়ে অনুপমা বলে, খবর্দার! যা তা বলো না বলছি! এক-আধটু খাওয়া কি দোষের! ডাক্তারেও তো অনেক সময় খেতে বলে। তাছাড়া—তুমি তো খেতেও। চিরকেলে অভ্যেস তোমার—

কিন্তু তুমি যখন চাও না—

চাই না মানে ও-রকম চাই না। ব্যাটাছেলে অত হিসেব করে চলতে পারে? নাকি এতদিনের অভ্যেসটা একদিনে ছেড়ে দেওয়া ভালো? (মার উপদেশগুলি হঠাৎ মনে পড়ে যায়।) তোমার যদি খেতে সাধ যায়, খেয়ে এসো। আমি কিচ্ছু মনে করব না।

খেয়ে এসে যদি পাড়া মাথায় করি ?

স্বামীর দিকে অসহায় দুই চোখ তুলে অনুপমা বলে, পারবে? আমার জন্যে দুঃখু হবে না? সবাই আমায় মাতালের বউ বলবে, আমার দিকে আঙুল তুলে দেখাবে, হয়ত শেষ পর্যন্ত—

এই তোমায় ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম বউ, বাইরে কোনদিন ওসব খাব না। কে জানে বাবা, বিশ্বাস নেই! বরং একটা বোতল কিনে আনব, কেমন? তোমার জিম্মায় থাকবে, যেদিন ইচ্ছে হবে তোমায় বলব, নিজ হাতে তুমি যেটুকু দয়া করে দেবে চরণামৃত মনে করে তাই—

মুখে কিছু আটকায় না!

যে কথা সেই কাজ। পরের দিনই সুধাময় পেট-মোটা একটা বোতল নিয়ে আসে।

দেখে চমক লাগলেও হাসিমুখে অনুপমা (মার উপদেশগুলি মনে পড়ে যায় বলে।) সেটা আলমারিতে তুলে রাখে।

রাতে আলমারির দিকে তাকিয়ে সুধাময় মুচকি মুচকি হাসা মাত্র আলমারি খুলে ওষুধের গেলাসে ঢেলে দেয় খানিকটা।

সত্যিকারের চরণামৃতের মত নির্জলা সেটুকু এক ঢোঁকে সুধাময় শেষ করে।

দেখলে মরদকা বাৎ ?

বার বার শোনায়, যেটুকু হাতে ধরে দিলে—ব্যস। আর চাইলাম ?

পরের দিন আরেকটু বেশি দেয় অনুপমা, নিছক দয়াপরবশ হয়ে।

তারপরের দিন আরও-একটু বেশি, সুধাময়ের নাছোড়বান্দা দয়া ভিক্ষেয়।

ক্রমে যেন মনে রঙ ধরে সুধাময়ের।

একদিন বলে, আজ একটা গান শোনাবে, অনু! অনেকদিন তোমার গান শুনিনি গো।

গান ? রাত দুপুরে!

তবে থাক। তুমিই একদিন বলেছিলে কিনা—

অমনি রাগ হয়ে গেল! লক্ষ্মীটি, আজ না। শরীরটাও আজ আমার বড্ড—

শরীর খারাপ ? কী সর্বনাশ। ডাক্তার সেনকে ডাকব ?

খোকামি করো না! চুপচাপ এখন শুয়ে থাক দেখি।

না না, তুমি জানো না বউ, এই সময় শরীর খারাপ হওয়া মানে—

কী আমার জাননেওলারে! নিজে যেন কত—

পরের দিন সারাটা দুপুর গুনগুন করে কাটায় অনুপমা।

(ব্যাটাছেলেকে শুধু শাসন করতে নেই, মাঝে মাঝে দড়ি আলগাও দিতে হয়, বুঝলি মা। বিশেষ করে বাপ-ঠাকুর্দা যাদের শুধু মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে ফূর্তি করে কাটিয়েছে।)

হোক শুনতে খারাপ, কথাগুলি মা মিছে বলেনি।

(বউ শাসন করছে টের পেলেই ওরা বেঁকে বসে। কিন্তু দড়ি একটু আলগা দিয়ে হেঁচকা মার, পায়ে এসে লুটিয়ে পড়বে। লুটোপুটি খাবে, বুঝলি মা।)

ভুলে-যাওয়া গানের কলি ভাবতে গিয়ে মার কথাগুলি মনে পড়ে যায়।

মুখখানিও।

আহা! বড় দুঃখী মাটা তার। অন্নকে আর সবাই যা ভাবে ভাবুক, মেয়ে হয়ে সে তো জানে মনে তার কত ব্যথা!

আর, কী-যে একটা খাপছাড়া সাধ!

কে জানে মাটা এখন তার কেমন আছে। বেঁচেই আছে কিনা! কতদিন দ্যাখেনি মাকে। নিজের মা, অথচ চোখের দেখাও মানা।

তাকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে চোখের জলে মুখখানি তার ভাসিয়ে দিতে দিতে নিজেই অন্ন পইপই করে মানা করে দিয়েছে—মনে করিস মা, তোর বেবুশ্যে মাটা মরে গেছে। ফৌত হয়ে গেছে। মনে করিস মা, কেউ নেই তোর—সোয়ামী সন্‌সার ছাড়া এই দুনিয়ায় কেউ নেই তোর!

মার জন্যে মনটা চৌচির হতে চাইলেও মার উপদেশ মনে করেই মনের পিঠে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে মনকে অনুপমা প্রবোধ দেয়।

মার কথা মনে করেই বেমক্কা আজ সুধাময়কে ভীষণ অবাক করে দেবার ফন্দি আঁটে মনে মনে।

সন্ধ্যেবেলা গা ধুয়ে এসে ঘরে ঢুকে সত্যিই ভীষণ অবাক হয়ে যায় সুধাময়: টেবিলের ওপর প্লেটে প্লেটে চপ, কাটলেট, চানাচুর। বোতল, গেলাস। খাটে হারমোনিয়াম, পাশে অনুপমা।

কী ব্যাপার?

গান শোনাব বলেছিলুম। সলজ্জ হাসে অনুপমা।

আচ্ছা! তা দোকানের খাবার কেন গো?

বামুনদিদি পাঁচদিনের ছুটি নিয়েছে—মেয়ের অসুখ। নেত্যলালও যেন কার সাথে দেখা করতে গেল—আজ ফিরবে না।

বুঝেছি। বাড়ি ফাঁকা না হলে বউয়ের আমার গলা ফুটবে না।

গলা ঠিকই ফুটত। কিন্তু বাড়ি ফাঁকা না হলে ওগুলো মশায় পেতেন কী? ঠকা হল কি মশায়ের এতে?

ঠকা! মুচকি মুচকি হাসে সুধাময়।

সোডা আনাতে পারিনি কিন্তু। নেত্যকে বলতে লজ্জা করল।

জলেই কাজ চালিয়ে নেব।

এই শেষ কিন্তু। আর কোনদিন কিন্তু—

অত কিন্তু-কিন্তু করছ কেন? এই কি আমি চেয়েছিলুম, বউ? যদি বলো এক্ষুণি—

তুমি নিজে থেকে চাওনি। তবু—কতদিনের অভ্যেস—এক-আধ দিন সাধ কি হয় না?

বিশ্বাস করো, বউ, সত্যি আমার আর—

হয়েছে। আর সাধু সাজতে হবে না! কপট ধমক দেয় অনুপমা। সুধাময় বললেই যেন সে বিশ্বাস করবে যে মদ সম্পর্কে কোন দুর্বলতা আর নেই তার? তবু যদি না টেবিলের দিকে তাকিয়েই চোখ দুটি অমন চকচক করে উঠত! ফিরে-পাওয়া হারানো ছেলের মত বোতলের গায়ে হাত বুলোনো শুরু করে দিত!

প্রথমে কীর্তন গাইবে ঠিক করে রাখলেও ঠুংরীই একটা ধরে অনুপমা।

ভালো লাগে গাইতে। শুধু প্রয়োজনে গান গাওয়া নয়, গান গাইতে বড় ভালোবাসত মণিকা।

প্রথম দিন তার গান শুনেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তার দিকে চেয়ে ছিল সুধাময়। অপূর্ব! বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছিল। কী যেন একটা ইংরেজী কবিতায় লাইনও আউড়েছিল।

যাবার সময় বলেছিল, আশ্চর্য তোমার গলা। সত্যিকারের শিল্পীর গলা! ট্রেনিং পেলে তুমি দেশ জয় করতে পারতে। তুমি অন্তত বাইজী হলে না কেন? এ গলা কি রাখতে পারবে। অনাচারে অত্যাচারে—

তার মালিক তো আপনারা! দরদে গা জলে গিয়েছিল মণিকার: মুখে তার

গানের প্রশংসা অমন অনেকেই করে। প্রশংসা করতে করতে নাক ডাকানোও শুরু করে দেয় অনেকে। কিন্তু পাওনা মিটিয়ে নেয় কড়ায় গণ্ডায়। সেদিকে পুরো হুঁশিয়ার।

কিন্তু গান শুনেই সুধাময়কে আচ্ছন্নের মত বেরিয়ে যেতে দেখে আপসোস হয় মণিকার : আহা, ও কথাটা একে না শোনালে হত!

গানের নেশাও নেশা। একবার এই নেশায় পেয়ে বসলে থামা যায় না সহজে।

বড় জবর নেশা গানের নেশা। একবার জেঁকে ধরলে চুমুকের পর চুমুকের মত বেপরোয়া হয়ে একটার পর গান একটা গেয়ে যেতেই হয়।

গাইতে গাইতে কেমন রোখ চেপে যায়। সাধ জাগে : গলা চিরে গিয়ে রক্ত বেরোক, পেটটা হর্দম পাক দিয়ে উঠুক—ক্ষতি নেই, তবু যেন, হে মা কালী, তবু যেন সুধাময়ের সাধ না মেটা পর্যন্ত, গান অনুপমাকে থামাতে না হয়।

গান থাক। এবার একটা নাচ হোক।

আচমকা সবগুলো রীড এক সাথে পিষে ধরে চমকে তাকায় অনুপমা। ভয়ার্ত চমকটাই যেন তার হারমোনিয়ামের আর্তনাদ হয়ে ফেটে পড়ে।

নাচ গো, নাচ—বুঝলে?

বোতলটা কাত হয়ে রয়েছে!

দুই চোখ দপদপ করছে!

চুলগুলি যেন খাড়া হয়ে উঠেছে!

মাথা দোলাতে দোলাতে টেনে টেনে সুধাময় বলে, নাচ? ডান্স? বুঝলে না, ডান্সিং—?

চিৎকার করে উঠতে গিয়ে দমবন্ধ গলায় অনুপমা বলে, তুমি!

ইয়েস আমি। আমি ফরমাস করছি—নাচিং! ডান্সিং! তবু বুঝলে না? তোমার ডান্সিং তো একদিন দেখেছি ডার্লিং—সুধাময় উঠে দাঁড়ায়। টলতে টলতে।

তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে আসে অনুপমা।

সঙ্গে সঙ্গে সুধাময় দরজা আগলায়। উঁহু বাবা, নাচিং না দেখিয়ে কাটিং? সেটি হবে না।

অনুপমা দিশেহারা। কী করতে পারে সে এখন—শুধু চিৎকার ছাড়া? প্রাণপণে চিৎকার করে লোক ডাকবে? না, খালি বোতলেরই বাড়ি একটা বসিয়ে দেবে ওর মাথায়? নাকি, কেঁদে-কেটে আছড়ে পড়বে পায়ের তলায়? মাথা কুটবে পায়ের ওপর? মাথা কুটে রক্ত বার করে ফেলবে?

তার রক্ত দেখে যদি হুঁশ হয়। যদি সংবিৎ ফেরে।

মাথা কুটবার জন্যে পায়ে গিয়েই অনুপমা লুটিয়ে পড়ছিল, সুধাময়ের কথা যেন তার মুখের ওপর সপাং করে চাবুকের এক বাড়ি কষাল: একবার নাচবে না মুক্তোমালা!

একসাথে চমকে ওঠে কুন্দরা।

মুক্তোমালা?

মণিকা নয়?

মণি নয়?

মালা!

হ্যাঁরে হ্যাঁ, মালা—তোদের এই মালা। মুক্তোমালা!

অনুপমা চিৎকার করে ওঠে, ওগো, কাকে কী বলছ! আমি—

আমি জানি গো জানি জানি। সুর করে সুধাময় গেয়ে ওঠে, তোমারে তো আমি চিনি হে!

আমি অনুপমা! অনু! তোমার বউ—

বটে! মুচকি মুচকি হাসিতে আজ ভয়ঙ্কর দেখায় সুধাময়কে। তা মাঝে মাঝে বউ হওয়া মন্দ নয়। কিন্তু এখন তুমি—

সপাং সপাং চাবুকের বাড়ি—মুক্তোমালা! মুক্তোমালা!

এগিয়ে এসে থাবার মত দুই কাঁধ অনুপমার আঁকড়ে ধরে সুধাময়, নাচ তোমাকে আজ দেখাতেই হবে, মুক্তোমালা!

মালা চুপ করে। চুপ করে থাকে।

তারপর?

তারপর? নাচলুম!

ওই অবস্থায়!

ও নামে ডেকে বললে না নেচে কি পারা যায়রে!

আর, শুধু কি নাচ! শুধুই শাড়ি-পরা নাচ? কত রঙে কত ঢঙেই যে নাচতে হয় পুরুষের হঠাৎ-জাগা শখ মেটাতে!

কুন্দ বলে, কী বলছিস লা!

শখ! পটল বলে, ব্যাটাছেলের কত শখই যে হয় কুন্দদি তুই তার কী জানিস!

শখ! পরী ফেটে পড়ে, একই সাথে বউকে বউ, বেশ্যাকে বেশ্যা—সস্তায়—হারামজাদা বদমাস!

হাত-পা নেড়ে লাগসই একটা ছড়া কেটে উঠছিল লিলি, বাধা দিয়ে মালা বলে, মানুষটা কিন্তু সত্যিই বদমাস নয়রে। মনটা সত্যিই ভালো ছিল। ভালো আমায় সত্যিই বাসত। দিনমানে ভালোই থাকত। ঠিক স্বামীর মতই ব্যবহার করত। কিন্তু—একেক দিন সন্ধ্যের পর—দু ঢোঁক খেলেই—

তুই-ই বা কেন বেঁকে দাঁড়ালিনি?

বউয়ের মান-অভিমান মানায়, কুন্দদি। কিন্তু মুক্তোমালা বলে যখন ডাক দেয়—

শিউরে ওঠে মালা।

এখেনে সব জমেছ? আর আমি ব্যাটা উদিকে—এক গাল হেসে বংশী দরজায় দাঁড়ায়।

চেয়েও দেখে না কেউ।

বংশী বলে, কী, সবাই বুম মেরে কেন গা?

পটল ফোঁস করে ওঠে, ভাগ!

ভাগছি। কিন্তুক বেলা যে পড়ে এল গো দিদিমণিরা।

আ মলো যা! চ্যাঙের মুখে ব্যাঙের কথা? লিলি ধমকে ওঠে, তাতে তোর কী রে মুখপোড়া?

আমার? আমার চোদ্দপুরুষেরও কিছু না। তবে কিনা শনিবারের বাজার—।

ধমক দিতে গিয়ে কুন্দ সামলে নেয়ঃ শনিবারের বাজার? আর সে কিনা এখনও হাত গুটিয়ে বসে আছে? বেহুঁশ হয়ে আছে?

বেহুঁশ হয়ে শুধু কুন্দ নয়, সকলেই আছে।

মালার গল্প শেষ হয়ে গেলেও গুম মেরে বসে ছিল সবাই।

দুপুরে না ঘুমিয়েও হাই তোলা মুলতুবি রেখে চুলগুলি বুকে টেনে এনে নখ দিয়ে চিরতে গিয়ে চুলের গোছা মুঠো করে ছিল পটল। আঁচল লুটিয়ে পড়লেও, ব্লাউজে একটা মাত্র সেপটিপিন থাকলেও—টানাটানা চোখ দুটি পরীর ক্ষুদে ক্ষুদে হয়ে গিয়ে পলকহীন চেয়ে ছিল বুকের লালচে চাকা চাকা দাগ দুটির মাঝখানে পাহারাদার মাদুলিটার দিকে। ঢিমে তালে আপন মনে মাথা নাড়ছিল লিলি, মনে মনে বুঝি কারো সাথে দেনাপাওনার হিসেব কষছিল। পেছন ফিরে শুয়ে থেকেও মালার মুখটা যেন স্পষ্ট সাবিত্রী দেখতে পাচ্ছিলঃ চোখে চোখে চেয়ে আছে মালা, চোখ বুজেও রেহাই নেই, সাথে সাথে মনের চোখে ভেসে ওঠে কাজলকালো মালার চোখের বিচিত্র চাউনি।

শুধু মালার চাউনি নয়, সেই সাথে এলোমেলো নানা জ্যান্ত ছবির মিছিল। যে-ছবিগুলি ঠিকমত জোড়া দিলে মালার কাহিনীর আস্ত একটা সিনেমা হয়ে যায়।

আর মালা খালি তাকাচ্ছিল এর-ওর মুখের দিকে। তাকাচ্ছিল আর ছটফট করছিল। আর ভাবছিল—গল্প তো তার শেষ হয়নি। আসল কথাই যে বলা হয়নি। শেষ হয়েও তাই শেষ হয়নি। কিন্তু সবাই এমন গুম মেরে থাকলে নিজে থেকে সে কী করে ফের কথা শুরু করে?

গল্পটা সে সাবিত্রীর জন্যে বলতে শুরু করলেও মালার এখন মনে হয়—গল্পের শেষটুকু না জানাতে পারলে বুকটা তার গুঁড়িয়ে যাবে।

মালার চোখে চোখ পড়তেই তাড়াতাড়ি কুন্দ উঠে পড়ে: শনিবারের বাজার!

কুন্দর সাথে সাথে উঠে দাঁড়ায় পটল, লিলি, পরী: শনিবারের বাজার!

বংশী জানতে চায়, সিরেফ চা তো? সব্বার?

সাবিত্রী বলে, তিন টাকার কচুরি আনিস, বংশী।

কচুরি? তিন টাকার?

লাগবে না? এতগুলো মুখ? তুইও তো বখরা চাইবি।

অমায়িক হাসে বংশী।

চা-র দামও আমি দেব।

কুন্দ বলে, তুই কেন মিছিমিছি—

মিছিমিছি কি কুন্দদি! গরিবের ঘরে সকলের আজ পায়ের ধুলো পড়ল।—আর শোন্, সিগারেট আনিস এক প্যাকেট। চার মিনার, নারে লিলি? পান এক ডজন, মিঠে পান তো রে পরী? জর্দা আলাদা। সব আমার নামে লিখিয়ে আসিস।

বহুতাচ্ছা।

এক আধলা যে বাড়তি খরচ করে না, কার্তিক পুজোয় চার আনার বেশি যার কাছ থেকে আদায় করা যায় নি—সে কিনা দুম করে কয়েকটা টাকা খসিয়ে বসল?—কুন্দর ইচ্ছে করে, ধপ করে ফের বসে পড়ে।

কিন্তু উপায় নেই ইচ্ছেটাকে মেনে নেবার। ছোট-জামায় ফুল তোলা হল না, খোঁপায় প্ল্যাস্টিকের মালাটা জড়ালেও চক্রবর্তী খানিক উসকে উঠবে। এগারো নম্বরের ছুঁড়ীটা চুলে গোলাপ গুঁজে কবে কার সাথে একদিন ট্যাক্সিতে উঠেছিল—ওই এক কথা দিনের পর দিন শুনিয়েও আশ মেটে না ঘাটের মড়ার!

কুন্দ বলে, চলিরে।

তার পেছনে যায় পটল, লিলি, পরী। কিছু না বলেই।

যেতে কারো পা সরছে না। না গিয়ে তবু উপায় নেই। আপিসের টাইম হয়ে গেল যেন।

কাকচান করে নাকেমুখে গিলে উর্ধ্বশ্বাসে না ছুটতে হোক, আধঘণ্টার মধ্যে নিজের নিজের শরীরটাকে, সেই সাথে ঘরদোরও, গোছগাছ করে নিতে ওরাও এখন পথ দেখবে না নাকেমুখে।

অসহায়ের মত ওদের চলার দিকে চেয়ে থাকে মালা : চলে গেল ? শেষটুকু না শুনেই চলে গেল ? ওদের গরজ না থাকে সে-ই ডাক দিয়ে শুনিয়ে দেবে নাকি ? নাকি এখান থেকেই চিৎকার করে বলবে, ওরে, তোরা শোন্, শুনে যা—আমি চলে এলেও—

এ গল্প আমায় শোনাবার মানে ?

মানে ? সাবিত্রীর গলার আওয়াজে থতমত খায় মালা।

হ্যাঁ, মানে। সবাইকে সাক্ষী রেখে আমায় এ-গল্প শোনানোর মতলব আমি টের পাইনি ভেবেছিস ?

বিশ্বাস কর ভাই, কোন বদ মতলব নিয়ে—

বদ হবে কেন। তোমার মনস্কামনা এ্যাদ্দিনে মিটেছে।

সাবি !

তোমায় চিনতে—

তুই আমায় ভুল বুঝবি, সাবি !

থাক !

ভুল সাবিত্রী করেনি, সুবর্ণ করেছিল।

মানুষটা যদিও একই।

বড় ভয়ানক ভুল করেছিল সুবর্ণ: কেন সে ভুলতে পারেনি যে অবু মাস্টারের মেয়ে সে? মেয়েমানুষ হয়েও স্বামীর ওপর শোধ নেওয়ার কেন অমন জিদ চেপে গিয়েছিল তার?

জন্তুজানোয়ারের জীবনকে ঘৃণা করে সুবর্ণ হয়েছিল সাবিত্রী।

শুধুই কি জন্তুজানোয়ারের জীবনকে ঘৃণা? তারও পিছনে কি স্বামী বলে পরিচিত একটা চৌকোস ভদ্রলোকের মুখে থুতু দেওয়ার প্রচণ্ড বাসনা তাকে পেয়ে বসেনি? সেই বাসনাই কি জন্তুজানোয়ারের জীবনকে ঘৃণা করার অজুহাতে ঘরের বার তাকে করে আনে নি? সাত ঘাটের জল খাইয়ে এখানে এনে ওঠায়নি?

এর চেয়ে সময় থাকতে ননীকে কোন কারখানায় ঢুকিয়ে দিলে, ফনীকে রেস্তোরাঁয় কাপ-ডিস ধোয়ায় লাগিয়ে দিলে, সুরমা ও টুলুকে ঠোঙা তৈরির কাজ ধরিয়ে দিলে, সুষমার হাতে সুচ-সুতো গুঁজে দিলে—কী এসে যেত?

হয়ত ননী একদিন বখে গিয়ে প্রভাতের মত বাড়ির সাথে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিত, বি এন-আর বাঁধে ওয়াগন ভাঙতে গিয়ে বলাইয়ের মত ধরা পড়ে ফনী জেলে চ'লে যেত, দোকানে সেলাইয়ের কাজ আনতে গিয়ে রেবার মত সুষমা একদিন বেপাত্ত হয়ে যেত, বিভার মত সুরমাও শেষে শাড়িতে আগুন লাগিয়ে লজ্জা ঢাকত, বিয়ে না করেও বউ হয়ে গিয়ে অঞ্জলির মত এক বিড়িওলাকে নিয়ে টুলু সংসার পেতে বসত।

কী এসে যেত তাতে? ওই প্রভাত, বলাই আর রেবা, ওই বিভা আর অঞ্জলি ওরাও তো রিফুজি ছেলেমেয়েই? ওদের বাবা শশীকান্ত রায়ও তো একদিন অবু মাস্টারের মতই ভদ্র-গৃহস্থ ছিল?

তখন সাবিত্রী না হয় রাঁধুনির কাজ নিত, শিবরাণীর মত। রোজ মরা স্বামীর ফটো পুজো করে জ্যান্ত বাপ-মার সেবা করে যেত। বাপ মায়ের ওপর তার ভক্তির বহর দেখে ধন্য ধন্য করত সবাই। তারপর বার পাঁচেক বাহে-বমি করেই একদিন চোখ বুজলে তার মড়াটাকে নিয়েও রেষারেষি করে কান্না শুরু করে দিতে তারও বাপ-মা। সে-ও অবিকল শিবরাণীর মড়া নিয়ে সস্ত্রীক শশীকান্ত রায়ের মত।

তারপর অবিনাশ, বড় বেশি ভেঙে পড়ার টিউশনিতেও মন বসত না যে-অবিনাশের, বড়বাজারে গিয়ে খাতা লেখার কাজ জুটিয়ে নিত। শিবরাণীর বাবার মত।

মানিয়ে নেওয়ার যা আশ্চর্য ক্ষমতা তার!

মিথ্যে হলেও চুরির দায়ে শশীকান্ত জেলে চলে গেলে এর-তার বাড়ী বাসন মাজার কাজ নিয়েছিল হেমলতা? অবিনাশের ঠ্যাং কাটা পড়লে সুভাষিণীও না হয় হেমলতার পথ বেছে নিত।

মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা তারও তো কম আশ্চর্য না?

মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা যে-কী ভীষণ রিফুজীদের!

কিন্তু আজ আর ওকথা ভেবে কী ফল।

ভুল কি সুবর্ণ শুধু সাবিত্রী হয়ে করেছে? সাবিত্রী হওয়ার পরেও সুবর্ণ হওয়ার সাধ পুষে রেখে ভুলের মাত্রাটা বাড়িয়ে দেয়নি? দুয়ে দুয়ে চারের মত মালার অতি সত্যি হুঁশিয়ারিটাকেও কেন পাত্তা দেয়নি সময় মত? কেন দূরে দূরে রেখেছে কুন্দদের—অতি আপন জন যে কুন্দরা?

কুন্দদের ঠাট্টাবিদ্রূপ আজ সহানুভূতিতে বদলে গেছে।

কেন ঠাট্টা করত কুন্দরা? ঈর্ষার জ্বালায়।

কেন ঈর্ষা?

কেন ঈর্ষা!

নিজেদের নিয়ে কি ওরা একজনও খুশী? হৈহল্লা-বেলাল্লাপনা যাই করুক—এও সেই প্রয়োজনে। নইলে মেয়েমানুষ হলেও মানুষের শরীর তো।

পুরুষের গলা জড়িয়ে কোমর দুলিয়ে যত ঢঙই করুক, ভেতরে ভেতরে কী অকথ্য ঘৃণা সকলের গোটা পুরুষ জাতটার ওপর!

পুরুষের প্রেমের জন্যে স্বামী ছেড়ে এসে পুরুষকে প্রেম বেচে আজ খেতে হচ্ছে পরীকে। কোন পুরুষে ভুল করেছিল ঠিক নেই, আজও তার জের টানতে হচ্ছে কুন্দ, পটল, লিলিকে। ওদের মেয়ে থাকলে তাদেরও হত। এই নাকি ভগবানের বিধান। পুরুষের ভেকধারী যে-ভগবান ওদের ভাত-কাপড়ের যোগানদার।

ওই কুন্দ। সুভাষিণীর প্রায় সমবয়েসী। কিন্তু রাতের পর রাত ওকে সেজেগুজে প্রতীক্ষা করতে হয়। যে-ই আসুক, দু হাত তার দিকে বাড়াতে হয়। ভাব দেখাতে হয় জন্ম-জন্ম চেনা বলে। তারই প্রতীক্ষায় পথের পানে চেয়ে ছিল বলে।

কয়েক মিনিটের আলাপীকেও নাগর বলে সোহাগ জানাতে হয়—বয়েসে সে ছেলের বয়েসী হলেও।

এ ঘরে একবারটি আসবি ভাই। নাগর তোর সাথে আলাপ করতে চায়। যাবার সময় পেছন থেকে তোকে দেখেই নাকি—নিজের ঘর থেকেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল কুন্দ।

তাহলে তোমার ঘরে গেল কেন, সাথে সাথে সাবিত্রী জবাব দিয়েছিল, আমি আগে থাকতে?

আমিও তাই বললুম। ঢুকে ইস্তক তোর কথা—কী নাম কী বৃত্তান্ত? বয়েস কত, দেখতে কেমন? বলতে বলতে কুন্দ সাবিত্রীর ঘরে এসে ঢোকে। আয় ভাই একবারটি।

সাবিত্রী হেসে বলে, এর পরেও আলাপ করিয়ে দিচ্ছিস কুন্দদি? সাহস হচ্ছে?

কুন্দ অত হাবা না। সে আগেই তার পাওনা হাতিয়ে নিয়েছে।

তাহলে এখানেই পাঠিয়ে দে না।

সে তো বেশ কথা। ছেলেছোকরার বায়নাক্কা সামলানো চাট্টিখানি ব্যাপার! হ্যাঁ—পরে আমার থেকে ভাগ চাইতে পারবিনি কিন্তু।

তুমিও এ নিয়ে আমায় দুষতে পাবে না কিন্তু।

হু-স! কুন্দ বেরিয়ে যায়।

তাড়াতাড়ি শাড়ি অগোছাল করে বসে সাবিত্রী। খোঁপা খুলে বিনুনীটা বুকে লুটিয়ে দেয়। মুখে হাসি এনে হাসি-হাসি মুখটা জিইয়ে রাখে: দেখা যাক, কুন্দ তার পাওনা আদায় করে নিলেও সে ফের নতুন করে কিছু আদায় করতে পারে কিনা। টাকার ভয়ানক টানাটানি। কটা দিন বড় খারাপ যাচ্ছে। সামনে ফনীর পরীক্ষার ফি। এক মাস ওর জন্যে একটু দুধের ব্যবস্থা করা দরকার।

বাইরে থেকে কুন্দ বলে, যাও না গো—যাও। অ ভাই সাবি, তুই একবার ডাক দে—নাগর আমার নজ্জাবতী নতাটি!

ডাকাডাকি করতে পারব না বাপু। দরজা খুলে রেখেছি—আবার কী! কারো যদি মন না চায়—

কথা শেষ করতে পারে না সাবিত্রী, কুন্দর নাগর ততক্ষণে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

সাবিত্রী স্তব্ধ হয়ে যায়।

পেছন থেকে দেখেই আমি চিনেছিলুম। কিন্তু সাবিত্রী শুনে কেমন খটকা লাগল। পরে অবিশ্যি গলার আওয়াজে—

বেরিয়ে যাও! ঘর-ফাটানো গর্জনে ফেটে পড়তে চায় সাবিত্রী, গলা দিয়ে তার ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ বেরোয় মাত্র।

যাক, দেখা হয়ে ভালোই হল। এভাবে সরাসরি আলাপ না রাখলে পরে কলঙ্ক রটাবার সুযোগ পেতেন। মানে, লোকে তাই করে কিনা। রজনীকাকা এইভাবেই বাবার কাছে আমার নামে সাতকাহন করে লাগিয়েছিলেন কিনা। অথচ সেদিন যদি তাঁরও সাথে সেখানেই এম্নি আলাপ করে রাখতাম—। গড় গড় করে কথা বলে যায় দুলাল। দেশলাইয়ে সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে।

দেখতে দেখতে মুখটা দুলালের ফনীর মুখ হয়ে যায়। সুবর্ণর ধাঁধা লাগে : এই সেই দুলাল? দুলালই তো?

বাপের এক ছেলে। তায় জমিদারের ছেলে। বেশি বয়েসে ইস্কুলে ভর্তি হয়েও বছর বছর ফেল শুরু করায় ছেলেকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিল নিকুঞ্জ চৌধুরী। মামার বাড়ি থেকে পড়াশোনা করত। ছুটিতে দেশে যেত। বিজয়ার পর অবিনাশকে একবার প্রণাম করতে এসে সুভাষিণী আর অবনীর সঙ্গে তাকেও একটা প্রণাম করে বসেছিল। সোনাদি বলে ডেকেছিল।

ও সোনাদি বললেও আশীর্বাদ করার সময় মনে মনে সুবর্ণ বলেছিল, বেঁচে থাক বাবা। শতায়ু হও।

অবিনাশ দুলালকে ওই বলে আশীর্বাদ করেছিল বলে নয়, খানিক আগেই ফনীকে সুবর্ণ মনে মনে ওই বলে আশীর্বাদ করেছিল বলে। তার জেরটা তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি বলে।

ফনীর মত ওরও থুতনীতে হাত দিয়ে চুমো খেয়েছিল। নাড়ু খেতে না চাইলে বাঁ হাতে ওর মাথাটা কাছে টেনে এনে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছিল।

সেও ফনীর মতই।

বড় ভালো লেগেছিল সেদিন দুলালকে : কলকাতায় পড়াশোনা করলেও চালবাজ হয়ে ওঠে নি। বরং গাঁয়ে থাকতে বাবুর বাড়ির ছেলে বলে যে-দেমাকটা ছিল, সেটা আর নেই।

মামার বন্ধুর সাথে বিয়ের পর থেকে ডাকত সোনা-মামী বলে।

ননীর সাথে একই কলেজে একসাথে পড়ে এখন। প্রায়ই তাদের বাড়িতে আসে। বড়লোকের ছেলে হলেও চমৎকার মিশে গেছে রিফুজির সংসারে।

সেই দুলাল—

গেলে তুমি! বেরোলে ঘর থেকে! গেলে!

আঃ! অমন চিৎকার করবেন না।

চিৎকার করব না! হারাম-জাদা! জুতো মেরে তোর—

খবর্দার! মুখ সামলে—

সদ্য-ধরানো সিগারেটটা মেঝেয় ফেলে জুতো দিয়ে রগড়াতে রগড়াতে তুলাল বলে, বেশি সতীপনা ফলিও না, বুঝলে। এর পরেও—

ভালো চাস তো এখনও বেরো বলছি, শুয়ার! ভালো চাস তো—

খামচি মেরে পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে তুলাল বলে, কত? বলো কত রেট তোমার? আট আনা? এক টাকা? পাঁচ? দশ? পনেরো? কুড়ি? পঁচিশ?—কী সোনা, তারও বেশি? থার্টি?—

হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে অ্যাসট্রেটা নিয়ে ছুঁড়ে মারে স্বর্ণ।

চকিতে সরে যায় তুলাল। চটছ কেন গো? যা চাও তাই দেব বলো না রেট কত?

সাবিত্রী তখন ক্ষেপে গেছে। হাতের কাছে যা পাচ্ছে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। আরেকটা অ্যাসট্রে, ফুলদানি, তাকিয়া, সিগারেটের খালি টিন, চায়ের এঁটো গেলাস।

মালার ঘরে মালার নাচ আর পরীর গান বন্ধ হয়ে যায় হঠাৎ। ঝটপট সব দরজা খুলে যায় ঘরের। 'হল কি' 'হল কি' বলতে বলতে ছুটে আসে সবাই। আফিঙের ঝিমুনি মুলতুবি রেখে মানদাও। নিচে থেকে গুইরামও।

চোখ দিয়ে সাবিত্রীর আগুন ঠিকরোচ্ছে। বুকটা সাবিত্রীর হাপরের মত ওঠানামা করছে। কথার বদলে মুখ দিয়ে সাবিত্রীর গোঁ গোঁ একটা শব্দ বেরোচ্ছে।

কুন্দ বলে, তুমি তো আচ্ছা বেরসিক বাপু! বললে শুধু আলাপ-সালাপ করবে—

দেখনহাসি হেসে তুলাল বলে, আমি তো আলাপ করতেই চেয়েছিলুম, বিশ্বাস না হয় ওকেও সুধোও—ওই সাবিত্তিরিকে!

গুইরাম বলে, বেজায়গায় এসে পড়েছেন স্যার। খোদ পাড়ায় যান।

কী!

আজ্ঞে কিছু না। আসুন স্যার, রাস্তাটা দেখ্যে দি।

নাগর! ছেলের বয়েসী দুলালকেও অনায়াসে নাগর বলে সোহাগ জানিয়ে ছিল কুন্দ।

ছেলের বয়েসী বলে আপত্তি করেনি। বয়েসকালে ছেলে হলে তারও আজ ওর চেয়েও বড় একটি ছেলে থাকতে পারত—একথা কুন্দর ভুলেও একবার মনে পড়েনি। অতি অত্যাচারে দেহটার মত মনটাও এমনি অসাড় হয়ে গেছে। ভোঁতা হয়ে গেছে।

শুধু কুন্দর নয়, সকলেরই।

সকলের একমাত্র চিন্তা—পেটের চিন্তা। তাই ছেলেছোকরার আপত্তি কুন্দর: বেশি বায়নাক্কা করে রোজগারের সময়টা কমিয়ে দেয় বলে।

কিন্তু সাবিত্রী হওয়া সত্ত্বেও দুলালকে দেখেই তার কেন মনে পড়ে গিয়েছিল ফনীর কথা? তার পেটের ছেলের মত যে-ফনী।

কেন মনে হয়েছিল—ওই দুলাল একদিন ফনীর বয়েসী ছিল, ফনীও ক বছর বাদে দুলালের বয়েসী হবে?

তখন যদি ফনাকে বুকে নিতে গিয়ে এই দুলালের কথা মনে পড়ে যায়? মা ছেলেকে তো নেয় বুকে?

সেই আতঙ্কেই সে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। গালাগাল দিতে দিতে হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারা শুরু করেছিল।

আবার, দুলালকে বের করে দিয়ে এসে গুইরাম তাকে ধমকাতে শুরু করলে, এত বাড়াবাড়ি ভালো নয় বলে মানদা গজগজ শুরু করলে—জবাব না দিয়ে ঘাড় হেঁট করে ছিল।

মুখে বলেছিল বটে, 'বেশ করেছি!' আফসোস করেছিল মনে মনে: টাকার ভয়ানক টানাটানি! কটা দিন বড় খারাপ যাচ্ছে! সামনে ফনীর পরীক্ষার ফি! একমাসের জন্যে ওর একটু দুধের ব্যবস্থা করা দরকার!

একবার বেরিয়ে এসো। বাইরে থেকে গুইরাম ডাকে।

গা ঝাড়া দিয়ে সাবিত্রী ওঠে। হেলে দুলে বেরিয়ে আসে। বিনুনীর ডগা দিয়ে গালে সুড়সুড়ি দিতে দিতে, মুখে হাসি টেনে এনে চোখ দুটি ঢুলুঢুলু করে।

বাঁ হাত দরজার মাথায় দিয়ে কাত হয়ে দাঁড়ায়।

গা—গান জানো? চোখ দিয়ে আগাপাশতলা চাটতে চাটতে জিজ্ঞেস করে লোকটা।

ঠোঁট টিপে ফুড়ুৎ করে হাওয়া ছাড়ে সাবিত্রী।

গান জানো? নাচ জানো? কোন্ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছ? মহাত্মা গান্ধীর পুরো নাম কি?—আচ্ছা, গিয়ে খবর দেব।

বার বার ঘাড় নেড়ে না বলতে বলতে মরমে মরে গিয়েছিল স্বর্ণ।

মেয়ে-দেখার পাট চুকলে সে কী রাগ অবনীর: গেরস্থঘরের মেয়ে, বলে কিনা নাচগান জানো? তা পাত্র রান্নাবাড়ি-ছেলেমানুষ করতে জানে তো? গুল দিতে বাসন মাজতে সিদ্ধ কাচতে জানে তো? বড়ি দিতে ঢেঁকিতে পাড় দিতে কাঁথা সেলাই করতে জানে তো? নইলে বউ নাচগান নিয়ে থাকলে ওসব কে করবে? সম্বল তো গঞ্জে একটা মনিহারী দোকান।

গিয়া খবর দিমু! নাচগান জানে না বইলা এমুন বুইনডারে আমার পছন্দ হইল না! না হইল তো বড় বইয়া গেল! আমার বন্ধুর লগেই সোনার বিয়া দিমু—তুমি ভাইব না বাবা। এমুন বুইনডা আমার—

কী, জানো গান?

হেলাভরে ঠোঁট ওল্টায় সাবিত্রী। গান না জানা যেন মস্ত বাহাদুরি। ডান হাতটিও ডানদিকের দরজায় তুলে দেয়: নাইবা জানল গান!

ধাঁ করে লোকটা পেছন ফেরে।

আসুন স্যার—গান জানাও—

নাঃ!

দেখুন না স্যার। দেখতে ক্ষেতি কী।

ওই তো সব নমুনা দেখছি!

অন্য বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি স্যার।

যাক গে!

এসে ফিরে যাবেন স্যার!

আজ থাক। বলেই পকেট থেকে দলা-পাকানো একটা একটাকার নোট গুইরামের হাতে দিয়েই তড়বড় করে লোকটা সিঁড়ি ভাঙে।

দেখে যান স্যার—নাচগান জানা—যাকে বলে এক্কেবারে—।

লোকটা ততক্ষণে সদর রাস্তায়।

ইদিকে হাত পা ঠকঠক করছে, তোতলামি এসে গেছে—উদিকে—গুইরাম খিস্তি করে ওঠে।

আহা, নতুন মানুষ! তায় দিনকে দিন তোমার গোঁফজোড়া যা হচ্ছে! টোপ ফেলা মাত্তর তো সুড়সুড় করে পিছু নিয়েছিল।

বাঃ, সাহস না থাকলে শখ থাকতে নেই? গলায় কিন্তু সোনার হার ছিল গুইদা।

বলিস কি!

সোনার বোতাম ছিল। বুকপকেটটা ফুলে ছিল।

খেয়াল করিনি তো মাইরি। যাস্‌শালা! লিলির সাথে ভিইড়ে দিয়ে একটা পক্কড় খাওয়াতে পারলে—দেখি গেল কদ্দূর—

তাড়াতাড়ি নেমে যায় গুইরাম।

পেছন থেকে সাবিত্রী ডাকে, ও গুইদা—শুনে যাও—কথা আছে। জরুরী কথা।

আসছি।

এসো কিন্তু।

খাওয়াবি?

খাওয়াব।

তবে কচুপোড়া শুনেই যাই। গুইরাম ফের উঠে আসে। কী তোর জরুরী কথা বল। আগে দস্তুরি দেখা, নইলে কথা কিস্তুক কানে ঢুকবেনি।

ঘর থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট এনে দেয় সাবিত্রী। যেন তৈরি হয়েই ছিল।

পুরো?

পুরো। অনেকদিন তোমায় খাওয়াইনি গুইদা।

জিতা রহ। নোটটাকে চুমো খেয়ে সিটি দিয়ে পকেটে গোঁজে গুইরাম।

আমার একটা কথা রাখতে হবে গুইদা।

জান কবুল। ফরমাইয়ে।

ঠাট্টা নয়। শোন—একটু থেমে সাবিত্রী বলে, মালার মত আমার ঘরেও হুট করে কাউকে—

মালার মত? মতলব? ইসকা মানে?

আমি সব জানি গুইদা। মালা আমায় সব—

আচ্ছা! কিন্তুক ও না হয় সোয়ামীর ভয়ে—

আমার ছেলের ভয় গুইদা।

ছেলে?

হ্যাঁ গুইদা, ছেলে। আমার ছেলে! ফনী ছেলে নয় সাবিত্রীর? ছেলেটা আমার বখে গেছে গুইদা! মিলিটারিতে নাম লেখালে বখে যায় না মানুষ? নগেন জ্যাঠার অমন সোনার টুকরো ছেলে অশোকদা যায়নি বখে?

আব্দার! আমার ছেলেটা বখে গেছে!

বখবে না! বখা মায়ের ছেলে সন্নিসি হয়ে থাকবে! ইয়ার্কি!

বখে গিয়ে খুনে, ডাকাত, দাঙ্গাবাজ, গুণ্ডা, দালাল সব হবে। যা প্রাণ চায়।

কেন হবে না? আব্দার!

মাগুলো কী আব্দেরে!

সাবিত্রীর ওপর এমনই অকথ্য চটে যায় গুইরাম যে ঘুমনো বাতিল করে দিয়ে খাটিয়ায় উঠে বসে।

ঘণ্টা কয়েক দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকে: সাবিত্রীকে এখন হাতে পাওয়া অসম্ভব। অগত্যা সাবিত্রীর টাকায় কেনা বোতলটাই টেনে নেয় আক্রোশভরে। রাত এগারোটায় কিনে আনলেও এই ভোরবেলা পর্যন্ত ছিপি খোলেনি যে-বোতলের।

না ছেঁকেই বোতল মুখে তোলে। বোতলের মুখটাকে কামড়ের চোটে দু টুকরো করে ফেলতে ইচ্ছে করে তার।

জানালা দিয়ে উঁকি মারে ভবতারণ। বেশ, বাবা বেশ।

এ্যাও!

রাত না পোয়াতেই শুরু করেছ বাবা? বেশ বেশ! বড় খুশী হলাম বাপ।

এসো না তুমিও। একটুন চর্ণামেত্ত করে দাও—

আরে রাম রাম!

এ রাম নয়, দিশি। দোকানের নয়, আতরের ঘরের।

ছি ছি!

এসো বলছি! এ্যাও! আ যাও!

ওই ভ্যাখ! গুটি গুটি ভবতারণ এসে ঘরে ঢোকে। আমি যে এখন গঙ্গা নাইতে যাচ্ছি রে। দেরি হলে ওরা আবার টিকটিক—

কে টিকটিক? কৌন? নাম বাৎলাও—বামুন মানুষকে টিকটিক! এক-একঠোর গর্দান পাকড়কে—

আরে না না। তেমন টিকটিক কি আর করে—সোডা নেই বাবা?

সোডার কথা জিজ্ঞেস করেও ভবতারণ কিন্তু সোডার জন্যে বসে থাকে না।

গুইরামের কলাইকরা গেলাসটা কুড়িয়ে নিয়ে মদ দিয়ে সেটা ধুয়ে শুদ্ধ করে বোতল থেকে খানিকটা ঢেলে নেয়।

তারপর লম্বা চুমুক দিয়ে চুক করে একটা শব্দ করে, ব্যস, আর নয়।

ওতে যে গলাও ভিজবে না, ঠাকুর। লাও—আউর লাও—

কারণবারি ওই ভালো বাবা। নেমে এসেই মুখুজ্জের কাছে ছুটতে হবে, সেখান থেকে ফের—

ছেলেটা তোমার আজ তক টেঁসল না? বড্ড ভোগাচ্ছে তো!

মুখ থেকে গেলাস সরালে অভিশাপ দিতে হয়, ভবতারণ তাই গরম চায়ের মত মদে চুক চুক চুমুক মারে আপন মনে।

তোমার ছেলেমেয়ে যেন কটা ঠাকুর?

সে ভগবানের দয়ায় বাবা বলতে নেই—পাঁচটি।

সাবাস!

কিন্তু মেয়েই যে চারটি ধন—ওইখেনেই তো ভগবান মেরে রেখেছে।

একরোজ তোমার বাড়ি যাব, ঠাকুর।

যাবে বই কি বাবা, নিশ্চয় যাবে। এক চুমুকে গেলাস খালি করে তাড়াতাড়ি ভবতারণ উঠে দাঁড়ায়। গলা বুক পেট জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, বুক চেপে ফের বসে পড়ার জন্যে প্রাণ ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু কে জানে, ব্যাটা যদি এখনই বাড়ি যাবার বায়না ধরে বসে।

চললে?

হ্যাঁ বাবা। আটটার থেকে নটা মাগনা—তারপর মুখুজ্জে ব্যাটা আবার ভিজিট নেয়। গরিব ব্রাহ্মণ বাবা—

গুইরামেরও হঠাৎ মনে পড়ে যায়, সে-ও গরিব। গরিব যখন তারও টাকা-পয়সার অভাব। তাই না হোটেলের টাকাটা আজও দেওয়া হল না?

এবং এর জন্যে পুরো দায়ী জানকী: ধার বলে সাত টাকা নিয়েছে সেই কবে। শোধ দেওয়া দূরে থাক এমুখো হওয়াই আজকাল ছেড়ে দিয়েছে। বিয়ে করে যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছে শালা।

গুইরাম উঠে পড়ে।

টাকা সাতটা আদায় আজ করতেই হবে। দরকার হলে গলায় গামছা দিয়ে, বউয়ের সামনে বেইজ্জত করে। জানকী শালা ভেবেছে কি—দেড় বছর চুপচাপ আছে বলে ভুলে গেছে গুইরাম? রোজগার-করা টাকাগুলি তার তামাদি হয়ে গেছে?

জানকীর ভাগনে লেতো বলে, কী মামা?

তোর আসলি মামা হ্যায়? বোলাও। নেহি, হামিই যাতা হ্যায়। বলতে বলতে গুইরাম জানকীর ঘরের দিকে এগোয়।

হাঁ হাঁ করে ওঠে লেতো, ডেকো নি গুয়ে-মামা, ডেকো নি। এই মাত্তর শুয়েছে।

কাঁহে? রাতভর কাঁহা—

এই মাত্তর পেচ্ছাব করে গিয়ে ঘুমোল। বলল—

বলি রাতে কী করেছিল? কাল রাতে তোর মামা শালা—

সারা রাত জাইলে মামী যে ভোরবেলা ছেলে বিয়োল গো। সে কী তুলকালাম কাণ্ড!

বিয়ের-পরেও-সারা-রাত-বাইরে-ফুর্তি-মেরে-সকালবেলা-নাক-ডাকানো শালার-:বর-করছি ভেবে লাথির চোটে দরজা খুলতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় গুইরাম।

জানকীর ছেলে হয়েছে? তোর মামা জানকীর—

হ্যাঁগো। লাল টুসটুস্ ছেলে।

বিড় বিড় করতে করতে দাওয়া থেকে উঠোনে নামে গুইরাম: টাকা তো জানকীর বউ নেয়নি, জানকী নিয়েছে। বউয়ের শাড়ি কেনার জন্যেই নিয়েছে যদিও, তবু সে-টাকার জন্যে দায়ী জানকী: বিয়ে করেছ, বউকে খাওয়াতে-পরাতে হবে বই কি।

জানকীর জন্যে সারারাত কষ্ট করে ছেলে বিইয়ে এখন একটু চোখ বুজেছে ছুঁড়িটা, তাকে জ্বালাতন করার কী হক আছে গুইরামের? গলার যা হাঁক শালার? ঘুম ভেঙে 'কে র‍্যা' বলা মাত্র পাড়ার লোক আঁতকে উঠবে। কুকুর ডাকা শুরু হয়ে যাবে।

গেল টাকাগুলি! আবার ক বছরের ধাক্কা খোদা মালুম!

শালার সংসার পোষার সাধ্যি নেই—বিয়ের সাধ ষোল গণ্ডা। বিয়ে করে ভদ্দরলোক বনার সাধ। ও-পাড়া থেকে তেলেভাজার দোকান তাই তুলে আনা হল। শালা! অথচ ওখানে দোকানটা রাখলে এ্যাদ্দিনে—

লেতো বলে, ও গুয়েমামা, যাচ্ছ? তা মামাকে কিছু বলতে হবে?

খবদ্দার! কিছু বলেছিস কি খুন করে ফেলেঙ্গা।

অ্যাঁ!

না, বলিস—গুণ্ডা-মামা এয়েছেল, ও-পাড়ায় দেখলে মাথা ছাতু করে দেবে বলে গেছে। ছাতু বুঝিস তো—রঘুনাথ যা খায়? সেই ছাতু। ময়দার মত গুঁড়ো গুঁড়ো।

মোর মামার মাথা ছাতু করে দেবে?

জরুর। আগে ঠ্যাঙ ভেঙে পরে ছাতু করব। শ্রেফ পটল তুইলে ছাড়ব।

অ্যাঁ!

হাঁ।

মামা মোর কী করল গো, গুয়েমামা?

কী দরকার ছোঁড়াকে সে কথা বলে? জানকী যদি ভুলে যেতে চায়, দশ বছরের ভাগনে মনে করিয়ে দিলেও কি ফোর-টুয়েণ্টি শালার মনে পড়বে?

ও গুয়েমামা, কেন তুমি মোর মামার—

মেরে খুশি। তোর আসলি মামাকে বলিস ব্যাটা, গুয়েগুণ্ডার খুশি চাগিয়েছে আগে তার ঠ্যাঙ ভেঙে পরে মাথাটা ছাতু করার। ও-পাড়ায় যদি কখনো নাগালে পায়—

তেড়ে গুইরাম বেরিয়ে যায়।

ছোঁড়া বোধ হয় গন্ধ পেয়েছে। বোধ হয় ভাবল, নেশার ঝোঁকে হুমকি দিয়ে গেল গুয়েগুণ্ডা।

নেশা? এক বোতল টেনে গুয়ে-গুণ্ডার নেশা! তাও যদি না খানিকটা তার সাবড়ে যেত বিটলে বামুন!

ও-ছোঁড়া কী বুঝবে কথাটার মানে—আগে ঠ্যাঙ ভেঙে পরে মাথা ছাতু করার কথাটার? কাউকে পটল তোলাতে চাইলে ও ছাড়া পথ আছে? মাথায় আগে বাড়ি দিয়েছে কি, ঠ্যাঙ দুটো তার ফুটিফাটা মাথা নিয়েই দৌড় দেবে চোঁ-চাঁ, হঠাৎ-রক্তের-ঢলে তোমায় বেকসুর বেকুব বানিয়ে রেখে।

অথচ আগে ঠ্যাঙ ভেঙে পেড়ে ফেলে ধীরে-সুস্থে যতক্ষণ ধরে খুশি মাথার খুলিটা পিটিয়ে পিটিয়ে ছাতু বানাও—

কী সব্বনেশে ছেলেরে!

ভুল হয়ে গেছেরে মা, ভারি ভুল হয়ে গেছে আগে যদি মাথার বদলে ঠ্যাঙ দুটো-

ওরে ওলাওঠো!

নিদেন একটা ঠ্যাঙও যদি—

ওরে ডাকাত ড্যাকরা! দূর হ—শিগগীর তুই—

তুই তো জানিসনি মা কেন—

ওরে খুনে দাঙ্গাবাজ!

আগে সব শোন্—

শুনব! মানুষ খুন করে তুই এয়েছিস বরফট্টাই করতে! গুণ্ডো বদমাস যমের অরুচি! বেরো—বেরো—এক্ষুনি মোর বাড়ি—

ম্যা!

ম্যা! বলি ভালোয় ভালোয় যাবিরে মুখপোড়া, না নোক ডাকব? প্যাঁদাতে প্যাঁদাতে পাড়ার বার করে দেবে। মানুষ খুন করে তুই—ওরে, কপালে মোর এও ছেলরে!

বাইরে থেকে লোক ডাকতে হয় না, ঘরের লোকই বেরিয়ে আসে। এসে পাশ থেকে আচমকা এক দাঁড়ানো-লাথি পাছায় হাঁকায়।

মর! মর! মরে যা! তোর মত ছেলে থাকার চেয়ে না থাকা ভালো। খুনে ডাকাত হুড়্‌মবাজ!

তবে কি সে-ই অন্যায় করেছিল?

পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতে মনটা যত ভেঙে পড়ে, তত মনে হয়, দোষটা বোধ হয় তারই।

নইলে মাটকোঠার ভাড়াটে এক ঘুসকির ছেলে হয়ে কেন সে প্রণবের বন্ধু হতে গিয়েছিল—বয়েসে ছোট হলেও ভেতরে ভেতরে তার চেয়েও পেকে গেছে যে-প্রণব, যেচে তার সাথে ভাব করেছিল হাতে-কলমে কিছু পাকামি করবে বলে যে-প্রণব?

লেখা পড়ার-বদলে-ওয়েল্ডিং-জানা গুইরামের অতই যদি শখ ছিল ফার্স্ট ক্লাসে-পড়া প্রণবের সাথে মিশে ভদ্রলোক হবার, সেই শখের দাম হিসেবে শুনেও কেন হজম করে যায়নি প্রণবের কথাগুলি?

জানো দাদাবাবু, ওমাসে আমার বে।

তাই নাকি! কার সাথেরে?

তুমি কি চিনবে দাদাবাবু?

তবু শুনি।

একটা মেয়ের সাথে:

মন্দার সাথে যে না—তা বুঝেছি। কিন্তু মেয়েটা কে?

নাম বললে তো চিনবে না। আচ্ছা, পরশুদিন তুমি যখন শেতলাতলার

পেছনে সিগ্রেট টানছিলে, আমি রাস্তায় গাড দিচ্ছিলুম, তখন যেতে যেতে একটা মেয়ে আমার পানে চেয়ে ফিক করে—

কে জানে কে তোর পানে চেয়ে ফিক করে কি করেছিল! তা থাকে কোথায়? তোদের পাড়ায়? ইয়ে কেমন—অ্যাঁ? দেখ না—বিয়ের আগে যদি—

ধ্যে!…ও-পাড়ায় থাকে। কর্পোশন ইস্কুলে পড়ে। এ-পাড়া দে যায়।

ও-পাড়ায় মানে?

উই পাড়ায়।

তাই বল্। বাজারে। তাহলে আর অসুবিধে কি? দেখনা ট্রাই দিয়ে।

কী বলছ! খুউব ভালো মেয়ে দাদাবাবু। দেখতে পরীর পারা। ওর মাটা যাই হোক—

তোর মায়ের তো তবে পোয়াবারো রে। নিজে রোজগার করবে, ছেলের বউ করে এনে আরেকটাকে দিয়েও—

দাদাবাবু!

বেড়ে বুদ্ধি তোর মার। সেয়ানা মাগী। বয়েস বাড়ছে বলে সময় থাকতে থাকতেই—

কথাটা প্রণব শেষ করতে পারে না, তার আগেই থান ইটখানা মাথায় তার বসিয়ে দেয় গুইরাম।

'ওরে বাবারে!' বলে দুহাতে মাথা আঁকড়ে প্রাণপণ দৌড় লাগায় প্রণব, ইটখানা ফের কুড়িয়ে আনার অবসরে।

কিন্তু, কথাটা কি প্রণবের মিথ্যে?

অবশ্য গুইরামও পাল্টা বলতে পারত, দাদাবাবু, আমার মা পেটের দায়ে ও কাজ করে। ওর মা-ও তাই। কিন্তু দাদাবাবু, তোমার ছোড়দি কেন খাওয়াপরার ভাবনা না থাকলেও গণ্ডা গণ্ডা লোকের সাথে ঢলাঢলি চালায়? বড়লোকের মেয়ে হয়েও উপহার বলে এর-তার কাছ থেকে দামী দামী জিনিস বাগায়? শেষ পর্যন্ত বিয়ে তো হবে বড়দির মত দিল্লী কি পাটনার আনকোরা কোন ছেলের সাথে? দাদাবাবু, অমন মানীগুণী সোয়ামী থাকতেও তোমার মা

কেন একা একা ইয়াসীন ড্রাইভারের সাথে হাওয়া খেতে যায়—পেছনে বসে বাড়ি থেকে বেরোলেও চৌরাস্তায় গিয়ে লেড়েটার পাশে বসে? তোমার বৌদি কেন, দাদাবাবু, দুদিন বাদে বাদে বাপের বাড়ি ভাগে—তার মামাতো ভাইয়ের এ-বাড়ি আসা বারণ হয়ে যাওয়ার পর?

কিন্তু মাটকোঠার-ঘুসকির ব্যাটা হয়ে এ সব কথা কি বলা যায় কোঠাবাড়ির ভদ্রলোকের ছেলেকে?

সুতরাং, বোধ হয় নয়—দোষ গুইরামেরই।

গুইরামের যেমন দোষ, তার মারও তেমনি আব্দার।

গুইরামের উচিত ছিল, 'যা বলেছ গো দাদাবাবু' বলে হেসে গড়িয়ে পড়া। প্রণবের কথা শুনে।

আবার মায়েরও উচিত ছিল, 'বেশ করেছিস বাপ' বলে মিশি-কালো দাঁত বের করে ছেলেকে বুকে টেনে নেওয়া। গুইরামের কথা শুনে।

ঘুসকির ছেলে খুনে-ডাকাত ছাড়া কী হবে? নিতে কী হয়েছে? বিশুয়া, কেষ্ট, হারাধন কী হচ্ছে?

কোথায় মা ছেলের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে ভড়কে-যাওয়া মনটাকে তার সামলে দেবে, তা না—লাথি খাওয়াল ঘরের লোক দিয়ে? দূর করে দিল বাড়ি থেকে?

আব্দার! কী আব্দেরে মাগুলো!

সব শালা ফোর-টুয়েন্টি! তামাম দুনিয়া!

মুখ বেঁধে বস্তায় পুরে বেধড়ক ঠেঙিয়ে মরমর করে দুনিয়াটাকে কেউ ফেলে দিয়ে আসে ধাপার মাঠে!

চোখেমুখে জল দিয়ে এসেও জানালায় মালা দাঁড়িয়ে ছিল। বন্ধ জানালার ফুটোয় চোখ রেখে।

চিৎকার করে কাঁদছে ছেলেটা। দেখা যায় না, শুধু গলায় আওয়াজ শোনা যায়।

বারেক গলার আওয়াজ শোনা নিয়েই এত কাণ্ড! আর এখন বুকটা মালার ফেটে যেতে চায়। কাল সন্ধ্যার পরও ওইভাবে অনেকক্ষণ কেঁদেছে ছেলেটা। এ দিকের জানালা বন্ধ থাকায় ওদিকের জানালা খুলে কেঁদেছে। জানালায় গাল রেখে। অন্তত মালার তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু নড়ার তখন উপায় ছিল না। মুখটা তখন তার গজল গাইছিল, মনটা মাকে শাপশাপান্ত করছিল : মা তো নয়, রাক্ষুসী! অমন ননীর শরীরেও হাত ওঠে! বাছারে!

মনে মনে মালা সোহাগ করে করে কান্না থামায় ছেলেটার।

এ্যাও!

ঘুরে দাঁড়ায় মালা, তুমি!

বলি হচ্ছিলটা কী?

কী আবার হবে! জানালা খুলেছি? রীতরেওয়াজ তো ভাঙিনি বাপু।

রাতের বেলা বেপরোয়া তুই-তোকারি করলেও দিনের আলোয় কেমন বাধো বাধো ঠেকে। রাস্তায় আসতে আসতে কথাগুলো মনে মনে গুছিয়ে নিলেও এখন সব যায় তালগোল পাকিয়ে। ফলে গুইরাম চটে যায়। চটে যায় বলে আরও বেশি কথা খুঁজে পায় না।

রাত না পোয়াতেই—

একটুকুন।

একটুকুন!

একটুকুন নয় তো অনেকটুকুন! গিলা হ্যায় বেশ কিয়া হায়—কিসকা বাপকা কি?

বাপ! মালা হেসে বলে, বাপের ঠিক থাকলে তো বাপকা কি! কিন্তু সকালবেলা তুমি কি এখানে মাতলামো করতে এলে, গুইরামদা?

নেহি। কৈফিয়ত লেনে আয়া—আমায় ধাপ্পা দেওয়া হয়েছিল কেন, শুনি?

ধাপ্পা? তোমায়? আমার ঘাড়ে কি দুটো মাথা যে—

সাবির একটা ব্যাটা আছে, বখে যাবার বয়িসী ব্যাটা, অথচ—

ছেলে? সাবির?

হাঁ হাঁ।

বাজে কথা। সাবির ছেলে নেই, হবেও না। মুখুজ্জেবাবা সেদিন বলল শুনলে না?

তবে যে মাগী বলছিল—

কী বলছিল?

বলছিল, পাছে ওর ছেলে কখনো আরেকজনের সোয়ামীর মত—

মালা মুখ ফেরায়।

গুইরামও চুপ করে যায়: না, বলে কোন লাভ নেই। সোয়ামীটার কথা আজও হারামজাদী ভুলতে পারেনি। সোয়ামীটারও না, মেয়েটারও না।

দোতলার বারান্দা থেকে আবার যদি কোনদিন দেখে মেয়ে-কোলে ট্যাক্সি থেকে নামছে সে-শালা, তাড়াতাড়ি এসে হাত জড়িয়ে ধরবে।

হাউমাউ করে বলবে: ওকে বলে দাও গুইরামদা, আমি এখানে নেই। কাশী—আমি কাশী চলে গেছি মায়ের কাছে। যদি না শোনে, ঘাড় ধাক্কা দাও গুইরামদা, হল্লা তুলে তাড়িয়ে দাও। তোমার পায়ে পড়ি গুইরামদা, পায়ে পড়ি তোমার!

সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করতে ছুটতে হবে।

হুকুম ছাড়া কি—কেঁদে কেঁদে বললেও বলেছে তো দালাল গুণ্ডা গুইরামকে?

সেবার মুখের কথাতেই চলে গিয়েছিল শালা, হাল কিন্তু ছাড়েনি। তার পরেও পাড়ায় কদিন ঘোরাঘুরি করেছিল। চিঠি দিয়েছে। সাধে মালাকে ও-পাড়া ছেড়ে আসতে হল।

কিন্তু এখানেও এসে যদি হানা দেয়? রোজ রাতে সদরে তাই পাহারা দিতে হবে।

সোয়ামীর অত্যাচারেই ঘর ছেড়ে এলেও সোয়ামীটার কথা আজও হারামজাদী ভুলতে পারেনি। সোয়ামীটারও না, মেয়েটারও না।

সেকথা বলে তাই কোন ফয়দা নেই পুরনো কথার পুরনো জবাব আজও দেবে: মেয়েমানুষের কী দুবার বিয়ে হয়, গুইরামদাদা?

যেন গুইরাম নিজে নয়, ভাতার হতে চেয়েছে আর কেউ—হাত ধরে গদগদ গলায় দাদা বলে ডেকে গুইরামকে দিয়ে না করে পাঠাচ্ছে।

হারামজাদী! দুবার বিয়ে হয় না, কিন্তুক—

বেশ তো! তুমিও না হয় মাঝে মাঝে—অতই যদি শখ হয়ে থাকে? কথা শেষ না করে হাসবে। আর সেই হাসি দেখেই ঘাবড়ে গিয়ে ধাঁ করে বেরিয়ে যেতে হবে। বেরোবার মুখে গালে বেমক্কা এক চড় কষিয়ে দিয়ে।

শখ! গুণ্ডা-দালাল-হুড়ুমবাজ গুইরামের শখ কত!

ঈশ! চড়টা যদি নিজের গালে হাঁকাত! ওর সামনে!

গুয়েগুণ্ডার শখ জাগে মালার মত মেয়েকে বিয়ে করার—দিন কতক ভদ্রলোকের বউ সেজে থাকায় অন্ন মাসির মেয়ে বলে আর চেনাই যায় না যে-মালাকে। জোর বরাত সে-বুড়ি টেঁসে গেছে! বেঁচে থাকলে জোর-জবরদস্তি এই মালার সাথেই তার গাঁটছড়া যদি বেধে দিত!

ঘাবড়ে গিয়ে একটা চড় মেরে বসার পর মুখটার দিকে ফের কী করে চাইবে ভেবেই নতুন করে ঘাবড়ে যাচ্ছে যে-গুয়েগুণ্ডা, দিনের পর দিন ওকে নিয়ে সে ঘর করত কী করে?

মাঝে মাঝে পরিবারের গায়ে হাত না তুললে সন্‌সার করে সুখ? দু চারটে ঠ্যাকাঠুকো ওরাও খেতে চায়, বুঝলি গুয়ে। তোকে বলব কি মাইরি, ও-ই একদিন বলে কি—

শালা জানকী! রোগাপটকা মেয়েটাকে পিটিয়ে আবার সাফাই গায়!

শালা গুইরামও! বিয়ে করে সে-শালা কী করবে? না, পাড়ায় পাড়ায় আম্‌রিকান মাল ফিরি করে বেড়াবে। আর মালা, যাকে-তাকে বসায় না যে-মালা, কারো বাড়াবাড়ি সয় না যে-মালা, দেখতে পরীর পারা নাচগান-জানা মেয়ে মুক্তোমালা ফিরিওলার ইস্তিরি হয়ে, ফিরিওলার ব্যাটাবেটির মা হয়ে, ছেঁড়া শাড়ি পরে, আধপেটা খেয়ে, হাসিমুখে ঘরসংসার করবে তিনকড়ি মিস্ত্রির রোগাপটকা কেলেকিস্কিন্ধি বোন জানকীর বউ তরুবালার মত!

শখ কত আব্দার কত হারামজাদা ঘুসকির ব্যাটা গুয়েগুণ্ডার!

ছেলের কথা সাবি কী বলছিল ?

কিছু না। কুছ নেহি।

ওমা! এই না বললে—

বেশ কিয়া। মেরে খুশি! গুইরাম স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে ওঠে।

জামা ধরে তাকে টেনে বসায় মালা। হেসে বলে, তোমার নেশা হয়েছে তাই আমার ওপর চটে গেছ। শরবৎ খাবে ?

চটে গেছি! চটে গেলে হাত গুটিয়ে দাঁইড়ে থাকতুম! শরবৎ খাইয়ে ঠাণ্ডা করছেন!

তাহলে হাওয়া খাওয়াই ? বোস, ফ্যান খুলে দি।

চোপ! ঝটপট এখন কালকের কমিশনটা খসাও দিকি চাঁদু। শালা পাঁইজীর তাগাদা বার করছি। রেজগিগুলো দেড়োর মুখে যদি না ছুঁড়ে মারি—

দুপুরে মাঝরাত্তির।

পরীর কথাটা মনে পড়ে লিলির। অনেক দিন আগে, ইমাম বক্স বাই লেনের বাড়িতে, যে-কথাটা বলে একদিন তাক লাগাতে চেয়েছিল নতুন-আসা পরী।

তাক না লাগুক, তারিফ করেছিল সকলেই : কথাটা ছুঁড়ি বেড়ে বলেছে তো। আশ্চর্য, এ্যাদ্দিন কারো খেয়াল হয়নি : গেরস্থ ঘরের মেয়েদের যখন কাজের সময়, তখন তারা ঘরে খিল দিয়ে ঘুমোয়। আবার তারা যখন—

একেবারে উল্টো ব্যাপার!

হবে না! নইলে আর ফারাক কোথায়?

ফারাক কোথায়! মুখে তারিফ করলেও মনে মনে লিলি বলেছিল, ফারাক যে কোথায়, যাক দুদিন, হাড়ে হাড়ে টের পাবি। পিরীতের চোটে বেরিয়ে আসা বেরিয়ে যাবে তখন।

পিরীতের চোটে বেরিয়ে আসাটা হাড়ে হাড়ে পরী টের এতদিনে পেয়েছে কিনা কে জানে, তবে তার কদিন আগেকার কথাটাও এখন মনে পড়ে যায় : সোয়ামী নাচতে-গাইতে বলল বলে তেজ দেখিয়ে চলে আসা হল! ওরে আমার তেজীরে!

কিন্তু মুক্তোমালা বলে ডাকলে কী করে বল্?

থাম থাম লিলি, ফ্যাচফ্যাচাসনি! বলি এখন করছে কী? বলি এত তেজ দেখিয়ে সোয়ামী ছেড়ে এসে এখন তো সেই—

হাত পা নেড়ে গলা ছেড়ে খিস্তি করে উঠেছিল পরী। কদিন আগে, সেদিনের সেই পরী। খিস্তি শুনলে চোখমুখ একদিন লাল হয়ে উঠত যে-পরীর। খিস্তি শোনানোর হুমকি দিয়ে কতদিন সবাই ঘাড় ভেঙে খেয়েছে যে-পরীর।

পরীর ঘরে মাঝরাত্তির অবধি কাল গানবাজনা চলেছে, দরজা বন্ধ করে ঘুম মুলতুবি রেখে দেহের যন্ত্রণায় মনের জ্বালায় লিলি একটানা ছটফট করেছে।

সারা বাড়ি এখন গেরস্থ বাড়ির মাঝরাত্তির হয়ে আছে। পেটে বালিশ চেপে গদীতে উবু হয়ে পড়ে সিনেমার বইখানা সামনে মেলে রেখে রঙদার ছবি দেখার বদলে পরীর কথাগুলি মনে মনে লিলি খতিয়ে দেখছে : আর যাই হোক, সোয়ামীর ঘরে থাকলে খাওয়াপরার ভাবনা হত না মালার। এবং পরীরও। সুখ ? শান্তি ? সুখশান্তি বলে কিছু আছে নাকি সংসারে ? মানিয়ে চলতে হয়। মুখ বুজে সব সয়ে যেতে হয়। যে যত মানিয়ে চলে সয়ে চলে সেই তত বড় গিন্নী।

কার যেন কথাটা ? কে যেন বলেছিল একদিন ফুর্তি করতে এসে মদের ঝোঁকে ? নাকি সাবিই বলে ?

যেই বলুক, কথাটা মিথ্যে নয়।

লি-লি ! লিল্লি !

ডাক শুনে চমকে ওঠে, তাড়াতাড়ি লিলি উঠে বসে।

কীভাবে ইঁদুরকে খাতির করবে, ভেবে সে দিশা পায় না। হাত ধরে ঘরে আনে, পাশে বসায়, দু হাত জড়িয়ে থেকেও উসখুস করে।

কী খাবি বল ? সন্দেশ ? কাটলিস ? ঘুগনী ? ঘুগনী, কেমন ? ঘুগনী তো তুই খুব ভালো—

খেপেছিস।

তালে ওই ? মাসির কাছ থেকে নিয়ে আসব ? বিলিতীও আছে—আনি ?

ও আমি ছেড়ে দিয়েছি না। তাছাড়া এইমাত্র গণ্ডেপিণ্ডে গিলে এলুম।

এত বেলায় ?

হবে না ! গাড়ি এল দেড়টায়। পৌছতে পৌছতে আড়াইটে। কোনমতে ছুটি খেয়েই—

আশায় বুকটা লিলির ঘাই দিয়ে ওঠে : যাক, তাকে ভোলেনি ইঁদুর ! নিজে বড় হয়ে গেলেও মনে রেখেছে পুরনো দিনের দুঃখ দিনের বন্ধুকে। বংশীকে

দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল কবে, সে নিজে তা ভুলে গেলেও গাড়ি থেকে নেমেই ও ছুটে এসেছে।

ইঁদুর বলে, ঘরদোর সব বন্ধ দেখলুম। ঘুমোচ্ছে নাকি ?

লিলি বলে, তা ছাড়া কি! পটলির হাওয়া লেগেছে। দুপুরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পটলিটা দিনকে দিন যা ধুমসো হচ্ছে মাইরি! আবার বলে কি—ওর ওই গতরই নাকি লক্ষ্মী! এমন হাবা—নাচতে না জানলেও ঠেসে মাল খাইয়ে ওকে তুলে দিয়ে যে সবাই হাসাহাসি করে—

গলা শুনেই বুঝেছি। বলতে বলতে পরী ঘরে ঢোকে। ঢুকেই চেঁচিয়ে ওঠে, ওরে, ও মালা, কুন্দদি, সাবি, পটলি—কে এসেছে দ্যাখসে।

গম্ভীর হয়ে যায় লিলি ঃ এক্ষুনি সবাই এসে জুটবে। ইঁদুর না ওঠা পর্যন্ত নড়বে না। যে জন্যে ইঁদুরকে খবর পাঠিয়ে আনা—গেল ভণ্ডুল হয়ে।

পরীর ডাকে শুনে আসে কুন্দ, মালা, সাবিত্রী। সকলেই অবাক হয়ে যায় ইঁদুরকে দেখে।

তাড়াতাড়ি কুন্দ বিড়ির কৌটো এগিয়ে দেয়।

ও আর খাই না, কুন্দদি।

লিলি বলে, সিগারেট খাবি ? দেব ? আছে আমার কাছে। চার মিনার—গ্র্যাণ্ড কড়া মাইরি!

ইঁদুর বলে, নারে! ধোঁয়া খেলে গলা জ্বলে।

ধোঁয়া খেলে গলা জ্বলে! এর-তার থেকে বিড়ি চেয়ে খেত যে-ইঁদুর, একটা সিগারেটকে চারবার টোটা করে রাখত যে-ইঁদুর—ধোঁয়ায় তার গলা জ্বলে! বিড়ি না নেওয়ায় ক্ষুণ্ণ হয়েছিল কুন্দ, লিলির সিগারেটও না নেওয়ায় কিছুটা খুশি হলেও ক্ষোভটা তার যায় না একেবারে।

তবু হেসে বলে, তা পথ ভুলে নাকি ভাই ?

মালা বলে, ভালো আছিস ভাই ?

ভগবানের দয়ায় আছি একরকম ভাই। তোরা ?

আমাদের আর থাকা ভাই!

সাবিত্রী বলে, কতদিন পরে দেখা ভাই!

পরী বলে, পটলিকে ডেকে আনলিনি মালা?

কাঁচা ঘুম ভাঙালে ও রক্ষে রাখবে!

ইঁদুর এসেছে শুনলে—

ইঁদুর বলে, উঁহু, ইঁদুর না—মঞ্জুলা। মঞ্জুলা ব্যানার্জি। বলে আচমকা হাসতে গিয়ে বিষম খায়।

সঙ্গে সঙ্গে লিলি ঘাট ঘাট করে ওঠে। মাথায় প্রাণপণে ফুঁ দেয়। আলতো ভাবে থাবড়াতে শুরু করে।

তোর ছটফটানি এখনও গেল না ইঁদুর!

ফের ইঁদুর! সামলে নিয়ে ইঁদুর বলে, ইঁদুর হিরোয়িন হলে টিকিট বিক্রি হবে? সরোজ তাই নামটা পাল্টে দিয়েছে। মিস মঞ্জুলাও নাকি আজকাল অচল।

পরী বলে, তাই বলে একেবারে বাঁড়ুজ্জে?

জাতই যদি পাল্টাই—

দাশগুপ্তা হতেও তো পারতিস।

যাঃ! দাদা বলি না? তাছাড়া বউকে যা ভালোবাসে—।

বউকে ভালোবেসেও অনেকে—

চুপ কর দিকি তোরা। ধমক দেয় কুন্দ। বলি, হ্যাঁরে, নামটাম পালটে কিছু সুবিধে হল? নাকি তেমনি হাততালিতেই পেট ভরাতে হচ্ছে?

ইঁদুর বলে, তা তোদের পাঁচজনের আশীর্বাদে কুন্দদি—

বড় স্বস্তি পায় লিলি। যে-কথাটা তাকে জিজ্ঞেস করতে হত, কুন্দ সেটা জিজ্ঞেস করে বড় উপকার করেছে। কুন্দদিকে বিকেলে একটা চার মিনার খাওয়াতে হবে।

নাই বা পাত্তা মিলল কলকাতায়—বাইরে ঘুরে ঘুরে নাম করতে পারলে কলকাতায় থিয়েটারওলারাই তখন সাধাসাধি লাগাবে। তারপর কলকাতার থিয়েটারে একবার নাম হয়ে গেলে—সিনেমা তো হাতের পাঁচ। আর দুটো সিনেমায় পার্ট করেছ কি, সারা জীবন পায়ে পা তুলে গ্যাঁট হয়ে থাক।

সাবিত্রী সুধায়, এবার তোরা কোনদিকে গিয়েছিলি ভাই ?

আসামে। বাংলা দেশের বাইরে। অবিশ্যি সেখানে বাঙালী অনেক আছে—

কুন্দ বলে, ফেরার পথে কাশী ঘুরে এলিনি কেন ? অদ্দূরই যখন গেলি, বাবা বিশ্বনাথকে অম্নি একটা দর্শন করে এলে—

মৃদু হাসে ইঁদুর।

শব্দ করে হাসে লিলি।

তুই কী রে কুন্দদি! কোথায় কাশী আর কোথায় আসাম! শ্যামবাজারে বাজার করতে গিয়ে কালীঘাটে কালী-দর্শন!

অতশত জানিনি বাপু। তোর মত তো সবাই—তা হ্যাঁরে ইঁদুর, নাকি মঞ্জু না ফঞ্জু, পষ্ট বল দিকি ভাই—রোজগারপাতি কেমন হল ? হাতে গায়ে তো—

লিলি বলে, ওটা ইস্টাইল কুন্দদি। কিস্সু বুঝিস না তুই। সাবির মত গা-ভরা গয়না পরে বেনে-বউ সেজে থাকলে—

আমায় আবার টানা কেন ভাই! জড়সড় হয়ে বসে সাবিত্রী। পরীর ডাকে হঠাৎ চলে এসেছে—এগুলো খুলে আসার কথা খেয়াল হয়নি।

কুন্দ বলে, নিজের টাকায় গয়না গড়িয়েছে, পরবে না কেন লা ?

ছড়া কেটে লিলি বলে, আসল সোনা পরলে সখি নকল সখা জুটবে এসে! পটলির মত।

আসুক! এবার নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে সাবিত্রী। সত্যিই তো! গয়না যখন সে নিজের টাকায় গড়িয়েছে, পরবে না কেন ? নড়েচড়ে বসতে গিয়ে আঁচল সরিয়ে গলা-বুক উদোল করে দেয়। দুটি হাত কোলে তুলে নেয়ঃ নতুন ডিজাইনের কাজললতা হারটা দেখা গেলেও হাঁসুলীটা পুরো চোখে পড়ছিল কি ? আর্মলেটের পাথরগুলিও ? একসাথে দুই হাতের কনুই তার চুলকানি খাবার জন্যে সুড়সুড় করে ওঠে। কনুইয়ের পরে ঘাড়। মাথা হেঁট করে এক পাশে ফিরে ঘাড় চুলকোয় সাবিত্রী। চুলকানোর ঠেলায় গায়ের আঁচল খসে পড়ে। কব্জির রুলি, চুড়, চুড়ি, বালা, কঙ্কন, মানতাসার পালিশ ঠিক আছে তো ? নাকটা আবার সুলায় কেন ? হীরার নাকছাবিটায় সোনা কি তবে বেশি হয়ে গেছে ? নাকছাবিতে সোনা

বেশি না হোক, পাশা-ঝুমকোয় নির্ঘাত হয়েছে। নইলে কানের লতি অমন টনটন করে! বাগানটাও অবিশ্যি একটু বেসাইজ হয়ে গেছে, তা অত বড় খোঁপায় নেহাত বেমানান নয়—নাকি বলে সবাই ?

যাই বলিস, সাবিকে কিন্তু সুন্দর মানিয়েছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ইতুর বলে, ঠিক পাড়াগেঁয়ে বউয়ের মত—একেবারে।

লিলি বলে, তুই হাসালি ভাই। গাঁয়ের মেয়েকে গাঁয়ের মেয়ের মত দেখাবে না তো—

তা নয়। গাঁয়ের মেয়ে শহুরে সাজলে যা একখানা দেখায়। মনে নেই—নেই যে মেয়েটা—বুঁচি না কি নাম—জুতো পায়ে হাঁটতে গিয়ে খদ্দেরের সামনেই চিৎপটাং—। ইতুর একটু হাসে।

লিলি হাসে তার দ্বিগুণ। তোর মনেও থাকে! বাব্‌বা!

কুন্দ বলে, তা এক মাসে কী রকম আন্দাজ— ?

মন্দ না।

তবু ?

দু শো।

মাত্তর! নিভে যায় কুন্দ: মাত্র দু শো! তাহলে আর কী সুখে থিয়েটার করা! মিনিমাগনা এর-তার মন যুগিয়ে রাত জেগে গলা ফাটানো! আতরের মত একখানা বাড়ি তোলা দূরে থাক, ওতে কি মাসের খরচই পোষায়! অথচ—দু শো টাকার জন্যে হিল্লিদিল্লি চক্কর! বলতে নেই, দু শো টাকা কুন্দ—মা কালীর দয়ায়—ঘরে বসেই রোজগার করে।

মাত্তর দু শো! কুন্দ যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

টাকাটাই কি সব কুন্দদি ? এই যে কত দেশ ঘুরে এলুম, কত কী দেখলুম, কত মানুষজনের সাথে চেনাজানা হল, কত লোকে তারিফ করল—

ঠিক ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয় লিলি। কুন্দদি টাকা ছাড়া কিচ্ছু চেনে না।

ওলো থাম লো থাম! তাই বলে কুন্দ তোর মত খদ্দেরের পকেট হাতড়ায় না।

কী! পকেট হাতড়াই? আমি? কেউ কখনো চোখে দেখেছে? শোনা কথা শুনে—

শোনা কথা! তাও যদি না ওই নিয়ে সোমবার চুলোচুলি হত।

সে আমার দোষ? এক বলে ঢুকে যদি—

এই! ইঁদুর বাধা দেয়। কী হচ্ছে! কথা কাটাকাটি একটু থামা দিকি বাপু—একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেছে। হ্যাঁরে সাবি—থিয়েটারে নামবি?

আমি? সাবিত্রী হকচকিয়ে যায়।

থিয়েটারে নামবে? সাবি? ঝলকে ঝলকে হাসে লিলি। এখনও জিবের আড় ভাঙল না—ও করবে থিয়েটার? র-কে ড় বলে, কথায় কথায় বাঙাল কথা বেরিয়ে পড়ে—

তাই তো বলছি। বাঙালদের নিয়ে সরোজ একটা নাটক লিখেছে—

তবে যে সেদিন বললি হাসির বই সরোজ করবে না?

এ হাসির বই না, কান্নার বই।

কান্নার বই? বাঙালদের নিয়ে? কলকলিয়ে লিলি হেসে ওঠে। আমি ইয়া খামু, আমি উয়া খামু—'বেজায় রগড়' না বেজায় রগড়। বাঙালদের নিয়ে কান্নার বই! ইলিলিলিলি! লিলি হেসে গড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল, ইঁদুরকে গম্ভীর দেখে আচমকা গম্ভীর হয়ে যায়। মাইরি কান্নার বই?

সত্যি। সরোজ একদিন সবাইকে পড়ে শুনিয়েছে। আগাগোড়া স-ব বাঙাল কথা। পড়তে পড়তে ও তো কেঁদেই আকুল—আর সকলেও—

পরী বলে, আজকাল আর বাঙাল কথা শুনে লোকে হাসে না রে লিলি। যা গ্যাঁড়াকলে পড়েছে বেচারিরা!

ইঁদুর বলে, বেচারি না বেচারি! সরোজ বলে—কি রে সাবি, রাজী? ব্যবস্থা করি? জুতমত মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না। সরোজ আপসোস করছিল—করবি নাকি রে থিয়েটার?

ভাগ! এক ঘর লোকের সামনে—

তুইও যেমন! সাবি করবে থিয়েটার! লিলি ছড়া কাটে, বাঁশের ডালে হাঁস গজাবে চৌবাচ্চায় পোনা, উচ্চিংড়ে গাইবে খেয়াল শুনবে খোকন সোনা!

সাবি হলে কিন্তু বেশ হত!

তোর চেনাজানা আর কেউ নেই? সরোজের না থাক, তোর? কেউ নেই? বলতে বলতে নিজের মুখখানি ব্যাকুলভাবে উঁচিয়ে ধরে লিলি।

দেখছি না তো।

দেখছিস না! লিলি যেন আর্তনাদ করে ওঠে।

উঁহু। সবার মুখে ছাপ পড়ে গেছে। সরোজ বলে—

সরোজ! কথায় কথায় খালি সরোজ আর সরোজ! তাও যদি ছোকরা কোনদিন পাত্তা দিত! খাতির জমাবার জন্যে এক রাতে নেমন্তন্ন করে বসলে তাও যদি না সরাসরি না বলে বসত! শুধু না বলা? নিজেই আগ বাড়িয়ে বোন পাতিয়ে দাদা ডাকিয়ে ছাড়েনি? তাই বলে সত্যিই দাদা বনে গেছে নাকি? আসলে কম টাকায় কাজ বাগিয়ে নেবার মতলবেই এই দাদাগিরির ভড়ং। ইঁদুরের চোখে পিরীতের ঠুলি থাকলেও ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না কেউ।

মনের জ্বালা চেপে সহজ সুরে লিলি বলে, ছাপ পড়ে গেলেও পুরু করে পেণ্ট করে—

মুখে না হয় পেণ্ট করল—কিন্তু মন? সরোজ বলে, মনটা যদি—

এবার লিলি আর সামলাতে পারে না। ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মত শেষ চেষ্টা করে, তাহলে আমাদের নিয়ে লেখা সরোজের সেই বইটায়—

সেটা হবে না।

হবে না? কেন? তুই মানা করেছিস বুঝি? তা তুমি যা মেয়ে—

আমার মানায় কী এসে যায়!

তবে হবে না কেন শুনি?

যে মানা করার মালিক সেই মানা করে দিয়েছে—গরমেণ্ট।

কেন? গরমেণ্ট মানা করল কেন?

দেশের ক্ষতি হবে বলে।

দেশের ক্ষতি হবে বলে ? ছাপা-বই বিক্রি হচ্ছে, তাতে ক্ষতি হয় না, নাটক করে থিয়েটার করলেই—

অমন হয়। সরোজ বলে, বই পড়িয়ে যা না হয়, থিয়েটার করে দেখালে তার বহু গুণ কাজ হয়। থিয়েটার করে লোককে একেবারে ক্ষেপিয়ে দেওয়া যায়। যেমন ধর—

থাম বাপু থাম। বাধা দিয়ে কুন্দ বলে, এ কী অলক্ষুণে কথা! সরোজ লোক ক্ষেপাবে কিরে? কী আছে বইয়ে? বোমা-পেস্তল? সাহেব খুন? সরোজটা তোর স্বদিশী নাকি?

স্বদেশী হবে কোন দুঃখে! নতুন বিয়ে করেছে, একটা বাচ্চা হয়েছে—

সাবিত্রী বলে, সাহেব খুন কী বলছিস কুন্দদি? সাহেবরা কবে দেশ ছেড়ে ভেগেছে। ওরা ভাগতেই না আমাদের এই দুর্দশা!

পরী বলে, দেশটা স্বাধীন পেয়ে গেছে, কুন্দদি তাও—

চোখ পাকিয়ে পরীর দিকে তাকায় কুন্দ: কী ভাবে তাকে পরী? দেশ স্বাধীন পেয়ে গেছে কুন্দ জানে না, বিশ্বনাথ দর্শনের কথাটা বেঁফাস বলে ফেলেছে বলে? কিন্তু দেশ স্বাধীন পাওয়ার কি গোলাগুলী বন্ধ হয়ে গেছে? তফাত শুধু—আগে স্বদেশীরা গুলী করে মারত, এখন তারাই গুলী খেয়ে মরে। শুধু মদ্দ স্বদেশী নয়, মাগী স্বদেশীগুলোও। সেবার বউবাজারের যে-কাণ্ডর কথা নিস্তার বলেছিল, সত্যি হলে, ভাবো দেখি কী কাণ্ড! কী ভীষণ ভয়ানক বিচ্ছিরি কাণ্ড! দিনদুপুরে বড় রাস্তায় চার-চারটে মাগীকে পটাপট খতম করে ফেলল! একটা বাদে সবগুলো নাকি আবার ছেলেপুলের মা! গিন্নীবান্নী মানুষ! চ্‌চু! চ্‌চু!

আমাদের কুন্দদি হল গিয়ে—

বাজে বকিসনি, পরী! ধমক দেয় কুন্দ! হ্যাঁরে ইদুর, সরোজ এমন কী লিখল যে গরমেণ্ট—

নতুন কিছু না। সরোজ লিখেছে, কোন মেয়ে ইচ্ছে করে খারাপ হয় না। খারাপ হয় চাপে পড়ে, বাধ্য হয়ে, আর ব্যাটাছেলের বদমাইসিতে—

পরী বলে, ভুল করেও হয় ভাই? হয় না ভাই?

তাও হয়। কিন্তু ভুল কার না হয়? ভুল ব্যাটাছেলেও করে। ওদের বেলা সাত খুন মাপ। আর মেয়েছেলে জীবনে একটা ভুলচুক করেছে!

যা বলেছিস ভাই! ইঁদুরকে হঠাৎ ঝাপটে ধরে পরী, যা বলেছিস ভাই! নতুন করে সংসার পাতার লোভ দেখিয়ে পরের বউ ভাগিয়ে এনে ফেলে পালিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গিয়ে বিয়ে করে ছেলেপুলে নিয়ে দিব্যি ঘর সংসার ·· ফের দিব্যি ঘর সংসার···ঘর সংসার। একদমে কথা শেষ করতে গিয়ে উত্তেজনায় খেই হারিয়ে ফেললেও থামে না পরী। ঘর সংসার · ঘর সংসার···· !

লিলি বলে, তা গরমেণ্টের কী এসে গেল? সরোজ যদি ওকথা লিখেই থাকে।

বলিস কী লা! ঘরের কথা ফাঁস করে দিলে এসে যাবে না? গরমেণ্ট যে ব্যাটাছেলের গরমেণ্ট রে। ওরাই দেশের হত্তাকত্তা। ওদের ক্ষতি দেশের ক্ষতি না? সরোজ বলে—তা গরমেণ্টেরও দোষ নেই। ওরা হল গিয়ে মাইনের চাকর। আসলে এমন কলই ফেঁদেছে ব্যাটাছেলেরা—

লিলি বলে, তা ব্যাটাছেলেরা এখানে না এলেই পারে। গোল চুকে যায়।

ওরে বোকা! ওদের একটু ফুর্তিফার্তি না করলে চলে? কম খাটনি জগৎ-সংসারের কর্তালি করার!

কুন্দ বলে, বিয়ে করে ফুর্তিফার্তি করুক না। কে মানা করছে।

উঁহু। বাড়তি ফুর্তি ছাড়া, উটকো ফার্তি ছাড়া ওনাদের শানায় না। সরোজ বলে, আমরা না থাকলে ওরা এ-ওর বৌ-ঝি নিয়ে টান মারবে। তাহলে? তাহলে দেশের ক্ষতি না? তার চেয়ে—

ঠিকই বলে সরোজ। মালা হেসে সায় দেয়। আমরা দেশের সেবাদাসী।

দেশের ক্ষতি! লিলি ফেটে পড়ে। আমরা থাকলে দেশের ক্ষতি হয় না, দিনকে দিন আমাদের দল বেড়ে গেলে দেশের ক্ষতি হয় না—আমাদের নিয়ে বই লিখে থিয়েটার করালেই দেশের ক্ষতি! নিকুচি করি আমি অমন দেশের! লাথি মারি আমি অমন দেশের মুখে—হেগে দিই—মুতে দিই—অমন দেশের আমি—

খিস্তি করতে করতে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায় লিলি। ছিটকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় লিলি।

নিজেই নিজের ঘর ছেড়ে যায়, শুধু দেশ নয়, সরোজকেও একটু প্রাণভরে সে গালাগাল দেবে বলে :

কী দরকার ছিল তার অমন বই লেখার—গরমেণ্টের যাতে আপত্তি? কী দরকার তার বাঙালদের নিয়ে কান্নার বই লেখার—মুখে ছাপ পড়ে গেছে বলে লিলি যাতে পার্ট পাবে না? ভারি লিখনেওয়ালা হয়েছে! তবু যদি না কলকাতার থিয়েটারে নিজের বই ধরাবার তরে হেঁটে হেঁটে জুতোর সুকতলা খইয়ে ফেলত! কোথাও কল্কে না পেয়ে নিজেকে না দল খুলে বসতে হত! তার আবার বুলির বাহার! ডাক নাই কুত্তার বাঘা নাম!

মুখে ছাপ পড়ে গেছে! ইঁদুর কোন্ মুখে একথা বলে? এরি মধ্যে সব ভুলে গেছে নাকি ইঁদুর? থিয়েটারে সখির পার্ট করতে গিয়ে ওই শখের পায়রাটার নজরে না পড়লে কী হাল হত আজ ইঁদুরের? ওই তো চেহারার ছিরি! উনি আবার হিরোইন! কী আমার হিরোইন রে! বাদুড়চোষা আম হয়েছেন মঞ্জুলা ব্যানার্জি! কালে কালে দেখব কত শাকচুন্নী সীতার মত! খাতির করে লিলি কিছু বলে না বলে, নইলে—

পরী বলে, টগরের মত লিলিটারও হিস্টিরি ধরল নাকিরে?

মালা বলে, বড্ড চটে গেছে!

সাবি বলে, থিয়েটার করার খুব শখ ছিল কিনা।

ইঁদুর বলে, জানি। আমাকে অনেকবার বলেওছে।

কুন্দ বলে, দে না তোর সরোজকে একটু বলে-কয়ে। ওর ভারি কষ্ট হয় আজকাল। বাইরে থেকে বোঝার যো নেই, কিন্তু যখন চাড়া দেয়, কাটা ছাগলের মত দাপায়। কালই বিকেলে এমন শুরু হল—

ইঁদুর বলে, বুঝি তো রে কুন্দদি, বুঝি সবই। সরোজকে ওর কথা বলেওছিলুম। তাতে সরোজ বললে, টাকার জন্যে আমার দল নয়। টাকার জন্যে যারা থিয়েটার করতে চায়, আমার কাছে তাদের সুবিধে হবে না। আমার এখানে যখন যেমন তখন তেমন—যা পাব ভাগাভাগি করে সবাই—

কুন্দ বলে, সে তো বটেই। তা দু শো না হোক, শ দেড়েকও যদি হয়—

দু শো! আসাম ঘুরে এসে এক মাসে আমি কত পেয়েছি জানিস? ষাট টাকা।

ষাট?

ষাট। খরচখর্চা কম হল? শেষ অব্দি ভাগজোখ করে—

কুন্দ হাঁ হয়ে থাকে।

সাবিত্রী হাঁফ ছাড়েঃ যাক! শুধু থিয়েটার করেই মাসে দু শো টাকা রোজগার করে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে ইঁদুর—বুকটা তার জ্বলে যাচ্ছিলঃ ঈশ, সে-ও যদি থিয়েটার করতে পারত!

সাবিত্রী বলে, তাহলে ইদিক-উদিকও চালাচ্ছিস বল?

ওরে সর্বনাশ! সরোজ বলেছে, তাহলে আর দলে রাখবে না। গোড়াতেই কড়ার করে নিয়েছে। ভালো কথা, পটলির ঘুম ভাঙবে কটায় রে?

ঘুম ভাঙবে কি, ঘুম পটলের আজ এলে তো!

এমন হয় একেকটা দিন। নাকেমুখে কোনমতে দুটি গিলেই দরজায় খিল তুলে দিয়ে জানালা বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে গা ঢেলে দিলেও ঘুম নামে না চোখে।

হয়ত ঘুমের জন্যে তার বাড়াবাড়ি রকমের আকুলতা দেখেই ঘুম ছিনিয়ে নিয়ে মাঝে মাঝে মসকরা করে ভগবান।

কিন্তু রসিক ভগবান কি জানে না—দুপুরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শরীরটাকে আরও বেঢপ না করতে পারলে কী গতি হবে নাচগান-কিছু-না-জানা মুখে-বসন্তর-দাগ কুচকুচে-কালো পটলি হতভাগীর?

ইঁদুর এসেছে টের পেয়েও এতক্ষণ পটল মটকা মেরে ছিলঃ ইঁদুর না যাওয়া পর্যন্ত ঘুম ভাঙা চলবে না।

কী করে সে দাঁড়াবে ইঁদুরের সামনে? সেবার অমন ভীষণ মায়ের দয়ায় যমের মুখ থেকে তাকে বাঁচিয়েছিল যে-ইঁদুর।

পটল প্রতীক্ষা করছিল ইঁদুরের চলে-যাওয়ার-সাড়া পাওয়ার।

মানদার ধমকেও না থেমে লিলির অনর্গল খিস্তিতে সে তাই খুশী হচ্ছিল ঃ এর পর ইঁদুর নিশ্চয় এ বাড়িতে আর থাকবে না।

অবশ্য ইঁদুর চলে গেলে সে-ও একচোট খিস্তি করবে। লিলিকে ঃ কী ছোট-লোক লিলি!

কী ভয়ানক ছোটলোক! ইঁদুর যে আজও ওকে মনে রেখেছে, ওর বাপের ভাগ্যি! ঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছে, ওর চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি!

বাড়ি এলে মানুষ মানুষের সাথে এমন ব্যবহারও করে? একেই তো লিলির জন্যে বাইরের লোকের কাছে এ-বাড়ির বদনাম রটে গেছে। এর পর আপন জনেরাও যে মুখ বেঁকাবে! খাতায় নাম লিখিয়েছ বলে ভদ্রতাটুকুও থাকবে না?

লিলির গালাগাল হঠাৎ থামে। তারপরেই তার ঘরের দরজা বন্ধ করার শব্দ হয়।

যাক, ইঁদুর তাহলে গেল! পটল উঠে দাঁড়ায়।

দরজায় টোকা পড়ে।

অর্থাৎ বংশী চা নিয়ে এল। সে এখনও ঘুমোচ্ছে ভেবে ভয়ে ভয়ে টোকা দিচ্ছে।

দাঁড়া, খুলি।

পটল দরজা খুলে দেয়।

ইঁদুর ঘরে ঢোকে।

বেহদ্দ বেকুব বনে গিয়ে চমকে উঠছিল পটল, জোর করে তবু অবাক হয়, তুই! কতক্ষণ—?

ইঁদুর বলে, কদিনেই তোর চুল এত পাতলা হয়ে গেল কী করে রে?

তুই না বাইরে গিয়েছিলি? এলি কবে?

আয়নার কাঁচটা বদলাস নি? কী বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে বল্ তো!

পটল [illegible]ায় নেই। সে আর কী চালাক! সত্যিই চালাক হলে এতক্ষণ সাম[illegible]ক দরজায় টোকা পড়া মাত্র আহাম্মকের মত খিল খুলে দেয়? চালাক হলে তারপরেও যায় ওপর-চালাকি করতে—ইঁদুর ঘরে

ঢোকা মাত্র হাত দুটি ওর জড়িয়ে ধরে মুখখানিকে অসহায় না করে তুলে অবাক সেজে ?

ইঁদুর বলে, তোর কাছেই আমি এসেছিলুম, পটল।

সেটুকু টের পাওয়ার মত বুদ্ধি পটলের আছে। পটল মুখ ফেরায়।

বুঝলি, তোর কাছেই আমি—

কিন্তু—বিশ্বাস কর ভাই,—

মিছে ঘাবড়াচ্ছিস। আমি তো তোর কোন দোষ দিচ্ছি না।

অপরাধী মুখে মাথা হেঁট করে থাকে পটল। রাগ হয়ে যায় নিজের ওপর। ভুল হয়ে গেছে প্রথম থেকেই—নিজেকে অমন চোর চোর ভেবে—সেই প্রথম দিন থেকেই। নইলে ও নিয়ে কথা বলার কী হক আছে ইঁদুরের ? এক বাড়ি তো নয় ? সে তো কারো কাছে দাসখত লিখে দেয়নি ?

ইঁদুর বলে, তোর কোন দোষ নেই। আমি জানি।

কৈফিয়তের সুরে পটল বলে, আমি মানা করে দিয়েছিলুম, ভাই। বিশ্বাস কর—

খবর্দার! অমন কাজও করিসনি। তাহলে আর কোথাও গিয়ে জুটবে। ধাত জানি তো।

ধাত জেনে গেছে পটলও। অমন নামডাকওলা প্রফেসার মানুষ—কিন্তু কী কাঙালপনা। ইঁদুরের এ-পাড়া ছেড়ে উঠে যাওয়ার পর দুদিনও তর সইল না।

পটল বলে, বউটা নাকি খাণ্ডারনী। তাই—।

বলতে! গায়ে হাত তোলে পর্যন্ত।

পটলও তা শুনেছে। কথাটা বলতে গিয়ে গলা বুজে এসেছিল প্রফেসর মানুষটার।

কিন্তু টাকাপয়সার দিকে হুঁশিয়ার!

সেদিকে আমি ঠিক আছি।

দেখিস। ভুলেও ধার দিবি না।

ধার দেবে! ধারের তোয়াক্কা কত করে! সাত দিনে একবার করে এসে পাইপয়সাটা পর্যন্ত সাবড়ে নিয়ে যায়। তার ঠেলায় একেক বার খোরাকির জন্যেই কম মুশকিলে পড়তে হয়! সাধে ও-মাসের শেষ তিনটে দিন একবেলা চার পয়সার ডাল দিয়ে পেঁয়াজ কামড়ে দু আনার ভাত গিলে, আরেকবেলা জিভে লঙ্কা ছুঁইয়ে তেল-মুড়ি চিবিয়ে কাটাতে হল? কথা হওয়ার অজুহাতে বরাদ্দ চায়ের ভাগটা কমিয়ে দেওয়ায় মাথাটা বিগড়ে গিয়ে ছিঁড়ে পড়তে চাইলে চব্বিশ ঘণ্টা শুয়ে কাটাতে হল? কুন্দরা ভাবুক, সত্যি এ-সময়টা বড় কষ্ট হয় পটলীর, ভেবে চুপ করে থাকুক।

নইলে আসল কারণটা টের পেলে তার বেহিসেবীপনার জন্যে মানদার সাথে সাথে ওরাও কি একটা হইচই বাধিয়ে বসবে না?

ইঁদুর বলে, রোজগারপাতি ভালোই। কিন্তু হলে হবে কি—বউয়ের শাড়ি-ব্লাউজ-গয়নাতেই সব ফক্কিকার। বউকে হাতে রাখে আর-কি! বউয়ের মন যোগাতে—

কী কাণ্ড!

পটলের কাঁচ-ভাঙা আয়নায় একবার হাত বুলিয়ে ইঁদুর বলে, আমি কত বলেছি, ও বউকে তুমি তালাক দাও। দিয়ে আরেকটা বিয়ে কর। গরমেণ্ট তো তোমাদের জন্যে আইনই করে দিয়েছে।

কী বলে? বুকটা পটলের ঢিপঢিপ করে।

বলে, আমরা কি তা পারি! ও পারে যারা খুব বড়লোক, বা একেবারে ছোটলোক।

পটল স্বস্তি পায়। তবু সায় দিতে বাধে। তাই চুপ করে থাকে। যেন মানে বোঝেনি কথাটার।

যাক, চলি। আর হ্যাঁ—বলিস, টাকার তাগাদা আমি দেব না। সে আমি ভুলে গেছি।

বলব।

বলিস কিন্তু, কেমন?

বলব।

দরজার কাছ গিয়ে ফিরে দাঁড়ায় ইঁদুর, আরেকটা কথা—আমার সাথে একবার যেন দেখা করে, বলিস। এমনি দেখা করে। দিনের বেলা যেন দেখা করে। আমার ঠিকানা জানিস তো?

জানি।

বলিস কিন্তু ভাই। বলিস, টাকার কথা একেবারে আমি ভুলে গেছি। বলিস, দিনের বেলা যেন যায়। বলিস, কেমন?

জানালা থেকে আস্তে আস্তে সরে যায় মানদা: হয়। নতুন নতুন এমন সবারই হয়।

প্রথমে বড় মজা লাগে। দেহটা হালকা হতে হতে এমন হালকাই হয়ে যায় যে পা দুটোকে পাখা বলে মনে হয়। নিজের গা-গতর আর নিজের বলে মালুম হয় না।

বেপরোয়া হাত-পা ছুঁড়তে মন চায় তখন। হা-হা হো-হো করে কেবলি হাসতে মন চায় তখন। গান না জানলেও গলা ছেড়ে গাইতে মন চায় তখন। নাচ না জানলেও নাচতে।

দলে থাকলে।

একা হয়েছে কি, গেলে! কান্না পাবে। কেন, কী বৃত্তান্ত ঠিক নেই—কাঁদতে হবেই। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে গুমরে গুমরে কান্না। কাঁদতে কাঁদতে নেতিয়ে পড়েও জ্ঞান না হারানো পর্যন্ত কান্না। জ্ঞান হারিয়েও কাঁদে কত জন।

ফিসফিস করে কুন্দ সুধায়, কী হয়েছে মাসি?

নতুন টানতে শিখে—

কী দরকার ও ছাই গেলার! সয় না যখন। হঠাৎ বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছে কিন্তু।

সত্যি বাড়াবাড়ি রকমের ফোঁপাচ্ছে সাবিত্রী। ঘরের মধ্যে। খাটে। মালার কোলে মুখ গুঁজে। মালাকে দুহাতে বেড় দিয়ে ধরে।

ফোঁপানির তোড়ে মনে হয় তার নতুন ব্লাউজটা বুঝি পিঠের কাছে গেল ফেঁসে।

রাত দুটো। ঘরে ঘরে ক্লান্তির ঘুম। বা ঘুম-ঘুম ক্লান্তির অকথ্য অবসাদ। সারা বাড়ি নিঝুম।

হালকা-নীল আলোর ঝাপসা অন্ধকারে সাবিত্রীর ফোঁপানিটা কেমন ভুতুড়ে ভুতুড়ে মনে হয় মালার। তাকে সাবি ছুঁয়ে না থাকলে নির্ঘাত সে ভয় পেয়ে যেত: এই সেই বুলবুলির ঘর! বুলবুলির খাট!

স্তব্ধ হয়ে আছে মালা। কাঁদুক। একটু কাঁদুক অভাগী। কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হোক। ক্লান্ত হয়ে শান্ত হোক। তারপর ঘুমের যদি দয়া হয়, ঘুমোক।

ততক্ষণ সে বসে থাকবে। চুপচাপ। বাহারী শাড়িখানা তার চির-চির রক্তে মাখামাখি হতে থাকলেও।

বোনের বিয়ের তরে বড় সাধ করে গড়িয়েছিল। গয়নাগুলি। একটি একটি করে। পাঁচটি বছর ধরে। আর সেই গয়না পরে আজ—

এ আমি কী করলাম রে মালা, এ আমি কী করলাম! এ গওনা বুড়িরে আমি কেমুন কইরা পরাইয়া দিমুরে!

চমকে ওঠে মালা।

না, কোলে মুখে গুঁজে তেমনি ফুঁপিয়ে চলেছে।

না, নতুন কাঁকনপরা হাত দুখানা ঠকাঠক আর কপালে ঠুকছে না।

বাঙালটা জানে না যে কপালে কাঁকন ঠুকলে নতুন কাঁকনের হয় ঘোড়ার ডিম, পুরনো-পচা কপালটাই শুধু ফুটো হয়ে গিয়ে রক্ত ঝরায়। বেশ্যা মেয়েমানুষের পুরনো-পচা কপালটা।

ঝরুক। চির-চির রক্ত আর হু হু চোখের জলে বাহারী শাড়িখানা তার মাখামাখি হয়ে যাক। চুপচাপ মালা বসে থাকবে। সাবিত্রীর সই মুক্তোমালা।

প্রথমে মানদা একচোট বকাঝকা করে: বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছে সাবিত্রী। ভয়ানক বাড়াবাড়ি। কুন্দ মিছে বলেনি—ওই ঘোড়ার পেচ্ছাব না খেলে কী হয়, সয় না যখন? সবচেয়ে পুরনো মানুষ কুন্দ, সে খায়? তার মা খেত?

ছড়া কেটে লিলি বলে, দুদিনের বৈরিগী, ভাতেরে কয় অন্ন। অম্বলের ব্যথাটা একটু কম আছে, ভেবেছিস ভেগে গেছে। কিন্তু ও-রোগ একবার পাকড়ালে—তায় ও-জিনিস পেটে পড়লে—

সাবিত্রী হাসে।

দরদী গলায় মানদা বলে, ছ্যাখ ছ্যাখ করতে করতে চেহারার কী ছিরি হচ্ছে! আবার ওই কপাল—ইশ, কী ফুলেছে রে! বলে সে কপালে হাত বুলোতে আসে।

হাত সরিয়ে দিয়ে সাবিত্রী বলে, ফুলেছে কী গো! বলো গয়না পরে খুলেছে। এই কপালেই কাল দেখলে না—

ঢঙ করিসনি! জোর করে কপালে গলায় হাত ছোঁয়ায় মানদা। হুঁ, যা ভেবিছি—জ্বরও হয়েছে। হবে না—টাটানির জ্বর।

জ্বর নয় গো মাসি, এ হল গিয়ে জ্বরজ্বর ভাব!

দাঁত ক্যালাসনি!

বংশীকে ডাকে মানদা। বংশীকে বলে গুইরামকে বলতে মুখুজ্জেবাবাকে গিয়ে এক্ষুণি ডেকে আনুক।

জোর আপত্তি করে সাবিত্রী, ডাক্তার-টাক্তার আমি দেখাব না।

কথা তার কানে নেয় না মানদা। যা, গুয়েকে বলবি একেবারে সাথে করে যেন—

বলছি আমি ডাক্তার দেখাব না।

মানী বাড়িউলীর কাছে থাকতে হলে রীতরেওয়াজ মেনে চলতে হবে বাছা।

মিছিমিছি মুখুজ্জেবাবাকে দৌড় করাচ্ছ। পরী বলেছে, একটা মাছুলি নিলেই কপালের ঘা—

নেয়াচ্ছি মাদুলি! পরীকেও নেয়াচ্ছি!

সওয়া পাঁচ আনায় কেমন হয়ে যেত। না বাপু, চার টাকা ভিজিট, তার ওষুধের দাম—টাকা আমার অত সস্তা না।

পুরো ভিজিট তোকে না গুণতে হলেই হল তো? তুই আদ্দেক দিস—

বাকিটা? মাপ? কেন গো? বাকি দু টাকা উসুল কি—

মানদা গিয়ে লিলির ঘরে ঢোকে।

পুরো ভিজিট সাবিত্রীকে কেন দিতে হবে না—বিপিন আসার খানিক পরেই সেটা হয়ে যায় স্পষ্ট।

স্নান সেরে ঘরে ঢুকে পরী দরজায় খিল দিয়েছিল, মানদার হাঁকের চোটে কোনমতে শরীর ঢেকে তেড়েমেড়ে বেরিয়ে আসে।

বেরিয়েই তেড়ে উঠছিল, বিপিনকে দেখে ঘাবড়ে যায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সাবিত্রীর হাত ফুঁড়ছে বিপিন, তার একপাশে বংশী আরেক পাশে গুইরাম। একজন জলের মগ, সাবান, তোয়ালে আরেকজন ওষুধের বাক্স নিয়ে।

দেখেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে পরীর। তাড়াতাড়ি সে ফের ঘরে গিয়ে ঢুকছিল, মানদা বলে, যাসনি। হয়ে গেছে। ফুঁড়িয়ে যা।

কেন? আমি ফোঁড়াতে গেলুম কেন?

ন্যাকামি করিসনি পরী।

ন্যাকামি? বাঃ রে!

বাঃ রে! তাই তো বলি, কথা নেই বাত্তা নেই পরীর এত নজ্জা!

বাজে কথা বলো না মাসি।

বাজে কথা! হ্যাঁরে, লিলি—

দরজায় দাঁড়িয়ে লিলি সিগারেট টানছিল। হাঁ করে ধোঁয়া ছেড়ে উদাস-ভাবে বলে, আমায় সাক্ষী মানা কেন বাপু! আমি জাত ফিরিঙ্গি জবরজঙ্গী—আমার কাজ কি ওসব কথাতে!

কটমট চোখে লিলির দিকে তাকায় পরী: এক চোখ বুজে সিগারেটে সুখ-টান মারা হচ্ছে! সিগারেটের আগুনটা দেয় ঠেসে ওই বোজা চোখে! নিজের থিয়েটার করার বারোটা বেজে গেল বলে পরশু থেকে সবাইকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারল হারামজাদী!

সাবিত্রীকে ছেড়ে দিয়ে সিরিঞ্জ সাফ করতে করতে বিপিন বলে, কাজটা বড় কাঁচা হয়ে গেছে গো মেয়ে—বড়ই কাঁচা হয়ে গেছে!

কী কাজ মুখুজ্জেবাবা?

এক ডাকে হাজির হই। মঙ্গলবারও কেঁদোর কাছে এসে গেলুম, অথচ তুই—আয়, কাছে আয় আগে, দেখি—

আমার কিচ্ছু হয়নি মুখুজ্জেবাবা! মাইরি বলছি—

না হলে তো ভালোই। যাকে বলে—উত্তম। দেখি—। বিপিন এগোয়।

বিপিন এগোয়, পরী পেছোয়।

সত্যি বলছি, আমার কিচ্ছু হয়নি মুখুজ্জেবাবা। একদম কিচ্ছুটি হয়নি—বিশ্বাস করুন—

ভয় কিরে বেটি! এত সইতে পারিশ, একটা ছুঁচের ফোঁড় সইতে পারবি নে।

একটা!

একটা না হোক, দশটা। উনিস আর বিশ। দেখি—

পিছু হটতে হটতে দেওয়ালে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল পরী, এক হাতে তার হাত পাকড়ে আরেক হাতে বিপিন তার বুক থেকে কাপড়ের স্তূপ সরিয়ে দেয়, ব্লাউজের বোতাম খুলে দেয়—ঈশ! কী করেছিস বল তো মেয়ে! কদ্দিন পুষে রেখেছিস! হপ্তায় হপ্তায় আমি আসছি—

আমি মাদুলি নিয়েছি মুখুজ্জেবাবা। মাদুলিতেই—

লালচে চাকা চাকা দুটি দাগের মাঝখান থেকে পাহারাদার মাদুলিটাকে এক হেঁচকায় উপড়ে এনে বিপিন বলে, মাদুলিতেও রোগ ভালো হয়। হবে না কেন, হতে হয়। কিন্তু সে বস্তিঘরে, মেয়ে—পয়সা না থাকলে। দরজায় দাঁড়ালে দু-চার পয়সা খরচা করে হোমিপাথি করতে হয়, দোতলায় থাকলে দু-দশ টাকা খরচা করে ডাক্তার-বদ্যি ডাকতে হয়। কইবে বংশী, ল্যাম্‌পোটা আরেকবার জ্বাল বাবা, বাক্‌সটা নিয়ে এদিকে এসো হে গুইরাম।

হাত ছিনিয়ে নিয়ে সরে দাঁড়ায় পরী। না, কক্ষনো আমি ফোঁড়াব না।

মানদা গম্ভীরভাবে বলে, পরী!

গুইরাম গম্ভীরভাবে বলে, পরে!

পরী রুখে ওঠে, কক্ষনো আর ফোঁড়াব না। আমার শরীর কি মানুষের শরীর না! ঝাঁঝরা হয়ে গেল—

শোন মেয়ের কথা! হেঁ হেঁ করে হাসে বিপিন। হাসতে হাসতে বলে, শরীরটা কি তোর রে মেয়ে যে ও নিয়ে অত মাথা ঘামাস? তুই তো নিমিত্ত মাত্র। জানিস, গীতায় ভগবান বলেছেন—

কাশার ছলে হাসি থামিয়ে বিপিন ভাবে: কী লাভ এগুলোকে গীতার শ্লোক শুনিয়ে? বুঝবে কিছু?

সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি-এ পড়ার সময় চাকরে বাপটা রাতারাতি জীর্ণানি বাসাংসি খসিয়ে ফেললে সংসারের পাল্লায় পড়ে পড়াশোনা হৃষিকেশের পায়ে সঁপে দিয়ে সাত ঘাটে হাবুডুবু খেতে খেতে সাতাশ মুলুক ঘুরপাক খেয়ে এ-পাড়ায় এসে ডিসপেনসারি খুলে বসার পরও সংস্কৃত শ্লোকগুলি মুখস্থ থেকে গেলেও তার মানে-টানে কি গুলিয়ে ফেলেনি বিপিন মুখুজ্জে নিজেই?

বিশেষ করে দল বেঁধে এরা তাকে বাপ ডেকে, গঙ্গা নেয়ে ফেরার পথে ষোল থেকে ষাট বছর পর্যন্ত তার ডিসেপেনসারির সিঁড়িতে ঠকাঠক প্রণাম ঠুকে, এটা-ওটা নানা অজুহাতে ফলমিষ্টি বাবদ নগদ মূল্য ধরে দিয়ে, কার্তিক পুজোয় বামুন দিয়ে রান্না করিয়ে চারপাশ থেকে ঘিরে বসে বামুন দিয়ে পরিবেশন করিয়ে খাইয়ে খাইয়ে কি এমন করে দেয়নি বিপিনের মতিগতি যে মানে জানা

থাকা সত্ত্বেও একটা চাণক্য শ্লোকের উপদেশ ভুলে গিয়ে ষোল-বছর-আগে-ষোল-পেরিয়ে-যাওয়া সত্যিকারের-ডাক্তারি-পাশ ছেলের সাথে এ-পাড়ায় আজও ডাক্তারি করা নিয়ে মুখোমুখি সে ঝগড়া বাধিয়ে বসে দু-চার দিন অন্তর অন্তর? ঝগড়ার মুখেও কিনা শান্ত গলায় বলে বসে, এ পাড়ার যত বদ-বদমাস মেয়েগুলিই তার লক্ষ্মী? এরা না থাকলে বিপিন মুখুজ্জের ব্যাটাকে প্রেসিডেন্সী থেকে বি-এস-সি পাশ করে দুবছর মেডিক্যাল কলেজে কাটিয়ে পুরোদস্তুর ডাক্তার বনে চৌরঙ্গীতে আজ চেম্বার খুলতে হ'ত না?

মানদা বলে, সাবি, ভিজিটের দু ট্যাকা তুই দে। আর ওষুধের তরে গোটা পাঁচেক বার কর—

বিপিন ভুল শুধরে দেয়, পাঁচ টাকা নয়—বারো আনা।

ওর চে ভালো ওষুধ নেই বাবা, বারো আনার চে? আজই যাতে—

উঁহু। দিন পাঁচ-সাত ভোগাবে। ওর চেয়ে ভালো ওষুধ খেলেও ভোগাবে।

তালে থাক।

ওর চেয়ে ভালো ওষুধ! কায়দাটা একদিন বিপিনই বের করেছিল, পাঁচ আনার ওষুধকে যেদিন পাঁচ সিকা হাঁকত।

কিন্তু এখন ভয় করে সেই কায়দা খাটাতে, যদি ওই মওকায় টেক্কা মেরে দেয় সামন্ত?

ডিগ্রিওলা পেল্লায় সাইনবোর্ড টাঙিয়ে ধোপদুরস্ত সাহেব সেজেও সামন্ত এখনও সুবিধে করতে পারছে না বটে, কিন্তু সস্তায় ওষুধ যোগান দিয়ে সে যদি পাততাড়ি গুটোতে বাধ্য করে বিপিনকে—কী করে সময় কাটবে বিপিনের? যে-বিপিনের অতিবিদ্বান বুদ্ধিমান ছেলে বাপকে আর বাপ বলেই গ্রাহ্য করে না, পুরোনো বউটা যে-বিপিনের ছেলে-ছেলেবউয়ের দলে ভিড়ে গেছে, ইস্কুলে-কলেজে পড়ুয়া মেয়ে দুটি যে-বিপিনের বাপের ডাক্তারির কথা বলাবলি করে আড়ালে নাক সিটকায়, মুখ-দেখে-বিনাপণে-ঘরে-আনা ছেলে বউ যে-বিপিনের তারই বাড়িতে বসে তারই বিরুদ্ধে দল পাকায়, অমন নেওটা বড় মেয়েটা পর্যন্ত যে-বিপিনের শ্বশুরবাড়ি থেকে লেখে এবার তুমি

দিয়ে ধর্মকর্ম করে কাটাও বাবা! ডাক্তারি ছেড়ে দাও। তাও ও পাড়ায়! এরা যাতা শোনায়!

পরী বলে, আমি কিন্তু একটা আধলাও—

গুইরাম বলে, তেরি ঘাড় দেগা।

দেখো! দেখো না, দেখো! আমি যদি এক আধলা—

গুইরাম তেড়ে উঠছিল, বাধা দিয়ে বিপিন বলে, বেশ, এক আধলাও দিসনি তুই। তার বদলে কটা দিন হাতের সুখ করে আমায় সুচ ফোটাতে দে দেখি। জানিস না তো, ফোঁড়াফুঁড়ির জন্যে আঙুলগুলি আমার কী সুড়সুড় করে!

ওষুধের তরেও আমি একটা আধলা—

দিসনি। ওষুধ আমার আলমারিতে পচছে। ও তো পচেই যেত, ওষুধ পচার গন্ধে আবার মেথর ডেকে ঘর সাফ করাতে হত—ওর বদলে যদি দিনকতক মজাসে হাতের সুখটা—আয় বেটি, কাছে আয়।

না!

বিপিন হাত বাড়াতে সরে যায় পরী।

মরেছে! তোরও কি টগরের মত হিস্টিরি ধরল নাকি রে? কী সর্বনাশ। ওরে অ মালীপাঁচঘড়া, কেঁদো, লিলিপুটিয়া, জলসাবু, বলি ওরে ও পাটলিপুত্তুর—শিগগীর কলঘর থেকে বেরো, দেখে যা—প্যাঁড়ার হয়েছে হিস্টিরি!

উঁহু মুখুজ্জেবাবা, হাসালেও আমি হাসব না।

হাসি! হিস্টিরি রোগে ধরল তোকে, আর তাই নিয়ে আমি হাসাহাসি করব? বলি, ডাক্তাররা যমের পেয়াদা হলেও—দেখি দেখি, নাড়িটা দেখি—

চালাকি! আঁচলের মধ্যে দুহাত লুকিয়ে ফেলে আরও এক পা সরে যায় পরী।

মালা বলে, কী হচ্ছে! শুধু তোকে নিয়ে পড়ে থাকলে মুখুজ্জেবাবার চলবে? তাড়াতাড়ি ছেড়ে দে।

আমি কি ধরে রেখেছি?

ঠিক, প্যাড়া ঠিক বলেছ। মালীপাঁচঘড়া চোখ থাকতেও কানা। আমাকে ছুঁতেই দিচ্ছে না, বলে—ছেড়ে দে! তা, হ্যাঁরে বেটি, বুড়ো মানুষটার হাতের সুখে এভাবে বাদ সাধবি? কত আশা করে এলুম—

গুইরাম বলে, বাঁ হাতে ধর তো বংশী বাক্সটা, দেখি একবার হারামজাদীকে —ওর ছেনালির যদি না ইয়ে করেছি—

গুয়েপোকা এবার কিলবিলিয়ে উঠেছেরে! গুইরামকে আগলায় বিপিন। শিগগীর এদিকে পালিয়ে আয় প্যাড়া—শিগগীর।

উঁহু। আমি কিছুতেই—

মানদা ঝাঁজিয়ে ওঠে, বলি, তোর তরে মোর বাড়ির বদনাম হবে?

বাড়ির বদনাম হবে! পাল্টা ঝাঁজিয়ে ওঠে পরী, বলি সোয়ামীর কাছ থেকে এ-রোগ আমি নিয়ে এসেছিলুম? আমার মা বাপ ভাই বোন কারো—

মালা বলে, ছি! ওঁদের কথা কেন তুলছ ভাই!

মাসি বড় বাড়ির গুণ গাইছে কিনা। নইলে—। গলা ভেঙে যায় পরীর।

কুন্দ বলে, যাক গে। এখন মুখুজ্জেবাবা যা বলে শোন। নইলে যে পচে-গলে মরবিরে হতচ্ছাড়ী! বুঁচির কথা মনে নেই?

পচে-গলে মরি মরব! বেশ করব!

বেশ করব! মানদা ক্ষেপে যায়। ওরে শতেকখাকী আটকপালী! মানী বাড়িউলীর বাড়িতে পচে-গলে মরা! বেরো, এক্ষুনি তুই বেরো মোর বাড়ি থেকে—আজই ঘর ছেড়ে দে—

এক্ষুনি বেরো! আজই ঘর ছেড়ে দে! বলি মাসের ভাড়া আগাম দিয়েছি কি তোমার সুরৎ দেখতে?

ওঃ! এক্ষুনি ফেলে দিচ্ছি তোর ট্যাকা—বেরো তুই—ট্যাকা নিয়েই বেরো। ট্যাকার লবাবি দেখাস! তাও যদি না বিনি সুদে মাসির ঠেঙে ট্যাকা নিয়ে ট্যাকার মুখ দেখতিস। নেমকহারাম! টাকার খোঁটা দিস্! এক্ষুনি তুই বেইরে যা!

বিপিন বলে, আমি কিন্তু তার আগেই বেরিয়ে যাচ্ছি মানদা। ডেকে এনে অপমান।

ও মাগো! তোমায় আবার কখন অপমান করনু!

অপমান না তো কি? কথা হচ্ছে আমার সাথে। মাঝ থেকে তোমরা কেন ফুক্কুড়ি মারছ? নাকি বলো গো মেয়ে? এ্যাই—বল না বেটি?

ধমকের চোটে ঘাড়টা কাত করে ফেলে পরী।

হিস্টিরি-টিস্টিরি বাজে কথা। প্যাড়ার মত মেয়ের হিস্টিরি হবে কোন্ দুঃখে! ও আমি ঠাট্টা করছিলুম। তবে কথাটা কি জানিস বেটি, যে-চুলোতেই যাস, পচে-গলে তো রাতারাতি মরতে পারবিনে—

কিন্তু মরার আগে তো আরও কটাকে ফাঁসিয়ে যেতে পারব মুখুজ্জেবাবা?

বলে কি মেয়েটা! ভড়কে যায় বিপিন। আসলে এই মতলব?

ভড়কে যায় সব কটি মেয়েও। বংশী, গুইরাম, মানদাও।

সাবিত্রী বাদে।

এতক্ষণ সে চুপচাপ সব শুনে যাচ্ছিল। দেখে যাচ্ছিল। আর হাত দিয়ে ইনজেকশনের জায়গাটা প্রাণপণে রগড়াচ্ছিল।

এবার গলা ফাটিয়ে সায় দিয়ে ওঠে, ঠিক বলেছে পরী! ঠিক বলেছে! ঠিক বলেছে!

তবে রে! পলকে ওষুধের বাক্স নামিয়ে ঝাঁপিয়ে আসে গুইরাম।

শেষরাতে চোরের মত পালিয়ে গিয়েছিল মন্মথ সিকদারের বিধবা বোন কুমু।

শেষরাতে:- চোরের মত পালিয়ে এসেছে অবু মাস্টারের সধবা মেয়ে সুবর্ণ।

এতদিনে সত্যি সত্যিই নিজেকে সাবিত্রীর কুলত্যাগিনী মনে হয়।

মরার দাগা না দিয়ে বোনটা বাঁচার পথ বেছে নেওয়ায় মন্মথ সিকদার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল: কাসেমালীকে নিকা করুক, আসাম গিয়ে সংসার পাতুক, জীবনটা হেসে-খেলে কাটিয়ে যাক। একটাই তো জীবন মানুষের।

বোনটাকে মন্মথ সিকদার বড় ভালোবাসত কিনা। মা মরা বালবিধবা একমাত্র বোনটাকে।

তাই ফেটে-পড়া খুশিতে সিকদার-গিন্নী পাড়া মাতালেও, মন্মথ গিয়েছিল শুধু গুম হয়ে, সকলের বলা-কওয়াতেও ডায়েরিটা পর্যন্ত করায়নি।

পাছে খুঁজে-পেতে পুলিশ ফিরিয়ে দিয়ে যায় কুমুদিনীকে।

কী মুশকিল তাহলে ভাবো দেখি: মা-মরা বালবিধবা একমাত্র বোনের প্রতি ভালোবাসা, ধরাকে-সরা-দেখা জোতদারের-মেয়ে বউয়ের প্রতি ভালোবাসা, শরীর-রোগে-সর্বাঙ্গ-খসে-পড়লেও-জমিদারী-মেজাজী সমাজের প্রতি ভালোবাসা—এক সাথে এই তিন ভালোবাসার টান সামলাতে তিন টুকরো হয়ে যাবে নাকি মন্মথ সিকদার? ক-পাখী-জমিসম্বল গরিব গৃহস্থ যে-মন্মথ সিকদার।

এক মাস এগারো, এগারো কেন বারো দিন হল চলে এসেছে—শেষ রাতে কুমুর মত বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে—কেউ একটা খোঁজ নিল না?

নিজেরা না আসুক, একটা চিঠিও কি দিতে পারত না?

গত বছর ফনী অসুখে পড়লে, ডাক্তারে সেটা সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা বললেও আতঙ্কে জ্ঞানহারা সুবর্ণ ননীকে ঠিকানা দিয়ে তার হাত ধরে কেঁদে কি বলেনি—কাল-পরশুর মধ্যে জ্বর যদি ফনীর না ছাড়ে, ননী যেন তাকে অতি অবিশ্যি গিয়ে

খবর দেয়? নিচে পানওলার দোকানে তার নাম—নাম মানে সাবিত্রী—সাবি বললেই—বলে এলেই চলবে?

ননী মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। হঠাৎ হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল।

সুবর্ণ অবাক মত হয়েছিল।

সেই অবাক হওয়াটুকু বুঝি মনের ভেতর গেঁথে গিয়েছিল।

ননীর ব্যবহারের মানেটা বুঝেছিল চার দিন পরে। ননী খবর না দেওয়ায় ফনী ভালো হয়ে গেছে বুঝে মানতের পাঁচ সিকে পয়সা পূজো দেবার জন্যে বংশীর হাতে তুলে দেবার সময় ফনীর মুখটা ভাবতে ভাবতে আর সকলের মুখগুলিও যখন একে একে মনে পড়ছিল; তখন।

পরে শুনেছিল, দুদিনে ফনী ভালো হয়নি, চার দিনেও না—পাক্কা পাঁচটি দিন লেগেছিল তার জ্বর কাটিয়ে পথ্যি করতে। তবু খবর দেয়নি ননী!

তাই শুনে রাগ করতে গিয়েও রাগ করতে পারেনি ননীর ওপর। ফনী যখন ভালোই হয়ে গেছে, কী দরকার ও কথা তুলে! সেই অবাক হওয়াটুকু ফের খচ করে বিঁধেছিল। আসলে দোষ তো তারই। সে-ই বেচাল কাজ করে ফেলেছিল। ননীই বরং সেটা সামলে দিয়েছে।

কিন্তু পানের দোকান কেন, আজ তো ননী সোজা উঠে আসতে পারে? আজ সংসারের অভিভাবক হয়ে উঠেছে যে-ননী। ভাইবোনের বাবা হয়ে উঠেছে যে-ননী। টাকার জন্যে বিয়ে করার কথা, বিয়ের পর দেশে ফিরে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করার কথা সরাসরি সুবর্ণর মুখোমুখি তাকিয়ে বলতে বাধেনি যে-ননীর।

সুষমাই কি দুলালের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে আসতে পারত না? সংসার থেকে একটা মানুষের খরচ কমাতে হন্যে হয়ে উঠেছে যে-সুষমা।

আসতে পারত অবিনাশও। দাবা খেলতে যাচ্ছি আরেক পাড়ায় বলে। সুভাষিণীও সাথে আসতে চাইলে যতীন-নগরে শালার ওখানে যাচ্ছি বলে। ইদানীং ভয়ানক চালাক হয়ে গেছে যে-অবিনাশ। প্রয়োজনের সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা অসীম যে-অবিনাশের। আর সুভাষিণীর। 'তর বাপে—তর বাপের

বউয়ে—। কথাটা সুষমা ঠিক বলেনি। অবিনাশ সুভাষিণী কি এখনও সুবর্ণর বাপ মা হয়ে আছে? সাবিত্রী যে-সুবর্ণ।

ওরা সবাই আজ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। মন্মথ সিকদারের মত।

মন্মথ সিকদার। কুমুদিনী। টান-ভালোবাসা।

একটাই তো জীবন মানুষের—গোঁড়া ব্রাহ্মণ হয়েও মন্মথ সিকদারের কথাগুলি এসে বাহাদুরি করে শুনিয়েছিল অবু মাস্টার।

আর কখনো কি অবু মাস্টারের মনে পড়বে—সুবর্ণ বলে তার একটি মেয়ে ছিল, তাকে সে সোনা-মা বলে ডাকত? সোনা-মা সামনে বসে সাধাসাধি করে না খাওয়ালে খেয়ে তার পেট ভরত না? সোনা মা পায়ে না হাত বুলিয়ে দিলে ঘুম তার চোখে নামত না? মনে পড়বে কি?

সুবর্ণরও একটি দিদি ছিল—সুবর্ণ শুনেছিল—অবনীর তিন বছরের ছোট, তার তিন বছরের বড়। পাঁচ বছরে মাথায়-রক্ত-ওঠা দুদিনের জ্বরে মরে যায় সেই দিদিটা তার।

কোনও দিন কি সেই মেয়ের জন্যে বাপকে সে আপসোস করতে দেখেছে? মাকে দেখেছে? অথচ স্বর্ণলতা বেঁচে থাকলে সুবর্ণর ভাগ্যে সোনা-মা হয়ে ওঠা হত কিনা কে জানে।

মরা মানুষকে মানুষ মনে রাখে না। জন্মের মত হারিয়ে যাওয়া মানেই মরে যাওয়া। স্বর্ণলতার মত সুবর্ণলতাও যদি জন্মের মত হারিয়ে যায়—কেন তাকে মনে রাখবে কেউ!

শিয়ালদ স্টেশন থেকে, ক্যাম্প থেকে, বেলেঘাটা বস্তি থেকে জন্মের মত হারিয়ে গেছে রমা, অরুণা, জ্যোৎস্না, শেফালী, লক্ষ্মী, গৌরী, যশোদা—আরও কতজন—নামগুলি সকলের সুবর্ণরই কি আজ মনে আছে?

অবশ্য নিজেদের প্রথম মেয়েকে অবিনাশ সুভাষিণী ভুলে গেলেও, একজন পারেনি। অন্তত একটি দিন সেই বোনটাকে তার মনে পড়ে গিয়েছিল।

প্রায় আট বছর পরে একটি দিন: তেল মুন ধনেপাতা মরিচের গুঁড়ো গুড় দিয়ে কুল মেখে নিয়ে গিয়েছিল। 'ওয়া আমি খাই না। নিয়া যা।' 'দাদা,

ভালো হইবনা কইতাছি!' 'উঁহু!' 'তর লেইগা মারে লুকাইয়া—।' 'ও নটকা আমি খাই না জানস না?' 'একটা দিন খা। চিনু গো বাড়ি থনে আনছি—নতুন বোড়ই। লক্ষ্মী দাদা, তর পায়ে পড়ি দাদা, কেমুন মাখছি, ছাখ। না খাইলে আমার মাথা খাস।'

অনেক সাধাসাধিতে একটি কুল সে তুলে নিয়েছিল। কিন্তু মুখে দিয়েই থু থু করে ফেলে দিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠেছিল: দুটি কুলের জন্যে তার সাথে আড়ি করে অসুখে পড়ে দুদিন অজ্ঞান হয়ে থেকে আর ভাব না করে জন্মের মত চলে গেছে যে-বোনটা তার—তার কথা বলতে বলতে আরেক বোনকে জড়িয়ে ধরে সে কী কান্না! পুবের ঘরে।

কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ মেঝেয় আছড়ে পড়েছিল: এইখানেই যে ছিল সেই কুলগাছটা! ঠিক এইখানে!

তারই জেদে প্রায় আট বছর আগে সেই কুলগাছ কেটে ফেলা হলেও, পাঁচ বছর পরে সেখানে তার পড়ার আলাদা ঘর হলেও—ঠিক এইখানটায় ছিল সেই কুলগাছ! ঠিক এইখানে! ওরে সোনা, এইখানে!

বড় ভাইকে সান্ত্বনা দিয়ে ছোট বোনকে তখন বলতে হয়েছিল—সেই শত্তুরটার জন্যে যদি অমন করে কাঁদে দাদা, এত কষ্ট করে আনা তার কুলমাখা যদি না খায়—সে ও তবে আড়ি করে দেবে। নিশ্চয় দেবে আড়ি করে। দিয়ে মরে যাবে। একদম মরে যাবে।

দাদাটা কী বোকা! ছি! ছি! কেন বোঝে না যে, আড়ি করে মরেছিল বলেই সেই হতভাগীকে ফের স্বর্ণ করে পাঠিয়ে দিয়েছে ভগবান? স্বর্ণ হওয়ার পরে মরেছে? ওমা, তাতে কি! মানুষ তৈরি করতে পারে ভগবান, আর একটা জ্যান্ত মেয়ের সাথে একটা মরা মেয়েকে মিশিয়ে দিতে পারে না? নতুন-পুরনোয় মিশিয়ে জিনিস তৈরি হয় না? মার পুরনো রুলির সাথে নতুন সোনা মিশিয়ে অনন্ত গড়িয়ে দেয়নি নিধু স্যাকরা? তবে? ভগবান কি নিধু স্যাকরার চেয়ে বড় নয়?

আজ যদি অবনী থাকত!

যতই বদ্দলাক গণি মিঞা, একেবারে পীর-পয়গম্বর বনে যাক—পাকিস্তানের-জেলে-অন্ধ সেই শুওরের বাচ্চাটাকে যদি আজ একবার হাতে পেত!

দাঁত দিয়ে প্রাণপণে ঠোঁট কামড়ে ধরে সাবিত্রী।

অবু মাস্টার! স্থবর্ণ। টান-ভালোবাসা।

টান-ভালোবাসাই বটে।

সুরমার তো আজ পোয়াবারো।

সেই কথাটার মানে বুঝে গিয়ে টুলুও আজ ভাবছে, ভাগ্যিস।

'তুমি যাইও না বড় পিশি, তুমি যাইও না!' তিন বছর বয়েসে এক হবু-খানকির আঁচল ধরে কেঁদে ওঠার জন্যে আজ হয়ত ঘেন্নায় মরে যেতে চাইছে আট বছরের টুলুরাণী।

ফনীর ব্যবস্থা যখন ফনী করে নিয়েছে, সুষমার ব্যবস্থা সুষমা করে নিচ্ছে—সুরমার প্রায়-ঠিক ব্যবস্থাটা করে দিয়ে এক ছেলে নিয়ে, ছেলের বউ নিয়ে, নিজের বউ নিয়ে, নাতনীর হাত ধরে দেশে ফিরে গিয়ে পোড়া ভিটাতে ঘর তুলে বাকিটা জীবন কটিয়ে দিতে কি পারবে না অবু মাস্টার?

একটাই যখন জীবন মানুষের?

আসছি মা। বলে ভবতারণ ঘরে ঢোকে।

খাট থেকে সাবিত্রী নেমে আসে।

কী আক্কেল আপনার ঠাকুর মশায়! কাল মোটে এলেন না?

কাল ছেলেটার বড় বাড়াবাড়ি গেছল মা।

বেশ। আজ সকালে না এসে এই সময়—

অপরাধী মুখে ভবতারণ বলে, শ্মশান থেকে ফিরতে ফিরতে—

শ্মশান থেকে?

কপালের দুভ্যোগ মা! পাঁচ বছরের ছেলেটা শুকোতে শুকোতে ছ মাসের হয়ে গেছল। ভাবলুম তাড়াতাড়ি পুঁতে রেখে একটা ডুব দিয়েই—

ঠাকুর মশায়!

কিন্তুক ব্যাটারা ঠিক ধরে ফেলল। গেল কটা টাকা বেশি বেইরে। গরিব হওয়ার ল্যাঠা বিস্তর মা। নইলে—

যথারীতি নিজের ডিউটি শুরু করে ভবতারণ। মন্ত্রের মতই বিড়বিড় করে আপন কথা বলতে বলতে : ছেলে মরার শোকে হাত-পা গুটিয়ে থাকলে বউ এবং মেয়েগুলিসমেত তাকেও যে মরা ছেলের পথ ধরতে হবে—ভবতারণ কি তা বোঝে না?

আশ্চর্য হবার কিছু নেই, তবু আশ্চর্য হয়ে যায় সাবিত্রী : মাথায় গঙ্গাজলের ছিটে দিয়েও ভবতারণ যখন সঙের মত দাঁড়িয়ে থেকে নিঃশব্দে চোখের জল ঝরায়—পায়ের কাছে তুআনি রেখে সে প্রণাম করে ওঠার পরও।

কিছু বলবেন?

যদি রাগ না করো মা—

আমি কি খুব রাগী ঠাকুর মশায়?

রাম! তোমার মত তুটি মেয়ে—

সেদিন ছোটলোকের মত—

অমন হয়, মা। মানুষের মন-মেজাজ বিগড়ে অমন যায়। মাঝে মাঝে যায় বিগড়ে। বলে ভগবানের তুনিয়াটাই যেখানে চব্বিশ ঘণ্টা বেগড়বাঁই করছে—। গলাটা হঠাৎ খাদে নামিয়ে এনে কাঁপাকাঁপা হাতখানা বাড়ায় ভবতারণ, মাগো, আমায় তুটো টাকা দেবে? ধার চাইছি। মরার আগে বাড়াবাড়ি করে একেবারে ফতুর করে দিয়ে গেছে। তুই যখন হারামজাদা বাঁচবিই না—

সাবিত্রী বলে, মরা ছেলেকে গাল দিতে নেই ঠাকুর মশায়।

গাল দিতে নেই! ভবতারণ যেন ক্ষেপে যায়, হাতে পেলে হারামজাদাকে আছাড়ে শেষ করতুম! জানো মা, ওর তরে আজ একটা আধলা ঘরে নেই? দিনমান এক গুষ্টি কান্নাকাটি করে যাহোক কাটিয়েছে। এখন? তাও আমরা তুটিতে না হয় কাঁদতে কাঁদতে রাতটা কাবার করে দিলুম, কিন্তু কাচ্চাবাচ্চাগুলি তো—ওই অবুঝ-নাবুঝগুলো তো—

টাকা আমি দিতে পারি ঠাকুর মশায়, তবে ধার বলে নয়—

ভবতারণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

প্রণামী বলে। মন দিয়ে আজকাল আপনি আর পুজো করছেন না ঠাকুর মশায়।

বলো কি মা! মন দিয়ে পুজো করছি না? আমি? উড়ে ব্যাটা নেয়ে কাপড় ছাড়ত না, আর আমি রোজ গঙ্গা থেকে শুদ্ধ কাপড়ে সোজা এখানে—

তাহলে দিনকাল আমার খারাপ যাচ্ছে কেন? কাল কিছু হয়নি, পরশুও না হওয়ারই শামিল। আজও এখন পর্যন্ত—

সে ভগবানের হাত মা!

তাই তো বলছি। আমার হয়ে একটু বেশী করে আপনি ভগবানকে বলুন। বেশী করে মন দিয়ে ভগবানের পুজো করুন। তার জন্যে আমি বাড়তি প্রণামী দিচ্ছি। এমন-কি শান্তি-স্বস্ত্যয়নের দরকার হলেও রাজী আছি।

ড্রেসিং টেবিলের দেরাজ খুলে পাঁচ টাকার একটি নোট বার করে দেয় সাবিত্রী।

ভবতারণ হাত বাড়াতে ভুলে গিয়ে মুখের দিকে চেয়ে থাকলে, সে-ও ছোঁয়াছুঁয়ির কথা ভুলে গিয়ে নোটখানা তার হাতে গুঁজে দেয়।

ভবতারণকে ধরে আস্তে আস্তে ঘরের বার করে দেয়।

হ্যাঁ, এখন থেকে তাকেও হাতে রাখতে হবে ভগবানকে। অবিকল আর সকলের মত। শুধু শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কেন, দরকার হলে যাগযজ্ঞ পর্যন্ত করাতে হবে।

আর সকলের সাথে কোনও তফাত কি আর আছে তার?

পরীর হয়ে সেদিন সায় দিয়ে ওঠা মাত্র পলকে ওষুধের বাক্সটা নামিয়ে রেখে এক হাতে তার আরেক হাতে পরীর চুলের মুঠি ধরে দুজনের মাথাটা একসাথে ঠুকে দেয়নি গুইরাম?

পরীকে জোর করে ইনজেকশন দেওয়ার সময় আর-সকলের সাথে তাকেও কি চেপে ধরতে হয়নি পরীকে—গুইরাম তখনও তার চুলের গোছা ধরে থেকে ওই হুকুম করেছিল বলে?

গুয়েগুণ্ডাও যার গায়ে হাত তোলে, ভগবান ছাড়া তার গতি কি!

অবিকল কুন্দদের মত!

তা খরচখর্চা করে ভগবানকে খুশী করতে পারলে ফল যে পাওয়া যায়—সাত দিনেই হাতেনাতে তার প্রমাণ পেল সাবিত্রী।

চমকটা সে সেকেণ্ড দশেককে সামলে নেয়।

এত সহজে এমন নাটকীয় চমক সামলানো মুশকিল যদিও, তবে কদিন ধরেই সাবিত্রী কিনা—মালার মত ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা পেয়ে গেছে যে-সাবিত্রী—এই রকম একটা ঘটনার কথাই ভাবছিল, ভাবার চোটে জেগে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন পর্যন্ত দেখা শুরু করেছিল, তাই দশ সেকেণ্ডেই সামলে বলে, এসো।

একবার ভাবলুম জিজ্ঞেস করি, কিন্তু প্যাসেঞ্জের মুখে লোকটা 'কোথা যান' 'কোথা যান' করে উঠতেই রোখ চেপে গেল—ডাঁটের মাথায় তখন হনহন করে—

বেশ করেছ।

ভাবলুম, কী দরকার জিজ্ঞাসাবাদ করে। হয়ত সাত সতেরো কৈফিয়ত চেয়ে বসবে, আগে তো দেখেনি, জানাজানি হয়ে গিয়ে শেষে—

কৈফিয়ত না চাইলেও কমিশনে ভাগ বসাত।

কমিশন!

বাঃ! ওর মারফত এলে চার ভাগের এক ভাগ ওকে—

সুবর্ণ!

দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো।

ভুজঙ্গ তবু বসে না। বেকুবের মত চেয়ে থাকে। ধর্মসাক্ষী বউটাকে চিনতে স্বামীটার যেন বিতিকিচ্ছিরি কষ্ট হচ্ছে। নাক-মুখ ইত্যাদি হুবহু এক থাকা সত্ত্বেও।

সাবিত্রীও চায় চেয়ে থাকতে। ভুজঙ্গর চোখে চোখে। চোখ দুটি ঢুলুঢুলু করে মুখে হাসি টেনে এনে, বিনুনি দিয়ে গালে সুড়সুড়ি দিতে দিতে। কোমরটাকে অনর্থক একটা পাক খাওয়াতেও চায় সাবিত্রী।

আপসোস, এর একটাও তার সাধ্যে কুলোয় না।

আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি, স্বর্ণ।

কতক্ষণ বসবে? প্রশ্ন করেই সাবিত্রীর খেয়াল হয়, ঠিক এইভাবে এই কথাটা সে জিজ্ঞেস করতে চায়নি।

মানে?

তাহলে বলে আসতে হবে কিনা। কিন্তু প্রশ্ন যখন করা হয়ে গেছে, জের টেনে চলতেই হয়। রীতরেওয়াজ মেনে চলতে হবে না? গুইরামকে এটা জানিয়ে আসা দরকার নয়? গুইরামের মারফত আসেনি যখন।

ভুজঙ্গকে চুপ করে থাকতে দেখে সাবিত্রী ফের জিজ্ঞেস করে, কতক্ষণ বসবে বললে না?

যদি বলি, অনেকক্ষণ।

বেশ।

যদি বলি, সারা রাত।

বেশ।

যদি বলি, আর যাব না।

সাবিত্রী চুপ করে থাকে।

যদি বলি, তোমায় আমি নিয়ে যেতে এসেছি, স্বর্ণ। হ্যাঁ, সোনা—তোমায় আমি ফিরিয়ে নিতেই—

সাবিত্রী মুখ ফেরায়।

হ্যাঁ গো—আমি তোমায় ফিরিয়ে নিতেই—। পেছন থেকে কাঁধে হাত রাখে ভুজঙ্গ।

সাবিত্রী সরে দাঁড়ায়।

বিশ্বাস করছ না? তা কী করেই বা আর বিশ্বাস করবে! গলা ভারী হয়ে আসে ভুজঙ্গর। যে-বিশ্বাসঘাতকতা তোমার সাথে করেছি—ও কি, চললে কোথায়?

ভুজঙ্গর দিকে বারেক তাকিয়েই সাবিত্রী বেরিয়ে যায়।

'বলে আসি।' বলে অবশ্য।

ভুজঙ্গর ওই কাঁদ-কাঁদ মুখ, ছলছল চোখ আর ভাঙা-ভাঙা গলা—এ যে কী মারাত্মক!

ভুজঙ্গর চেয়েও কী ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতক!

বারান্দার দেয়ালে শরীর সঁপে দাঁড়ায় সাবিত্রী।

কী নিষ্ঠুর লোকটা! কী হৃদয়হীন!

এততেও সাধ মেটেনি?

ফিরিয়ে নিতে এসেছে?

ওই কাঁদ-কাঁদ মুখ আর ছলছল চোখ দেখে, আর ভাঙা-ভাঙা গলার স্বর শুনে—কথাটা সত্যি বলেই মনে হয় বটে।

সত্যি বলে!

মন তার সত্যিকারের মানুষটার পরিচয় হাড়ে হাড়ে পেয়ে থাকলেও:

তিনদিন কথা বন্ধ রেখেও একদিন যখন ঠিক ওইভাবে এসে বলেছিল, বড় দুঃসংবাদ আছে, সোনা! মানিকের কাছে সব শুনলাম। শুনেই ছুটে আসছি! ওঁরা সবাই পাঁচদিন হল শিয়ালদয় পড়ে আছেন। স্বর্ণ গ্রাহ্যও করেনি। নিজের জীবন যার রিফুজীর বাড়া, তার বাপ-মা-ভাই-বোনের কি হল না হল তার কী এসে যায়?

ছি সোনা, এখনও আমার ওপর অভিমান করে থাকা সাজে? সব শুনে আমার মনের অবস্থা যে কী হয়েছে!

গলার স্বরে মুখ ফিরিয়েছিল।

অবনীদা আর বৌদির—! চোখ ভুজঙ্গর জলে ফাটো-ফাটো হয়ে এসেছিল, মুখ হয়ে উঠেছিল কাঁদ-কাঁদ। চলো সোনা, ওঁদের আমরা নিয়ে আসি। হাত ধরে ভাঙা-ভাঙা গলায় বলেছিল।

ভুজঙ্গর চেয়েও বিশ্বাসঘাতক ভুজঙ্গর এই কাঁদ-কাঁদ মুখ, ছলছল চোখ, ভাঙা-ভাঙা গলা—গেঁয়ো বাঙাল মেয়ে স্বর্ণকে এমন আহাম্মক বানিয়ে দেয়! এমন ভুলই করিয়ে দেয়!

নয় ভুল ? নইলে মুখে যতই তড়পাক, বাড়ির মধ্যে যাই করুক—সত্যিই তো আর বাড়ি থেকে বার করে দিতে পারত না ? ভদ্রপাড়ার বাসিন্দা ভদ্রলোক স্বামী।

ওই ছুতোয় তাকে বার করে এনে তারই নামে পাল্টা দুর্নাম রটিয়েও অবশ্য উধাও হয়েছিল : লোকে দেখুক, ভালোবেসে-বিয়ে-করা বাঙাল মাগীটার কেলেঙ্কারির জন্যে অমন সুন্দর সুপুরুষ শিক্ষিত ভদ্রলোকটাকে কেমন বিবাগী হয়ে যেতে হল !

কিন্তু গোপনে বাড়িওলাকে বাড়ি ছাড়ার নোটিশের সাথে একমাসের ভাড়া আগাম দিয়ে ভুজঙ্গ কেন বেপাত্তা হয়েছিল, শৈলর সাথে কোনদিন আর দেখা না হলেও বুঝতে আদৌ বাকি থাকেনি গেঁয়ো-বাঙাল মেয়ে সুবর্ণর।

সিঁড়ি দিয়ে নামে সাবিত্রী। প্যাসেজের মুখ থেকে গুইরামকে ডাকে।

আজ আর কাউকে—।

এই মাত্তর যে— ?

হ্যাঁ।

চেনাজানা বুঝি ?

কত দিনের !

তাই অমন গটমটিয়ে গেল। পাক্কা কাপ্তেন ! যাক, মাঝখান থেকে আমিই শালা ফাঁক পড়লুম।

না, গুইদা, ফাঁকি আমি কাউকে দেব না।

সে তোর ধম্ম। ছাখ—যদি শালার একটা বাঁধা ব্যবস্থা করতে পারিস। দিনকাল বড্ড খারাপ রে !

দেখি !

ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছে গুইরাম। হাজার হলেও গুয়েগুণ্ডার মত আপনজন কে আছে আর ? মারতেও সে, রাখতেও সে।

হাজার ভুজঙ্গর চেয়ে একটা গুয়েগুণ্ডা অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য। সাবিত্রীদের।

শনি-রবিবারের বাবু সকলেরই আছে। পরীরও এতদিন ছিল, ওমাস থেকে কেটে পড়েছে। টের পেয়ে গিয়েছিল বুঝি।

তারই শুধু ছিল না। ইচ্ছে করেই সে-ব্যবস্থা করেনি।

মাসের প্রথম শনিবার কি সুবর্ণ থাকতে পারবে? লাখ-কোটি টাকা দিলেও?

শুধু মাসের প্রথম শনি-রবিবার কেন, বাঁধাবাঁধি কোন নিয়মের মধ্যে?

বড় রাস্তা পেরিয়ে ইস্কুলে যেতে হয় ফনীকে। বড় রাস্তা পেরোতে গিয়েই অবিনাশের ওই অবস্থা। অবিনাশ তবু একটা পা খুইয়ে বেঁচে আছে, কিন্তু তৃপ্তির ভাইটা? ইস্কুলে যেতে গিয়েই না বড় রাস্তায় সরকারী বাসের তলায় চলে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল?

ভগবান না করুন, ধরো, হঠাৎ যদি কোনদিন—?

খবর পাওয়া মাত্র তো পড়ি-মরি করে ছুটতে হবে? মাসের যে-কোনদিন। যে-কোন বার। যে-কোন সময়। খবর পাওয়া মাত্র।

পান থেকে চুন খসলে বাঁধা-বাবুদের মেজাজ যা এক-একখানা হয়ে ওঠে!

আজ আর সে-সমস্যা নেই। মাসের প্রথম কেন, কটা শনিবার পেরিয়ে গেল, কেউ একটা খোঁজ নেয়নি!

আর নেবেও না।

লাখ-কোটি দূরে থাক, মাসান্তে ঘরভাড়ার ভাবনাটা যদি ঘোচে, তাই বা মন্দ কি।

খাটে গ্যাঁট হয়ে বসে ছিল ভুজঙ্গ, বসে বসে ঘরের শোভা দেখছিল—সাবিত্রী ঢোকা মাত্র সোহাগভরে ডাকে, কাছে এসো, সোনা। কত কথা তোমায় বলার আছে!

সাবিত্রী কাছে আসে। পাশে বসে। ভুজঙ্গ হাত বাড়াতেই দুটি হাত তার কোলে তুলে দেয়।

খুব রোগা হয়ে গেছ কিন্তু।

তাই নাকি! সাবিত্রী মুখ টিপে হাসে। তুমিও।

আমিও? সত্যি?

সত্যি? ও-কথার জবাবে এ-কথা বলা উচিত নয়? উচিত যখন, সত্যি নিশ্চয়। ভুজঙ্গর সুন্দর চেহারাটা সাহেবী পোশাকে সুন্দরতর দেখালেও বউয়ের সাথে সাথে সে-ও রোগা হয়ে গেছে শুনলে খুশী হয় যখন—নির্ঘাত তখন রোগা হয়ে গেছে: ফি শনিবার চক্রবর্তীকে তার শরীর নিয়ে নানা উপদেশ দেয় না কুন্দ?

ভুজঙ্গর টকটকে-রঙ নিটোল হাতের রেশম-নরম লোমগুলির ওপর হাত বুলোয় সাবিত্রী। খামচি মেরে এক মুঠো লোম ছিঁড়ে আনার জোরালো সাধটা দাবিয়ে রেখে অতিকষ্টে।

কটা বছর যে কী করে কেটেছে, সোনা! ইচ্ছে করে চাকরি ছাড়লাম, বাংলা দেশ ছেড়ে চলে গেলাম—কিন্তু একটি দিনের তরেও এক ফোঁটা শান্তি যদি পাই!

চাকরি আর পাওয়া হয়নি বুঝি?

তা কেন। আরেকটা ব্যাঙ্কে চাকরি নিয়েই তো ম্যাড্রাস গিয়েছিলাম। মাইনেও আগের চেয়ে বেশি। কিন্তু, সুবর্ণর দুটি হাত আঁকড়ে ধরে ভুজঙ্গ বলে, কিন্তু চাকরিতে পেট ভরলেও মন কি মানে গো। বিশেষ করে এত বড় অন্যায়ের বোঝা যার মনকে চব্বিশ ঘণ্টা কুরে কুরে—

ভরা পেটেও মন মানে না? ঠাট্টাই যে করতে শিখেছে! পটলির কথা না হয় বাদই দাও—দুপুরে পেটে দুমুঠো পড়তে না পড়তে রাতের বঞ্চিত ঘুমটা সাবিত্রীকে পর্যন্ত কী ভীষণভাবে জড়িয়ে ধরে যদি জানত মানুষটা! মনকে কেমন বেপাত্তা করে দেয় জানত যদি!

অবশ্য জানাবে কী করে? সুবর্ণ নিজেই কি এতদিন জানত যে বাড়ির ভাবনা মুলতুবি রাখলে আর কিছু ভাবার থাকে না বলে পাঁচ বছরের বঞ্চিত ঘুমটা একেবারে মাথায় উঠে বসবে? থেকে থেকে খালি ঘুম পাবে? স্থানকাল বিবেচনা না করে?

খদ্দের হাত ধরে থাকা সত্ত্বেও সেই অবাধ্য ঘুমটা কিনা এখনই উঁকি-ঝুঁকি মারা শুরু করেছে? কখন হাতের বদলে মাথাটা তার কোলে টেনে নেবে—মওকা খুঁজছে?

ভুজঙ্গ বলে, অনেক কষ্টে তোমায় ফিরে পেয়েছি, সুবর্ণ!

ঠিকানাটা পেল কার কাছে? দুলাল? ননী? নাকি খোদ অবিনাশই—?

ঠিকানা জোটানো হল কী করে? চটুল হেসে সাবিত্রী সুধায়। কানামাছি খেলায় যেন জোচ্চুরি করে কেউ বলে দিয়েছে। কে বলে দিয়েছে টের পেয়েও স্পষ্টাস্পষ্টি জানতে চাইছে। যেমন চায় আন্ধেরে খেলুড়েরা।

মন চাইলে কি—

মুখ ফুটে চেয়েছিলে কার কাছে? দুলাল? ননী? নাকি বাবাই—

ওকথা থাক। ইয়ে—তোমার কপালে ও কিসের দাগ? ঈশ! দেখি দেখি।

ও রাজটীকা।

রাজটীকা?

মানে রানীটীকা! একদিন মাল টেনে যা মাতলামো—

সোনা! ওকথা আর নয়। ওসব কথা তুলো না গো, তুলো না!

কার কাছে ঠিকানা পেলে বললে না?

ফের! নাক টিপে দেয় ভুজঙ্গ।

সাবিত্রীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝনঝন করে ওঠে: ভোলেনি! সেদিনের সেই সামান্য ঘটনা আজও ভোলেনি!

নৌকায় যেতে যেতে নিঃশব্দে কাঁদছিল: ফনীর কী হবে? ফনীকে এখন কে দেখবে? কেন এটা আগে খেয়াল হয়নি?

এ কী করে বসল! বরের জন্যে এত ক্ষেপে গিয়েছিল!

হঠাৎ—

সেই প্রথম। উনিশ বছরের কুমারী জীবনে সেই প্রথম।

সর্বশরীরেব সে কী ভয়ঙ্কর হঠাৎ-শিরশিরানি! মাঘ-রাত্রির প্রচণ্ড শীতে আচমকা কেউ যেন পুকুর থেকে একটা চোবানি দিয়ে তুলল। চোখের পলকে।

কান্না উবে গিয়েছিল: কী সর্বনাশ। অসহ্য একটা আবেগে ছটফটিয়ে উঠে সামনে-পেছনে তাকিয়েছিল: ঝাঁপ ফেলা থাকলেও ফাটা-ফুটোর মধ্যে দিয়ে মাঝিটা—

কেউ দেখেনি গো, দেখেনি। নৌকোর মাঝিমাল্লার অত ভাগ্যি হয় না। বলতে বলতে ফের মুখ বাড়িয়েছিল। জড়সড় হয়ে সে সরে বসেছিল ।

কিন্তু কত আর সরবে? নৌকোর মধ্যে?

এবং এমন লোভী! আর বেহায়া! সাধ কিছুতেই মেটে না।

নৌকো স্টিমারঘাটে এলেও না।

দুলালের মামা মানিক পাড় থেকে ডাকাডাকি শুরু করলেও না।

এই শেষ! আর একটা—ব্যস!

আদেখ্‌লা! অথচ নিরুপায়! তার গায়ে আর কতটুকু জোর! আরেকজন —ডাকাত! লম্বা-চওড়া সুন্দর-সুপুরুষ যদিও—তবু ডাকাত!

কিন্তু ভদ্রলোক ডাকাত তো? নিজের জিনিস নিজেব পাওনা নিজেই ডাকাতি করছে তো? সুতরাং কী আর করা!

আর একটিমাত্র—এই—

ভেবেছে কি! দুলালের মামা জলে নেমে আসছে। মণিরুদ্দি লাফ দিয়ে নৌকা থেকে নামল। শহুরে রাক্ষসটা তার গ্রামে আসা বন্ধ করবে নাকি?

চোখ কুঁচকে সুবর্ণ বলে, ফের!

হ্যাঁ, ফের! ফের! ফের! নাক টিপে চোখে জল এনে দিয়েছিল।

এবং নতুন একটা বাড়াবাড়ি করে বসেছিল। অকথ্য রকমের আনন্দদায়ক অসভ্য রকমের বাড়াবাড়ি। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝনঝন করে উঠেছিল। রক্তের তোড়ে বুকটা চৌচির হতে চাইছিল।

সুবর্ণও কিন্তু ছেড়ে কথা কয়নি—শুম করে পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিয়েছিল।

হ্যাংলোচ! ছোটলোক! চাষা!

কিন্তু, সেই ফের-এ আর এই ফের-এ তফাত অনেক!

চোখে-জল-এনে-মন-ভরে-দেওয়ার-মত নাক টেপার বদলে নাকে শুধু দুটি আলতো আঙুলের চাপ দিয়েছে এখন। একবার শুধু ফের বলেছে। বলে সেদিনের

সেই অকথ্য আনন্দদায়ক অসভ্য রকমের বাড়াবাড়ি করার বদলে দূরে বসে আলতোভাবে তার চুড়ি চূর কঙ্কন বালা রুলি মানতাসা নিয়ে টুংটাং শুরু করেছে।

কে জানে, নাকছাবির হীরেটা টুসকি দিয়ে যাচাই করে দেখার জন্যেই 'ফের' বলেছে কি না।

গয়নার টুংটাঙে এমনই মশগুল যে এখন যদি সাবিত্রী গুম করে পিঠে একটা সোহাগের কিল বসিয়ে দেয়, আঁতকে উঠে বিষম খেয়ে দম বন্ধ হয়ে মারাই হয়ত যাবে।

সব সোনার ?

কী মনে হয় ?

মনে তো হয়।

তাই।

ঠিক ধরেছি।

তাতে আর আশ্চর্য কী! পাকা জহুরী বলে ভয়ানক যার গর্ব ছিল। অবাক হবে, না হবে না সাবিত্রী ?

একদিন কিন্তু অবাক হয়েছিল। ভারি মিষ্টি অবাক।

আমি ভুল করিনি। উঁহুঁ। একটুও ভুল করিনি।

দিন নয় সেটা, ফুলশয্যার রাত।

কোনমতে নমো নমো করে লৌকিকতা সারা হয়েছে। আত্মীয়-স্বজন তেমন নেই। যা দু-চারজন আছে, দূরে দূরে। কলকাতার কয়েকটি বন্ধুবান্ধব খেয়ে-দেয়ে বিদায় নিয়েছে।

অনেক দূরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কে যেন কাঁদছে।

কে আর কাঁদবে—শৈল।

দূরে নয়—পাশের ঘরে।

খানিক আগেই বিছানা তার ফুলে ভরে দিয়ে ফুলের সাজে তাকে সাজিয়ে দিয়ে গেছে যে-শৈল। নিজে-টাকা-দিয়ে-মানিককে-দিয়ে-কিনিয়ে-আনা ফুলে।

শৈলর সে-কান্নার মানে সেদিন বোঝেনি। বোঝার অবসর ছিল না।

আলোয় মুখখানা তার তুলে ধরে ভুজঙ্গ বলেছিল, আমি ভুল করেনি। উঁহুঁ। একটুও ভুল করিনি। পাকা জহুরী আমি।

জহুরী কথাটার মানে সে-রাতে বোঝেনি সুবর্ণ—সুবর্ণ মানে যে সোনা তা জানত না বলে।

সেদিন কোন কিছুরই মানে জানার গরজ ছিল না—শৈলর কান্নারও না, ভুজঙ্গর জহুরীপনারও না।

শ্বশুর-শাশুড়ী ননদ দেওর কিছু না থাকায় সবাইকে ছেড়ে এসে বড্ড মন কেমন করবে বলে প্রথমে মুষড়ে পড়লেও তখন শুধু মনে হচ্ছিল—কী ভাগ্যি কেউ নেই! আশ্রিত একটা বৌদি ছাড়া!

নইলে কাল সে মুখ দেখাত কী করে? এরপরও মুখখানা তার আস্ত থাকবে?

এমন খুনেও হয় মানুষে! এক ফোঁটা মায়া-দয়া নেই!

সুবর্ণ দয়াব ভিখারি নয় বলে কি নিজের একটা আক্কেল-বিবেচনা থাকতে নেই!

ও কি সোনা, চোখে জল এসে গেল?

তাড়াতাড়ি মুখ ফেরাতে হয়েছিল: কিচ্ছু বোঝে না! বোকাটা! মিছেই দেখতে অমন লম্বা-চওড়া। চোখে জল কি শুধু দুঃখেই আসে মানুষের? মেয়েমানুষের? ভেবেছে—ওর গায়ের জোরের কাছে কাবু হয়ে পড়ে কেঁদে ফেলেছে গেঁয়ো মেয়েটা। ভারি গায়ের জোর দেখাচ্ছে! কত জোর গায়ে—দেখবে নাকি সে-ও পরখ করে? চিনুর বরেব মত ছাড়বে নাকি নাজেহাল করে হাব মানিয়ে পায়ে ধরিয়ে শেষ পর্যন্ত?

ভুজঙ্গর চোখ দুটি চকচক করছে। পাকা জহুরী ভুজঙ্গর।

সব সোনার? অ্যাঁ? ওই আর্মলেট? গলার হারটা, দুটো হারই—কানের ওই ইয়ে কী বলে—সব?

সব নয়।

তবে?

হাতেরগুলি ব্রোঞ্জের।

তাই বলো!

বাকিগুলি গিল্টির।

গিল্টির? তবে যে বললে—

গিল্টি সোনা নয়? আসল না হলেও নকল সোনা নয়?

তা বটে। পাকা জহুরীর চকচকে চোখ ঘোলাটে হয়ে যায়। যাক, যা বলছিলাম—বাড়ি আমি ঠিক করে ফেলেছি, সুবর্ণ। একেবারে ছ মাসের ভাড়া আগামও দেওয়া সারা।

কেন? ছ মাসের ভাড়া আগাম দিয়েছে কেন? পাছে ফের বাড়ি পাল্টানোর গরজ দেখা দিলে ভাড়ার লোভে না যেতে পারে?

আজ রাতেই গোছগাছ করে নাও। কাল ভোরেই—

রাতের পর ভোর। রাতটা আগে কাটুক। রাতের কথা ভোরে ভুলে যেতে মনে করিয়ে দিতে হবে না। কাউকেই হয় না।

সাবিত্রী বলে, কোট খোল।

হ্যাঁ। ধড়াচূড়া খুলি। বড্ড অস্বস্তি লাগছে।

খুবই স্বাভাবিক। এতক্ষণ যে কী করে হাত গুটিয়ে দূরে বসে আছে সেটাই বরং আশ্চর্য। এমন তো কেউ থাকে না। টাকাটা এখনও দেয়নি বলে কী?

ধুতিটুতি নেই বুঝতে পারছি। একটা শাড়িই দাও।

শাড়ি?

বাঃ! শোওয়া যায় ট্রাউজার পরে? ভুজঙ্গ কোট খোলে। ঘুম আসবে তাহলে?

শোওয়া? ঘুম? ছমাসের ভাড়া আগাম দিয়ে বাড়ি নিয়ে সাবিত্রীর শাড়ি পরে শুয়ে ঘুমোবার জন্যে এখানে এসেছে?

বড্ড খিদে পেয়েছে, সোনা।

সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রী হাত বাড়ায়।

কী?

টাকা।

তোমার ভাত নেই? তাই থেকে না হয় অন্নপূর্ণার প্রসাদ হিসেবে দুটি—

ও পাট নেই। সব হোটেল।

অ। তবে ব্যাগ থেকে টাকা নাও। কোটের পকেটে ব্যাগ আছে। কোটটা সাবিত্রীর দিকে এগিয়ে দেয় ভুজঙ্গ।

কোটের পকেটে চড়চড় করে হাত ঢোকায় সাবিত্রী: ব্যাগ তো আছে, পয়সাকড়ি কিছু আছে তো ব্যাগে? তিন পকেটে টাকা ভাগ করে রেখেও পকেট ছুঁতে দেয় না কেউ, পকেটে হাত দেওয়া নিয়েই দুর্নাম রটে গেছে লিলির—আর অবলীলায় এ ব্যাগসুদ্ধ কোটটা তাকে বিলিয়ে দিল?

কী আনাব? ফাঁপানো ব্যাগটা পকেটে মুঠো করে ধরে সাবিত্রী সুধায়, মোগলাই পরোটা, ফাউল?

ধেৎ!

কাটলেট? চপ—

ধেৎ!

চানাচুর আর—

সোনা!

তবে বলো কী খাবে? আমি কী করে জানব—

তুমি জানো না আমি কী খাই? কী খেতে আমি ভালোবাসি?

ভুলে গেছি।

ভুলে গেছ? তার মানে—আমায় তুমি ভুলে গেছ, সোনা?

তোমায় কি ভুলতে পারি! তোমার খাওয়ার পছন্দটাই শুধু ভুলে গেছি। কেন ভুলব না, কতদিন হয়ে গেল বলো তো?

প্রায় হাসি মুখেই টেনে টেনে কথাগুলি বলে সাবিত্রী, তবু তাই শুনে কেমন ঝিমিয়ে পড়ে ভুজঙ্গ।

ঝিমোনো সুরে বলে, ক-ত-দি-ন হয়ে গেল! সত্যি!

সাবিত্রীও পুনরুক্তি করে, মনে মনে, ক-ত-দি-ন হয়ে গেল!

অথচ, আমার কি মনে হয়েছিল জানো, খেতে বসে দেখব—ভাত, মুগের ডাল, মাছের সুক্তো, বড়ি দিয়ে নিরামিষ তরকারি, প্রচণ্ড-ঝাল চচ্চড়ি, কাচা আমের খুব-টক জলের মত অম্বল—

বিনা ব্যাগেই হঠাৎ হাত বার করে আনে সাবিত্রী।

ভাঙা-ভাঙা গলায় থেমে থেমে এক-একটা পদের নাম না করে এর চেয়ে যদি দুহাতে ঠাস ঠাস করে দু গাল তার চড়াতে শুরু করত !

রুদ্ধ স্বরে সাবিত্রী বলে, কেন তুমি ফের জ্বালাতে এসেছ? কেন এলে তুমি? কেন এলে!

আমি মাপ চাইতে এসেছি, সোনা!

জানো না ওসব হোটেলে পাওয়া যায় না?

জানি সোনা। কিন্তু ওসব তো আমি আনতে বলিনি, আমি শুধু বলছিলুম—

কেন? তাই বা কেন বলবে? কেন তুমি—

মনে পড়ে যায় যে! সামনে বসে একদিন এই সব আমায় খাওয়াতে—মনে পড়ে গেল যে! মনে পড়ে সোনা, ঝাল খেয়ে একদিন আমি ছেলেমানুষের মত ছটফট শুরু করছিলুম, আর তখন তুমি নিজে থেকে—

কী নিষ্ঠুর মানুষটা! কী অমানুষ! হৃদয়হীন! ডাক ছেড়ে সাবিত্রীর বলতে ইচ্ছে করে—না না না, কিচ্ছু আমার মনে পড়ে না—কিচ্ছু না! ওগো, আমি ভুলে গেছি—সব, সব, স-ব কিছু! ওগো, আমি তোমার সেই সোনা নই, সুবর্ণ নই—আমি সাবি, সাবিত্রী!

সেদিন যা খেয়ে মুখ মিষ্টি হয়ে গিয়েছিল—। ভুজঙ্গ দুহাত বাড়িয়ে সাবিত্রীকে কাছে টানে।

এবং সাবিত্রী, রীতরেওয়াজ মাফিক অচিরাৎ এসে বুকে এলিয়ে পড়া কর্তব্য যে-সাবিত্রীর, ফাঁদে পড়া পশুর মত ছটফটিয়ে ওঠে।

ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও!

ছেড়ে আমি আর তোমায় দেব না, সুনু!

একটু একা থাকতে চায় সাবিত্রী।

কাল রাতের ঘটনাগুলি যাচাই-বাছাই করতে চায়।

কিন্তু কালকের রাতটা সে আসলে জেগে ছিল তো? নাকি পরশু রাতের ঘুম ভেঙেছে আজ সকালে? পরশুর বেপরোয়া-ফুর্তি-বেচা রাতের।

যাচাই-বাছাইয়ের গোড়াতেই খটকা লাগে। ভুজঙ্গর নামখোদাই সিগারেট কেসটা মুঠো করে ধরেও।

তাই সাবিত্রী করে কি, প্রথমে কেসটায় প্রাণপণে চিমটি কাটার চেষ্টা করে বারকয়েক, তারপর গালে ঠেকায়, কপালে ঠোকে, কামড়ায়। সবশেষে বুকের গোপনে গুঁজে দিয়ে দুহাতে বুকে চেপে রেখে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা কঠিন একটা অস্বস্তি সয় বুক ভরে, দেহ ভরে, মন ভরে।

চোখ বুজে সারাটা দুপুর এইভাবে বসে থেকে ওই ঠাণ্ডা-কঠিন অস্বস্তিটুকু সইতে সইতে সাবিত্রী গত রাতের ঘটনাগুলি যাচাই-বাছাই করে নিতে চেয়েছিল, কুন্দর সাড়া পেয়ে বুঝল উপায় নেই।

আগে থেকে দরজায় যদি খিলটা দিয়ে রাখত!

সাবি।

সাবিত্রী সাড়া দেয় না।

গায়ে নাড়া দেয় কুন্দ। বসে বসেই ঘুমুচ্ছিস?

বিরক্তিটা চমক করে তুলে সাবিত্রী বলে, ধেৎ। ...ওমা, তুই? আমি ভাবলুম বুঝি—

স্বপ্ন দেখছিলি?

হুঁ। মনে হল যেন—

কী মনে হল?

কী মনে হল ? সাবিত্রীও নিজেকে পাল্টা সুধায়। মনে কি কিছুই হচ্ছিল ?

হ্যাঁরে, কী মনে হল বল না ? কপালে খোঁচা মারে কুন্দ। সুধায়, পাছে ঝিমধরা চোখ দুটি সাবিত্রীর ঘুমের মোহে গা এলিয়ে দেয়। কীরে ? কী মনে হল ? কাউকে মনে হল ?

মনে হল চক্কোত্তি বুঝি—

মরণ! সে ঘাটের মড়া—

আমিও তাই ভাবছি—চক্কোত্তি কেন—জানালাটা বন্ধ করে দে না কুন্দদি। চোখে তাত লাগছে।

চক্রবর্তীর নাম করে এখন ফল হবে না। একটু আগেই কুন্দ বেসুরো গলায় গুনগুন গান গাইছিল। অর্থাৎ খুশিতে ভুড়ভুড়ি কাটছে। চক্রবর্তীর নাম করলে রাগের ছলে বেরিয়ে যাওয়ার বদলে তারই গালগপ্প এখন ফেঁদে বসবে। সেই ঘাটের মড়ার হাঁচি-কাশির ফিরিস্তি অবধি শোনানো শুরু করে দেবে।

দে না ভাই কুন্দদি জানালাটা—

ওটা খোলা থাক না। এটা তো বন্ধ আছে।

বললুম না তাত লাগে।

তবে দি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও জানালা বন্ধ করে দেয় কুন্দ। তা এরি মধ্যে শুলি কেন ? এখন ঘুমুলে দুপুরে ঘুম চটবে। চটা ঘুমে গা-গতর ম্যাজম্যাজাবে। মনে হবে আর-একটুকু শুয়ে থাকি। কিন্তু ফের শুয়েছ কি, বিকেল কাবার। তালে না, দুদিনে পটলী। আলোটা জ্বালি রে ?

আলো জ্বালবি ?

দুটি খাব না ?

তা ওতো বটে! ছোট আলোয় হবে না ?

তাই জ্বালি।

নাঃ, ওদিকের জানালাটাই বরং খুলে দে। সব জানালা দরজা বন্ধ করলে দম আটকে আসে।

যাঃ বাবা! খানিক অবাক হয়ে চেয়ে থাকে কুন্দ। তারপর ভেতরের দিকের জানালা খুলে দেয়।

আজ তোর কী হয়েছে বলত? সকাল থেকে দেখছি উল্টোপাল্টা—

মাইরি, আজ যেন আমার কী হয়েছে রে কুন্দদি।

তোরই কিছু হবে আর তুই টের পাবিনি—উঁহু, ভালো কথা না। নিজের ভালোমন্দ নিজেই যদি না বুঝিস—। টিফিন কেরিয়ারের বাটি থেকে থালায় ভাত-তরকারি বাড়তে বাড়তে বকবক করে কুন্দ।

বকবক নয়, উপদেশ।

ইদানীং সাবিত্রীকে কুন্দ বড় আপন করে নিয়েছে কি না।

দুপুরে মালার ঘরে থাকে মানদা। পটলীর দরজার থাকে খিল। খাওয়াদাওয়া সেরেই ঘরে চাবি দিয়ে বেরিয়ে যায় লিলি। বিপিন আসার পরের দিন থেকে সকলের ওপর বিগড়ে আছে পরী। সকালে ঘুম ভেঙেই সে বোতল নিয়ে বসে। ঘরের দরজা অবশ্য খোলাই রাখে, কিন্তু উঁকি মেরেছে কি তড়াক করে উঠে দাঁড়াবেঃ কী চাই? সত্যি সত্যি তার খারাপ রোগ হয়েছে কি না দেখতে এসেছ? দেখ দেখ—তবে দেখে যাও!

কুন্দদেরও তখন পালিয়ে না এসে উপায় থাকে না।

নিজের একখানা ঘর যদিও আছে কুন্দর, কিন্তু অত কষ্টের ধোওয়াধুয়ির পর ওঘরে হাটা-চলা করতে পা টেনে ধরে না?

কুন্দর উপদেশের উদ্দেশ্য সাবিত্রী বোঝে। একবার ভাবে, বলে, আপন জনের মত এভাবে উপদেশ না দিলেও মেঝেয় তোকে আমি পড়ে থাকতে দেব কুন্দদি, চাইলে খাটেও উঠে আসতে পারিস—কিন্তু দোহাই তোর, বকবকানি থামা। বকবক করে কানের পোকা বের করিসনি। কটা কথা আমায় ভাবতে হবে, একটু রেহাই দে।

এতদিনেও সে এ লাইনের অনেক কিছু জানে না বটে, জানতেও আর চায় না। জানার গরজ আর নেই তার।

সাবিত্রী বলে, সারা দুপুর কি আমি ঘুমুইরে। চোঙাভরে চা রাখি সাথে

ওই! ভারি এক চা চিনেছিস। বেশি চা খেলে কী হয় জানিস? বললে তো বিশ্বেস করবিনি, নইলে এই কুন্দলতারও রঙ এককালে—

বাধা দিয়ে সাবিত্রী বলে, রঙে কী যায় আসে। আজও তোর পাশে কেউ দাঁড়াতে পারে? মালা যে মালা—

ঠাট্টা হচ্ছে?

ঠাট্টা! দু-চারটে চুল না পাকলে তোর মত—

পাকা চুল? আমার? কুন্দ প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে। ভাতের গ্রাস মুখে তুলছিল, হাঁ-করা মুখটা তার হাঁ হয়েই থাকে—হাত থেকে ভাতগুলি ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে।

দু-চারটে চুল পাকা তো ভালোইরে। তাহলে বেশ—

অনাছিষ্টি কথা বলিস নি বাপু। পাকা চুল? আমার মাথায় পাকা চুল? কই, দেখা—একটা পাকা চুল তুই বের কর দিকি। ডুড়দাড় করে উঠে আসে কুন্দ। সাবিত্রীর কোলের মধ্যে মাথাটা একরকম ঠেসে দেয়। বের কর পাকা চুল।

কুন্দর তেল-চপচপে ভেজা চুল ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে সাবিত্রী ভাবে—এ যে হিতে হল বিপরীত! ভোরবেলা সে কুন্দকে আয়নায় দাঁড়িয়ে পাকা চুল বেছে বেছে ছিঁড়তেই দেখেছে বটে, কিন্তু সেকথা এখন বললে উপায় থাকবে! গুয়েগুণ্ডাকেই হয়ত নালিশ জানিয়ে বসবে: দরজা ভেজানো থাকলেও কেন তার ঘরে সাবি উঁকি দেয়?

দেখেছ মাগীর কাণ্ড—পাকা চুল তুলতে গিয়ে আধপাকাকেও রেয়াৎ করেনি! চুল ঘাঁটতে ঘাঁটতে গা গুলিয়ে ওঠে সাবিত্রীর।

অথচ তখন মনে হয়েছিল—রগের পাশের কয়েকটি পাকা চুলের জন্যে কেন কুন্দদি এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে? চক্রবর্তী কিছু বলেছে? ঘাটের মড়া কি জানে না যে বয়সের যা?

তার না জানাই স্বাভাবিক। বুড়ো হয়ে মরতে বসেও যার যৌবনের জের কাটে না, সে কী করে জানবে সুভাষিণীর বয়েসী কুন্দকে সুরমার সাজগোজে কী কুৎসিত দেখায়?

লাল পাড় শাড়ি গলায় বিছেহার নাকে নাকছাবি হাতে ক্ষয়ে-যাওয়া ক গাছা চুড়ি আর লোহা-শাঁখা পরে, রগের কাছে সোনালী-রূপালী কয়েকটি চুল নিয়ে, একা-ঘরে-আয়নায়-নিজের-মুখ-দেখতে-গিয়ে ধার-পড়ে-যাওয়ার-লজ্জায় একবার যদি তার দিকে চেয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিত কুন্দ, নির্ঘাত সাবিত্রী ছুটে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরত। সুভাষিণী বলে ভুল করে।

শাড়ি-গয়না-টয়না অবিকল ওইরকম তো তখন পরে ছিল কুন্দ ?

ঠিক ওইরকম একটা কাণ্ড তো একদিন করে বসেছিল সুবর্ণ ?

কি রে, পেলি ?

দেখি না তো।

তবে ? এমন কু ডাক ডাকিস ! বলি, কী আমার বয়েস হয়েছে লা যে শনবুড়ি হতে গেলুম ?

হাত চাটতে চাটতে কুন্দ গিয়ে ফের খেতে বসে।

কুন্দর খাওয়া দেখতে দেখতে সাবিত্রী ভাবে সুভাষিণীর কথা। সুভাষিণীর কথা ভাবতে গিয়ে মনে পড়ে যায় আর সকলের কথা।

নিজের কেলেঙ্কারির কথা।

নয় কেলেঙ্কারি ? শেষরাতে চোরের মত পালিয়ে আসার চেয়ে বড় কেলেঙ্কারি আছে নাকি ?

মন্মথ সিকদারের অবস্থা দেখে সে-ই না একদিন কুমুর ওপর চটে গিয়েছিল ? কী স্বার্থপর কুমুটা ! কুমু না দাদাকে বাপের মত ভালোবাসত।

কী স্বার্থপর সে-ও। শুধু নিজের কথাই ভেবেছে, ভেবে দেখেনি ওভাবে চলে এলে ওদের অবস্থাটা কী দাঁড়ায় ? ছেলেমেয়ের কাছে কী করে বাপ-মা মুখ দেখায় ? পাড়ায় ভাইবোনগুরিই বা কী অবস্থা হয় ?

গলিতে ঢুকতেই সেদিন দেখা হয়েছিল অজয় আর মেনকার সাথে : 'এই আসছ দিদি ? তোমার না শনিবার আসার কথা ছিল ?' 'কদিন দেরি হয়ে গেল ভাই। হঠাৎ ওঁর সর্দি-জ্বর হওয়াতে—।' 'যাও, কাল সকালেই হানা দিচ্ছি।' 'এখনই এসো না।' 'এখন ! তা—দেখ না—সিনেমায় টেনে নিয়ে চলেছে !'

'ও, বন্ধুকে দেখেই বুঝি সিনেমার শখ মিটে গেল? আর কাল সারাটা রাত যে আমায়—।' 'ঈশ! নিজেই বলে ও-হপ্তা থেকে খোসামুদি করে করে—।' 'কী মিথ্যুক মেয়েরে বাবা! আমি খোসামুদি করেছি? না তুমিই ঘুষঘাষ দিয়ে—।' 'এঃ! ঘুষ দেবেন! ওঁকে! কী আমার ঘুষ দেওয়ার পাত্তররে!' 'অবিশ্যি ঘুষ দেওয়ার তেমন সুপাত্র যদি থেকে থাকে, জানি না তো, তাহলে—।' 'শোন দিদি শোন—ইতরের মত কেমন যা-তা—।'

রাস্তার মাঝখানে স্বামী-স্ত্রীর কথা কাটাকাটি বড ভালো লাগছিল। একবার এর একবার ওর মুখের দিকে চেয়ে মুখটা বুঝি তার মিটিমিটি হাসছিল। হাসতে হাসতে বেখেয়াল হয়ে পড়েছিল, মেনকার কথায়—ন:ন করে হাসে।

'তোমারই তো দোষ ভাই। তুমিই তো আগে—।' 'ওমা! তুমিও ওর দলে?' 'উনি ন্যায়ের দলে? তোমার মত সবাই! বেশ, কত মনের জোর দেখি—যাও তুমি ওঁর সাথে, টিকিট আমি গিয়ে বেচে দিচ্ছি।' 'পারিনে ভেবেছ? তোমার ওই কাঁদুনে বই দেখার চেয়ে দিদির সাথে গপ্প করা ঢের ঢের ভালো। নাকি বলো দিদি? লোকে সিনেমায় যায় দুদণ্ড ভুলে থাকার জন্যে। তা না—।' 'তাহলে কষ্ট করে অতদূর না গিয়ে সিদ্ধির ডেলা গিলে ঘরে বসে থাকলেই চলে?' 'চলেই তো। তোমার ওই ছাতার চেয়ে—।' 'সিদ্ধির চেয়েও ভালো হয় এক ভাঁড় তাড়ি টেনে যদি—।' 'শোন দিদি শোন, সাধে ইতর বলি! দিদির সামনে এসব কথা বলতে লজ্জাও করে না?'

চমক লাগে। হাসিটা বেমালুম উবে যায়। মুখের চামড়া টান-টান হয়ে আসে। তাড়াতাড়ি 'আমি চলি, তোমরা ঝগড়া করো' বলে হাঁটা শুরু করে দিতে হয়।

পরের বরের গল্প শোনার বড শখ মেনকা-বউয়ের। বরের মাইনে না বাড়া পর্যন্ত মা হবার উপায় নেই যে-বউয়ের।

নিজের বর নিয়ে কত রোমাঞ্চকর গল্পই যে তাকে শোনাত সুবর্ণ! শোনাতে হত!

হাঁ করে তো শুনত মেয়েটা, বিশ্বাস করত কি?

করত নিশ্চয়। নইলে হঁা করে শুনবে কেন?

আর, মেনকার বিশ্বাস করা মানে, অবিনাশের সেই কথাটা মিথ্যে। মিথ্যে না হলেও অতখানি সত্যি নয়। সবাই সেকথা জানলেও মেনকা অন্তত জানত না। সে নিয়ে পাড়ায় কানাঘুষো হয়ে থাকলেও দানা বাঁধতে পারেনি।

তা অমন কানাঘুষো তো বেলেঘাটাতেও হয়েছিল। তার চেয়েও মারাত্মক ব্যাপার সেখানে ঘটেছিল।

কিন্তু নিজে থেকে তারা চলে না এলে কী আর এমন হত? দুদিন বাদে আপনা থেকেই সব বন্ধ হয়ে যেত। প্রথম প্রথম জবাকে নিয়েও কম কানাঘুষো হয়েছিল?

ওর পরেও তো জেল থেকে ছাড়া পেয়েই হাওড়ায় এসেছিল গৌর? আসা-যাওয়া করতও?

ঘরের বার হলে মেয়েদের নিয়ে নানান কথা রটে। মিথ্যে হলে কান দিতে নেই, সত্যি হলে দুদিন সয়ে যেতে হয়। কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে এলে স্নান-খাওয়ার জন্যে কান্না বাতিল করে দেওয়ার মত দুদিন পরে নিন্দে-রটানেওলারাও হাল ছেড়ে দেয়। দিতে বাধ্য হয়। মানিয়ে নিতে হয়। অত সময় কোথায় শহুরে মানুষের? শহর কলকাতার এই রেওয়াজ।

রীতরেওয়াজ শুধু মানী বাড়িউলীর একেচেটে নয়।

মালা এটা মানতে চায় না। লিলিও না। কুন্দ, পরী চায় কিনা স্পষ্ট বোঝা যায় না। চাক না চাক—মানিয়ে কি ওরা সবাই নিচ্ছে না? বাপ-মার ওপর তেজ দেখিয়ে এসে স্বর্ণও?

চুলের মুঠি ধরে মাথা ঠুকে দিলেও সেদিন বিকেলেই তো গুয়েগুণ্ডার সাথে যেচে কথা বলেছে? বলতে হয়েছে? কথা বলতে বলতে হেসেওছে? হাসতে হাসতেই কথা বলেছে?

অথচ তারই জন্যে ওদের না জানি কী অবস্থা আজ। রাত পোয়াতে না পোয়াতেই নির্ঘাত হাজির হয়েছিল মেনকা, ননদকে হেঁশেলে ঠেলে দিয়ে। যা আড্ডাবাজ মেয়ে!

ঘুম-খাওয়া বাড়িতে এসে মেনকা যখন শুনল শেষ রাতে সে—

কুন্দ বলে, হ্যাঁরে সাবি, পরী তোকে কিছু বলেছে ?

আমাকে ? কী বলবে ?

কোথায় যাচ্ছে ?

মানে ?

তুই কিছুই জানিস না ? পরী যে এখানকার পাট তুললরে। বলে, ভালোমানুষেমি করে উপোসে মরা আমার পোষাবে না। ওই যে মুখুজ্জেবাবা মানা করে দিয়ে গেছে, মাসি চোখে চোখে রাখছে—সেই হল ওর ভালোমানুষেমি, বুঝলি ?

বুঝেছে। আস্তে আস্তে মাথা দোলায় সাবিত্রী। পরীকেও সে বুঝেছে, মুখুজ্জেবাবাকেও বুঝেছে। ব্যাপার তা নয়, ওরা দুজন দুজনকে বোঝেনি—আপসোস সেইখানে।

পরীর ভালোর জন্যেই কথাটা বলেছে মুখুজ্জেবাবা, এ-বাড়ির ভালোর জন্যেই বিনা সুদে টাকা ধার কবুল করেও সেই কথাটা অক্ষরে অক্ষরে তামিল করছে মানদা—অথচ বাধ্য হয়ে সেটা মেনে নিতে গিয়ে জ্বলে-পুড়ে মরছে পরীটা। হর্দম মদ ঢেলে বুকের পোড়ানি থামাচ্ছে।

বেচারা! এতদিনেও পারল না মানিয়ে নিতে। কতদিন এসেছে ?

পরী কদ্দিন এসেছে কুন্দদি ?

দিনক্ষণ কে মনে রেখেছে বাপু।

তবু ?

ধর, বছর দশেক।

দ-শ ব-ছ-র !

পনেরোও হতে পারে। বললুম তো অতশত মনে নেই। তবে হ্যাঁ, ময়না যে-রাতে খুন হল, তার পরের দিন ও এসেছিল। তখন ওর নাম ছিল—কী যে নামটা—দূর ছাই—! তোর ময়নাও খুন হয়েছে কম দিন! ময়নার মেয়ে ফেলীকে দাদন দিয়ে রেখেছিল ন কর্তা, সেই ফেলীর এখন দেড়টা বাচ্চা,

একটা আস্ত আরেকটা মুলো—কী কপাল মাইরি, মেয়েটাই হয়েছে অচল! জানিস, ফেলীটা হুবহু ময়নার মত দেখতে হয়েছে! তেমনি হাড়গিলে, ঢ্যাঙা, গা-ভরা-শ্বেতীর-মত ধবধবে রঙ। গেরনের দিন সাঁঝের বেলা চিৎপুরে গলির মুখে ওকে দেখেই বুকটা এমন ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল—কী বলব! ভাগ্যিস ফেলী আগেই চিনতে পেরে হেসে বললে—

পরী কেন চলে এসেছিল, জানিস কুন্দদি?

বলে তো সোয়ামীটা নাকি—সোয়ামীর দোষই দেয়—আমার কিন্তু ভাই বিশ্বেস হয় না।

পরীর স্বামীর দোষের কথাটা সাবিত্রীও শুনেছে। শুনে বিশ্বাসও করেছে। অবিশ্বাসের কিছু নেই বলে। কিন্তু কুন্দর কেন বিশ্বাস হয় না?

তোর কেন বিশ্বেস হয় না?

হয় না!

কেন হয় না শুনি না?

বিয়েওলা সোয়ামী অমন হলে তার ওপর মানুষে রাগ করে, না ভগবানকে শাপশাপান্ত করে সোয়ামীর যত্নআত্তি করেই দিন কাটায়? বলি, নিজের দোষে তো মানুষটা অমন হয়নি? তবে—হ্যাঁ—বলতে পারো, জেনে-বুঝেও বিয়ে করেছিল কেন? তা ব্যাটাছেলের—

সোয়ামীর ওপর রাগ করে এসেছিল?

রাগ মানে কি ঠিক ঠিক রাগ? রাগ করে সোয়ামী ছেড়ে এলে কেউ সোয়ামীর তরে হেদিয়ে মরে? পরথম পরথম যা করত! শুয়ের চড়-চাপড় খেয়ে খেয়ে না থিতিয়েছে।

থিতিয়েছে নয়, মানিয়ে নিয়েছে। মনে মনে সাবিত্রী ভুল শুধরে দেয়। পুরোপুরি না হলেও টিকে থাকার মত মানিয়ে নেওয়া।

আসলে, বুঝলি, ছুঁড়ি বাধিয়েছিল পিরীত। তা বাপু সোয়ামীটা অমন হলে ভরা বয়েসে পিরীত না করেই বা কী করে বল? কিন্তু পিরীত করবি দেখেশুনে কর, তা না এক রাঙা মুলোর সাথে? সে হারামজাদা ফুসলে এনে একেবারে

মাসির আগের আস্তানায় তোলে। তারপর সেদিনই কেনাকাটার ভড়কি দিয়ে গয়নাগুলো বাগিয়ে ভাগল তো ভোঁ-কাট্টা! পিরীতের তরে ঘর ছেড়ে এসে একটা দিনও পিরীতের মানুষটার সাথে ঘর করতে পারল না—কী ক্ষেপাই যে ক্ষেপে গেছল পরীটা! বাপস্!

'বাপস' বলে চুইয়ে চুইয়ে হাসে কুন্দ। চোয়াল নেড়ে নেড়ে সজনে চিবোতে চিবোতে।

মুখ ঘুরিয়ে নেয় সাবিত্রী: এ-পাড়ার চিরকেলে বাসিন্দা কুন্দ। আর পরী—হাজার হলেও পরীর একদিন সব ছিল, সব ছেড়ে সে এসেছিল। কুন্দর মত মানিয়ে চলার ক্ষমতা পরীর নেই—কী আর করা!

দেহটা পরীর অসাড় হয়ে গেছে, মনটা ভোঁতা হয়ে গেছে—তবু ওই দেহের মত মনটাও ওই দেহের ভেতরে এখনও তো টিকে আছে? চুলের মুঠি ধরে গুয়েগুণ্ডা সেদিন তার মাথার সাথে ওর মাথা ঠুকে দিলে যন্ত্রণায় ওই অসাড় দেহটাও তো ককিয়ে উঠেছিল? ইঁদুরের সামনে সেদিন ওর ওই ভোঁতা মনটাই না বিগড়ে যাবার যো হয়েছিল? প্রথম দিন এঘরে এসে বুলবুলির কথা বলতে বলতে ওই ভোঁতা মনই তো পরীর একটানা চোখের জল ঝরিয়েছিল?

বড় প্যাঁচালো মানুষের মন। শুধু পরীর নয়, সাবিত্রী মনও: যে-সাবিত্রীও একদিন স্বর্ণ ছিল।

বুকের থেকে কেসটা বার করে গালে চেপে ধরে সাবিত্রী। যে-সাবিত্রী স্বর্ণও।

তারিয়ে তারিয়ে খেলেও খাওয়া কুন্দর শেষ হয় এক সময়।

আঁচিয়ে এসে আঁচলের গিঁঠ থেকে পান নিয়ে মুখে পুরে গাল ফুলিয়ে সে কাছে এসে দাঁড়ায়।

দেখি, কী?

সিগারেটের কেস।

রূপোর?

উঁহু, বিলিতি সিলভারের।

কাল যে—?

হুঁ।

দে না দেখি একবার। খেয়ে ফেলব না, দে। সিগারেট কেসটা টেনে নেয় কুন্দ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। খোলে।

দুটো রয়েছে যে-রে! খাব নাকি একটা?

খা না।

না বাবা। আমার খাকীই ভালো। সিগারেট কেস ফিরিয়ে দেয় কুন্দ। বুক থেকে বিড়ির কৌটো বার করে।

দিয়ে দিবি তো?

দেব না।

তালে খেতে বলছিলি কেন? লিলির মতলব? বিড়ি ধরিয়ে কুন্দ চড়চড় টান মারে। একদমে। পটলের কথায় এক ছুটে সুতোপটির মোড় ছাড়ায়।

প্রথম বিড়িটা শেষ হয়ে এলে সেই আগুনে আরেকটা ধরিয়ে কুন্দ বলে, লিলিটা নিজেকে ভারি চালাক ভাবে। আরে, চালাকিতে তুই পাল্লা দিবি ওদের সাথে! তুই যদি চলিস ডালে ডালে, ওরা হাঁটে তালে পাতায় পাতায়। চার টাকা মেরে কুড়ি টাকা গুনোগার! মনে নেই?

নেই আবার!

রাতে একজন ব্যাগ ফেলে যায় ভুলে।

লিলি বলে—ভুলে, পরী বলে—লিলিই পকেট মেরেছিল।

পরের দিন লোকটা আসা মাত্র ব্যাগটা লিলি বাড়িয়ে দেয়: ব্যবসাদার মানুষ, সাধু সাজা ভালো।

কিন্তু ব্যাগ ফিরিয়ে দিলেও ওই ব্যাগ থেকেই গুইরামের কমিশনটা মিটিয়ে দেবার লোভটা লিলি সামলাতে পারেনি।

সেই লোভের বকশিশও পায় হাতে হাতে: পনেরোর ওপরে পাঁচ টাকা আলাদা ধরে দেয় লোকটা। ব্যাগ ফিরে পাওয়ার খুশিতে।

পরের দিন সেই টাকা ভাঙাতে গিয়ে টাকা হাতে মুখ চুন করে ফিরে আসে বংশী : পাঁচ টাকার চারটি নোটই ব্যবসাদার মানুষটা ঘরে তৈরি করেছে।

শুনে প্রথমে অবিশ্বাস, পরে সে কী বেপরোয়া খিস্তি লিলির! তারপর আছাড়ি-পাছাড়ি কান্না। বারান্দায় গড়াগড়ি দিতে দিতে : সে যে ছকে রেখেছিল ওই টাকা দিয়ে কদিন ওষুধ খেয়ে পেটের যন্ত্রণাটাকে একটু বুঝ দেবে!

বারান্দায় গড়াগড়ি দেওয়ার ফলে পেটের যন্ত্রণাটাও পেয়ে যায় লাই। কাটা ছাগলের মত দাপানো শুরু করে তখন। কথা জড়িয়ে আসে। কথা জড়িয়ে এলে, কান্নার বদলে ফের শুরু করে খিস্তি। গালের কস বেয়ে লালা ঝরে —তবু থামে না।

ভগবানের দয়ায় অমন অবস্থা সাবিত্রীর কখনও ঘটেনি। সাবিত্রীর ভাত-কাপড়ের যোগানদার নানান পুরুষের ভেকধারী যে-ভগবান।

আরেকটা বিড়ি ধরাচ্ছিল কুন্দ, একটা সিগারেট এগিয়ে দেয় সাবিত্রী।

খা।

খাব?

খা, আমি দিচ্ছি।

দিচ্ছিস? মন থেকে দিচ্ছিস? দে তবে। লোকটা আজ আসবে তো?

বলে তো গেছে।

আমি বলছি, আসবে—দেখিস! পরথম দিনই যা শুরু করেছিল! আমি ভাবি, ই কীরে বাবা! থেটার নাকি? খুব টেনেছিল বুঝি?

মোট্টে না।

খালি পেটে?

স্রেফ খালি পেটে।

কুন্দ থ হয়ে যায়।

মৃদু হেসে সাবিত্রী বলে, বলে কি—আমি নাকি ওর বউয়ের মত দেখতে। তাই—

ইল্লি?

বলে, আমার চলন-বলন সব নাকি অবিকল—

বউটা মরেছে ?

মরে ভূত হয়ে গেছে !

ছাড়িস নি, খবদ্দার তালে ছাড়িস নি সাবি। মেঝেয় মাদুর বিছোতে বিছোতে কুন্দ উপদেশ দেয়, খুব বউ-বউ ভাব কর। নইলে ধাঁ করে ফের বে করে বসবে। বউপাগলারা তাই করে। দেখেছি তো! একবার হল কি, ওমনি একটা মিন্সে—

না রে কুন্দদি, এ তেমন না। পোড়্খাওয়া মানুষ। বউটা নাকি বড় জ্বালা জ্বালিয়ে গেছে !

হুঁঃ! এখানে এসে মাগের নিন্দে সব্বাই করে। ও কথা ছাড়ান দে। খাট থেকে দুটো তাকিয়া টেনে নেয় কুন্দ। লোকটাকে আটকে রাখতে পারলি নি, হাঁদী! রাতটা রেখে দিবি তো! দেহ ছড়ায় কুন্দ। একটা তাকিয়া মাথায়, আরেকটা পায়ে দিয়ে। রাতটা যদি আটকে রাখতে—

টাকা ছিল না যে !

টাকা! তোরা খালি টাকাই চিনিস। টাকায় টাকা আসে জানিস না? লাভের তরে লোকসান দিতে হয় না? টাকা না হয় কাল না-ই দিত, পরে দেখতিস দশগুণ—ঈশ, একটু দরদ দেখিয়ে রাতটা যদি রেখে দিতিস !

দরদ দেখাতে হয়নি, এমনিতেই থাকার জন্যে গোঁ ধরেছিল। প্রায় জোর করেই তাকে বার করে দিতে হয়। এখানে রাত কাটাবার নিয়ম না থাকার অজুহাত দেখিয়ে।

এছাড়া কী উপায় ছিল ?

সারারাত ভুজঙ্গ সামনে বসে থাকলে, মুখের দিকে চেয়ে থাকলে, হাত ধরে থাকলে, ভাঙা-ভাঙা গলায় সারারাত ভুজঙ্গ কথা বলে গেলে—ছোট আলোতেও কাঁদ-কাঁদ তার মুখ আর ছলছল চোখের দিকে চেয়ে সুবর্ণর মনটা কি সাবিত্রীর দেহের মধ্যে কাটা ছাগলের মত দাপাদাপি শুরু করে দিত না—লিলির মত বাইরে থেকে সে-দাপাদাপি দেখা না গেলেও ?

আবার, সুবর্ণর মনের সেই ছেনালি দেখে সাবিত্রীর মনটা ক্ষেপে গিয়ে তার গলা টিপে ধরতে যেত না ?

সিগারেট টানতে টানতে কুন্দ জিজ্ঞেস করে, আজ আসবে তো ঠিক ? নাকি তাও বুদ্ধি করে—

বলে তো গেছে।

খুব হুঁশিয়ার। চালে যেন ঢিলতে ভুল না হয়। কাল যেমন সেজেছিলি, আজও তেমনি—

আরও বলে কি জানিস—কী অমানুষিক একটা হাসির কথা—হাসতে হাসতে সাবিত্রী বলে, আমায় এখান থেকে নিয়ে যাবে। আলাদা বাড়ি করে রাখবে।

সাবিত্রীর হাসিতে কুন্দ কিন্তু সায় দেয় না। বলে বুঝি ? আচ্ছা! নাকেমুখে ধোঁয়া ছাড়ে কুন্দ।

যাব নাকি ?

তা কথাটা খারাপ কি।

যাব ?

সিগারেটটা টোটা করে রেখে কুন্দ বলে, যেতে পারিস। বউমরা বলছিস যখন। আইবুড়ো বা ছেলেছোকরা হলে অবিশ্যি—

তাহলে চলেই যাই ?

উঠল বাই তো কটক যাই! আগে একটু খোঁজটোঁজ নে। সংসারে কে—কী—

সেদিকে সব ঠিক আছে।

ঠিক আছে ? ঘাড়ে কেউ নেই ? বউটা গুঁড়োগাঁড়া রেখে যায়নি ? তবে মা কালী বলে কেটে পড়।

বাঁচালি। আমি ভাই তো ভেবে ভেবে—

কিন্তু মালার মত শেষে আবার—

আমি মালা নই। আমি ঠিক মানিয়ে নেব।

জাতবেশ্যার মেয়ে মালার সাথে অবু মাস্টারের মেয়ে সুবর্ণর তুলনা ?

এতদিন মালার জন্যে বুকটা সাবিত্রীর টনটন করেছে। কাল পর্যন্ত। মালার কাণ্ডকে ন্যাকামো বলে এক কথায় লিলি উড়িয়ে দিলেও সাবিত্রী পারেনি : ওর পরেও কী করে বেচারি বউ হয়ে থাকে ? মেয়ের মা হবার পরেও ?

এখন মনে হয়, ভুল করেছিল সে-ই, লিলি নয়।

স্বামী ছেড়ে এসে এখানে ঘর ভাড়া নেওয়া নয় ন্যাকামো ?

ন্যাকামো নয়, প্রবৃত্তি। স্বামী-সংসারের বাঁধাবাঁধি সইবে কেন অম্বর মেয়ে মুক্তোমালার !

অমন বেহিসেবীপনা অবু মাস্টারের মেয়ে সুবর্ণ কখনও করতে পারে না। পোড় তো নিজেও সে কম খায়নি।

ভুজঙ্গ সুধাময়ের মত বাড়াবাড়ি করলে সে-ও সমানে বাড়াবাড়ি চালিয়ে যাবে—দিবাকর মুখুজ্জের বউ ইন্দ্রাণীর মত।

কিংবা মুখ বুজে সয়ে যাবে স্বামীর সব বাড়াবাড়ি। অপর্ণা কাকীর মত।

কেননা ওকেই বলে সংসার করা। সংসার করতে হলে, সংসারকে টিকিয়ে রাখতে গেলে, একজনকে মুখ বুজে সয়ে যেতেই হয়—কখনও স্বামীকে, কখনও স্ত্রীকে। অবস্থা বুঝে।

কথাটা মেনকা মিথ্যে বলত না। বরঅন্ত-প্রাণ মেনকা।

জানো দিদি, ইন্দ্রাণীর জন্যে পাড়ায় আর কান পাতা যায় না। এবার বাপের বাড়ি গিয়ে নতুন যা-সব শুনে এলাম ! ছি ছি ছি ! বৌদি বলছিল, সারা কলকাতায় নাকি ঢি-ঢিক্কার পড়ে গেছে। এক ডাকে সবাই আজ ইন্দ্রাণী মুখুজ্জেকে চেনে। ওর হাজবেণ্ডটাকেও। গণ্ডা গণ্ডা বই লিখলে কি হয়, দিবাকর মুখুজ্জেকে চেনে সবাই ইন্দ্রাণীর হাজবেণ্ড, মানে স্বামী, বলে।

বালীগঞ্জের কথা বাদ দাও ভাই।

কী যে বলো দিদি ! কেন, আমি বালীগঞ্জের মেয়ে নই ?

বালীগঞ্জের মেয়ে হলেও তুমি যে ভাই হাওড়ার বউ। যাক, তা ওর হাজবেণ্ড না স্বামী যেন কী—সেটা কিছু বলে না ?

বলবে! বরং ভাব দেখায়, এই হল অতিআধুনিক কেতা! আসলে, বুঝলে দিদি, দিবু মুখুজ্জেরও এদিক-ওদিক—হুঁ হুঁ—

আসলে মেনকা জানে না আসল কথাটাই: উপরি-উপায়ী ও মোটা মাইনের চাকরে বউকে তালাক দিলে বই-লেখার রোজগারে সাহেব সাজা, দু পা যেতে ট্যাক্সি হাঁকানো, দুজনের জন্যে দেড়শো টাকা বাড়ি-ভাড়া গোনা, উঁচু মহলে দহরম-মহরম, মেয়েকে বিলিতি ইস্কুলে হোস্টেলে রেখে পড়ানো—সবকিছু বরবাদ করে বেলেঘাটা কি হাওড়ায় এসে যে উঠতে হবে দিবু মুখুজ্জেকে।

এদিক ওদিকে থাকবে দিবু মুখুজ্জের—নিজের বউকে যে বাগে রাখতে পারে না?

আসলে ওটা বুজরুকি। ভান। অমন এদিক-ওদিকের ভান না করলে চলবে কেন?—দিবু মুখুজ্জে সতী সেজে থাকলে ইন্দ্রাণী মুখুজ্জের চালচলনের কৈফিয়ত থাকে?

বড়লোক না হয়ে বড়লোকী চালানোর ঠেলা সহজ! ওর ফেরে পড়ে গেলে রক্ষে আছে

অবশ্য বাড়াবাড়ি ভুজঙ্গ নাও করতে পারে। সব জেনেশুনেও নিজে থেকে এসেছে যখন। পোড়্‌খাওয়া মানুষ যখন।

ধরো, তবু বাড়াবাড়ি যদি করেই, সে ধীর-স্থির থেকে নিজের স্বামীকে বদলাতে পারবে না? সুবর্ণর মত মেয়ের কি ইন্দ্রাণী হওয়া মানায়! একে সে লেখাপড়া জানে না, তায় স্বামীটাও তার নামী নয়। সুবর্ণ হবে মনোমোহিনী। যে-মনোমোহিনী বদলে দিয়েছিল যামিনী কাকাকে।

দেখতেই-শুধু-সুন্দর গরিবের মেয়ে অপর্ণা কাকী স্বামীর সব অনাদর সয়ে গিয়েছিল [illegible]। মুখ ফুটে কোনদিন একটি কথাও বলেনি: এমনিতেই প্রতি মাসে হাওয়ার সাথে ঝগড়া করেই টাকা বন্ধ করে দেবার হুমকি দিয়ে যায় যে-মানুষ—তার মুখে মুখে চোটপাট করলে বুড়ি দিদিশাশুড়ী আর ছেলেমেয়ে নিয়ে স্রেফ না খেয়ে মরতে হবে না?

অসুখে ভুগে ভুগে মরে গিয়েছিল অপর্ণা কাকী। এক শিশি ওষুধ

পায়নি। ঠিকমত পথ্য পায়নি। বিছানা নেওয়ার অপরাধে স্বামীর মাসিক দেখাটাও না।

তবু স্বামীর নাম করে কেঁদে কেঁদে মরার সময় অপর্ণা কাকী হয়ত ভাবতেও পারেনি যে তার অসুখ শুনে না আসুক, মরার খবর পেয়েও গাঁয়ে একবার পা দেবে না পতিদেবতা।

নাতির ঘরের মা-মরা বাপ-বেপাত্তা ছেলেমেয়েগুলি নিয়ে সে কী দুরবস্থা রাঙা ঠানাদির!

নিরুপায় হয়েই অবিনাশ তখন অবনীকে চিঠি দেয়: দোকানে গিয়ে সে যেন একবার খোঁজ নেয় যামিনীর। নিজে না আসুক—কিছু টাকা যেন অবশ্য অবশ্য পাঠায় যামিনী। বউ না হয় পরের মেয়ে ছিল, কিন্তু জীতেনরা তো তারই সন্তান? রাঙা ঠানাদি তারই মায়ের মা তো?

দুদিন পরে অবনী এসে হাজির।

যামিনীকাকার দেখা সে পায়নি। ভূষণের হাতে দোকান ছেড়ে দিয়ে সে গেছে বরিশাল। কোন্ এক বন্ধুর ছেলের বিয়েতে।

তবে যামিনীকাকার সাথে দেখা না হলেও খালি হাতে সে আসেনি। ন্যাকড়া জড়ানো নোটের বাণ্ডিলটা বার করে দেয় অবনী।

কী?

টাকা। তিনশত। রাঙা ঠানদিরে দিয়া দাও মা।

পালি কই? শ্যাষে তুমি নি ধারকজ্জ কইরা—

কী যে বলে সুভাষিণী। ঢাকায় টাকা ধার দেবার কে আছে অবনীর? এক মাসে আপিসের সকলের সাথেই কি আলাপ হয়েছে?

টাকা এনেছে সে খোদ জায়গা থেকে।

ভূষণের কথা বিশ্বাস না করে সে গিয়ে উঠেছিল সরাসরি মনোমোহিনীর ওখানে।

অ্যাঁ! হেডার কাছে তুমি গেছিলা কোন কামে?

হ্যাঁ, কথাটা অবনীরও মনে হয়েছিল। পরে। মনোমোহিনীর ঘরে ঢুকে

পড়ার পরে। মনে হয়েছিল, ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে। ঝোঁকের মাথায় হুট করে এখানে চলে আসা উচিত হয়নি। সত্যিই যদি যামিনীকাকা থাকত? কী লজ্জা!

দরজায় সে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মেঝেয় পা ছড়িয়ে মনোমোহিনী বসে ছিল। একটি মেয়ে তার চুল বেঁধে দিচ্ছিল।

তাড়াতাড়ি শাড়ি সামলে উঠে দাঁড়ায় মনোমোহিনী।

কারে চাই? খবর না দিয়া এক্কেরে—

যামিনীকাকা—

অ। অবনীর মুখের দিকে চেয়ে মনোমোহিনী কী যেন দেখে খানিক। কী বোঝে সেই জানে। গলা নামিয়ে বলে, তিনি তো নাই। বরিশাল গ্যাছেন। তুমি জানতা না বাবা?

বেকসুর ঘাড় নেড়ে অবনী জানায়—না।

না বলেই চলে আসছিল, মনোমোহিনী ডাকে: এক গাঁয়ের ছেলে সে দেখেই বুঝেছে। একেবারে যখন তার এখানে খোঁজ নিতে এসেছে—ব্যাপারটাও জরুরী নিশ্চয়। সেটা বলতে কি কোন আপত্তি আছে? যদি থাকে, তাহলে—অবশ্য—

না, বলতে আর আপত্তি কি। যামিনীকাকাকে কথাটা বলার জন্যেই এসেছিল যখন।

অপর্ণা কাকীর মরার খবরটা সে এমনভাবে দেয় যেন মনোমোহিনীই তাকে বিষ-টিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে।

খবর দেওয়া হলে গালাগাল দেয় একচোট, যামিনীকাকাকে—মানানসই গালাগাল: যামিনীকাকার জন্যে কম কষ্ট পেয়ে গেল অপর্ণা কাকী—ভগবতীর মত রূপ ছিল যার! এমনই এক দুশ্চরিত্র অমানুষের হাতে পড়েছিল যে সারাটা জীবন কেঁদে কেঁদে—অমন সোনার শরীর তার—

ইচ্ছে করেই খোঁচা মেরে মেরে কথাগুলি বলে, অপর্ণা কাকীর রূপের কথাটা বার বার তোলে—জালার মত শরীর, ভুষোকালির মত রঙ এই মেয়েমানুষটি

বুঝুক যে এর জন্যেই যামিনীকাকার ভগবতী বউকে অত হেনেস্থা সারাটা জীবন সয়ে যেতে হল।

পরকাল নেই? সতীর চোখের জল মিথ্যে হবে?

মাথা নিচু করে সব শোনে মনোমোহিনী।

অবনী থামলে বলে, পোলাপানগুলার বড় কষ্ট হইতাছে কইলা—না বাবা?

হবে না। কষ্ট কি শুধু মা মরার—খেতেই পাচ্ছে না। দুবেলা দুমুঠো ভাত—তাই জুটছে না। যামিনীকাকা কি ইদানীং একটা আধলাও পাঠাত? ফুর্তি—নিজের ফুর্তি ছাড়া আর কোনদিকে খেয়াল ছিল? বউকে ভালো না বাসুক, তাই বলে নিজের ছেলেমেয়ে—

খাইতে পায় না! পোলাপানে খাইতে পায় না!

হকচকিয়ে যায় অবনী: এ কী ব্যাপার! এমন তো হওয়ার কথা নয়! কোথায় এতদিনে পথের কাঁটা সরল বলে এর মত মেয়েমানুষ খুশী চাপতে গিয়ে হিমশিম খাবে—তার বদলে হাউ হাউ কান্না?

ওনার পোলায় খাইতে পায় না। ওনার মেয়ায় খাইতে পায় না! আর মানুষটা আমারে হে কথাডা ভুইল্যাও—তুমি খাড়াইয়া ক্যান বাবা, বও—বও।

মনের ঝাল মিটিয়ে মনোমোহিনীকে এক গাদা কথা শুনিয়ে দেবার পর, হঠাৎ তার আকুল-ব্যাকুল কান্না দেখার পর—পা দুটি অবনীরও যেন ভেঙে পড়তে চায় এখন। মনে পড়ে যায়—যামিনীকাকার দোকান থেকে পাক্কা দুটি মাইল সে একদমে হেঁটে এসেছে।

তোমার কাকা ছাড়া এ ঘরে আর কেউ আসে না বাবা—তুমি বইতে পার।

এরপর কথা চলে? মনোমোহিনীর সেই মুখের দিকে চেয়ে না বসে থাকা যায়?

বইলি? হেডার বিছনায় তুই—অরে হারামজাদা! তরে নিয়া আমি যামু কই! শিগগীর যা অখন, সব ছাড়—না না—ছাড়িস না—ওই কাপড়েই ডুব দিয়া আয়! ছাখ কাণ্ড! রাইত দুপুরে অখন—

রাগ করেছিল সুভাষিণী। সব কিছু ধোওয়ার জন্যে ঘর থেকে টেনে টেনে উঠোনে ফেলতে শুরু করেছিল।

অত রাতেও পুকুরে স্নান না করে রেহাই পায়নি অবনী।

রাঙা ঠানদিকে টাকা দিয়ে এসে স্নান করতে হয়েছিল সুবর্ণকেও।

আর, পরে—ওই মনোমোহিনীরই প্রশংসা মুখে ধরত না সুভাষিণীর। মাত্র বছর কয়েক পরে।

যামিনীকাকার সংসারের জন্যে কম করেছে মনোমোহিনী! দু-দুটি মেয়ের বিয়ের খরচ দিয়েছে। ছেলেকে পড়িয়েছে।

গাঁয়ে পাশ-করা ডাক্তার নেই শুনে মনোমোহিনীই জীতুদাকে ডাক্তারী কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিল! যামিনীকাকার অমতেও।

জীতুদাকে ডাক্তারী কলেজে ভর্তি করে দেওয়ার সাথে সাথে মরার-দাখিল হেমাঙ্গসুন্দরী দাতব্য চিকিৎসালয়কে হাজার দুয়েক টাকার ওষুধ যুগিয়ে বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

মাতৃভক্ত নিকুঞ্জ চৌধুরী মায়ের নামে ডিস্‌পেন্‌সারি ফেঁদেই খালাস। কিন্তু চৌধুরীরা নজর দেয় না বলে কি গাঁয়ের গরিবরা বিনা ওষুধে মরবে?

যামিনীকাকার বউ না এক শিশি ওষুধ পায়নি অতদিন অসুখে ভুগেও?

যামিনীকাকাকে ভালোবেসে তার ছেলেমেয়েকে ভালোবেসে তার গ্রামটিকেও ভালোবেসেছিল মনোমোহিনী। যামিনীকাকার বাড়ির ইঁদারা বুজে গেলে সেই ইঁদারা কাটাবার খরচই শুধু দেয়নি সে—বাড়ির সামনে একটা টিউবয়েলও বসিয়ে দিয়েছিল সেই সাথে।

কলেরায় গাঁয়ের এগারোটি লোক, তার মধ্যে সাতটিই ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, মারা গেছে! যামিনীকাকার বড় মেয়ে রানীর ছমাসের ছেলেটা যা দুরন্ত শোনা যায়!

যামিনীকাকার ছেলেমেয়েদের বড়-মা না সে?

বড়-মা।

তাকে বড়-মা বলে ডাকত জীতুদা। সত্যিকারের মার মত শ্রদ্ধা-

ভক্তি করত। মেসে থেকে পড়াশোনা করলেও রোজ একবার বড়-মাকে না দেখে এলে, তার হাত থেকে নাড়ু হোক মোয়া হোক বাখরখানি কি মুড়ি-ক্ষীর যাই হোক কিছু না খেয়ে এলে মন কেমন করত জীতুদার। মরা মার কথা মনে পড়ে খালি কান্না পেত জীতুদার।

শুধু জীতুদার? বড়-মা কাকে বেশি ভালোবাসে এই নিয়ে আকছা-আকছি করত না তিন ভাইবোনে? বাণী আর রানী তাদের বড়-মাকে কোনদিন চোখের দেখা না দেখলেও?

আহা, বড়-মা অত ভালো না বাসলে অমন বিয়ে হত ওদের?

বড়-মা বলত গাঁয়ের লোকেরাও। সেই টিউবয়েলকে 'বড়-মার টিউকল' বলা মনোমোহিনীকেই বড়-মা বলা নয়?

আগে যামিনীকে সবাই 'মনোমোহিনীর তবল্‌চী' বলে আড়ালে ঠাট্টা করলেও ক বছরেই ভুলে গিয়েছিল যে সত্যিই একদিন যামিনীকাকা তবল্‌চী ছিল মোহিনী বাঈজীর।

মনোমোহিনীর মরার খবর স্বুবর্ণ পেয়েছিল স্বুভাষিণীর চিঠিতে। ক মাস আগে যেভাবে রাঙা ঠানদির মরার খবর দিয়েছিল স্বুভাষিণী, অবিকল সেই ভাবেই দিয়েছিল মনোমোহিনীর মরার খবর। যেন কোনই তফাত নেই দুজনের মধ্যে।

স্বুভাষিণীর চিঠি পড়ে কম আশ্চর্য হয়নি স্বুবর্ণ: ননী লিখে দিলেও চিঠির বয়ানটা তো মার? লেখার পর কি চিঠিটা একবার পড়ে শোনায়নি ননী? চিঠিতে বার বার মনোমোহিনীর বদলে বড়-মা কথাটা নিশ্চয় ব্যবহার করেছিল স্বুভাষিণীই।

বড়-মা।

মনোমোহিনী নয়, বড়-মা।

ভুজঙ্গ যদি বাড়াবাড়ি করে, স্বুবর্ণ কেন বাড়াবাড়ি করবে? সে হবে বড়-মা।

এতদিন যেভাবেই কাটুক শেষের কটা দিন তো শান্তিতে যাবে?

মনোমোহিনীর মত বড়লোক সাবিত্রী নয়। কিন্তু বড়-মার মত সত্যিকারের মা হওয়ার ক্ষমতা তারও নেই।

সে তার সর্বস্ব দিয়ে যাবে ফনীর ছেলেকে।

কোনমতে ফনীর একটা বিয়ে দিতে পারলে হয়।

মিলিটারিতে গিয়ে ফনী যদি বখেও যায়—যাবেই—একটা ছেলে কি মেয়ে রেখে যাক।

সাবিত্রী যেন চোখের ওপর দেখতে পায়: বর বেশে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ফনী। পাশে বউ। গাঁটছড়া বাঁধা। তাকে প্রণাম করছে দুজনে।

বউ ফনীর পছন্দ হয়নি। মুখে দেখে বেশ বোঝা যায়।

না হোক পছন্দ। সাধেই কি আর মেনকার ননদের কুষ্ঠি মিলিয়ে বয়েস মিলিয়ে ওই বউ বেছেছে স্বর্ণ। কুষ্ঠি মিলিয়েছে বয়েস মিলিয়েছে—চেহারাটা মেলাতে পারেনি। রাতারাতি মেয়ে ঠিক করতে হলে এ ছাড়া কী উপায় ছিল? মিলিটারির চাকরিতে সহজে ছুটি মেলে?

তাছাড়া, একেই ফনীর বয়েস এখন ষোল। বউ তার বয়েসে বড় না হলে মেনকার ননদের মত বিয়ের বছর পুরতে না পুরতে মা হবে কী করে?

ফনীর বউ মা না হলে নিজের সর্বস্ব দেবার জন্যে ছেলে স্বর্ণ পাবে কোথায়? ছেলে মেয়ে যাই হোক।

কুন্দ নাক ডাকা শুরু করে দিয়েছিল, মেঘের ডাক শুনে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে।

সেরেছে! অসময়ে মেঘ গজ্জায় যেরে! অ ভাই সাবি—বাইরে থাকি নাকি?

সাবিত্রী জবাব দেয় না। ঘুমুচ্ছে কিনা। গালের তলায় সিগারেট কেসটার মধুর অস্বস্তি সইতে সইতে।

যাই, আবার সব তোলাতুলি করিগে। মুখপোড়া যখন টের পেয়েছে ওয়াড় না শুকোলে কুন্দির আজ চলবে না—নির্ঘাত বৃষ্টি নামিয়ে ছাড়বে। কেন যে মরতে এক রাজ্যি একসাথে কাচতে গেলুম!

শুধু মেঘ গর্জানো নয়, রীতিমত কালবৈশাখী। ˚চৈত্রের দুপুরে।

উঠি উঠি করে মালা যখন ওঠে, কুন্দ ততক্ষণে সকলের সবকিছু তুলে ফেলেছে: তাকে যদি উঠতেই হল, কী দরকার আর সবাইকে ডেকে তুলে? একটু গড়ান দিচ্ছে, দিক। কিন্তু আক্কেলখানা দেখ! এর নাম ঘুম? বলিহারি ঘুম বাপু! ঘুমোলে মেঘ দেখা যায় না, তাই বলে অমন গর্জানিও কানে ঢুকবে না! একি মরণ ঘুমরে বাবা! আচমকা মেঘের ডাকে এখনও বলে তার বুক গুড়গুড়াচ্ছে! সে না উঠলে ঝড়ের তোড়ে তো এগুলোর পাখা গজিয়ে যেত? পাখা না গজাক, বৃষ্টিতে জ্যাবজ্যাবে হত তো? তখন আবার নালিশ করত—কুন্দদি, তুই থাকতে ভাই এই হল!

হঠাৎ ঝড়ের দমকা উঠতেই একসাথে সব সাপটে˚নিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘরে ঢোকে কুন্দ: ওরে বাস্! শেষকালে তারই পাখা গজিয়ে যাবে নাকি!

মালা দরজায় এসে দাঁড়িয়ে ছিল, কুন্দকে তোলাতুলি করতে দেখে সে আর বেরোয় নি। ঝড়ের দমকায় সে-ও ঘরে ঢুকে পড়ছিল, হঠাৎ আকাশের দিকে নজর পড়তে নড়ন-চড়ন তার বন্ধ হয়ে যায়:

বারুদ-ঠাসা আকাশ!

ঝড়ের সাঁ-সাঁ আওয়াজে, আশপাশের বাড়ির জানালা আছড়ানোর দমাদ্দম শব্দে, রাস্তায় লোকজনের হই-হট্টগোলে, একসাথে কয়েকটি মোটরের কানে-তালা-লাগা হর্নে অদ্ভুত একটা অনুভূতি জাগে। রোমাঞ্চকর অদ্ভুত অনুভূতি। এককে হাওয়ার ঝাপটায় দোতলা এই পাকা বাড়িটাই মুখ থুবড়ে এই পড়ল বলে মনে হয়!

কিন্তু ওপরের দিকে চেয়ে দেখ—কী নির্বিকার ভালোমানুষটি! এই সবের সাথে যেন কোন সম্পর্ক নেই।

ভালোমানুষ! সেয়ানা শয়তানরা মুখ গোমড়া করে অমন ভালোমানুষ সেজেই থাকে বটে।

তবে কি তোমার মত হবে—সবদিকেই বাড়াবাড়ি?

বাড়াবাড়ি নয়, ভণ্ডামির সাথে আমার চিরকেলে আড়ি।

ভণ্ডামি? মানে কী হল?

কাছে এসো। মুখে মুখে বুঝিয়ে দি।

আঃ!

সুধাময়কে ঠেলে-সরিয়ে বারান্দা থেকে ঘরে পালিয়েছিল।

ডায়মণ্ডহারবারের সেই বাংলো বাড়ি। বিয়ের পরের দিনের ঘটনা।

ঘরে ঢুকেই খটকা লেগেছিল—চালটা ভুল হয়ে গেল না তো? আসলে সে যে রাগ করেনি, রাগের ছল এটা—বুঝবে তো? বুঝবে তো যে মালীব্যাটা অমন হাঁ করে চেয়ে ছিল বলেই তাকে আড়ালে আসতে হয়েছে—ওরই জন্যে?

ঘরে পালিয়ে সুধাময়েরই প্রতীক্ষায় ছিল অনুপমা।

প্রতীক্ষার ফাঁকে ফাঁকে জানালা দিয়ে ঝড়ের মাতন দেখতে দেখতে ভয়ঙ্কর একটা মৃত্যুকামনা পেয়ে বসেছিল। অপঘাত মৃত্যুর।

গা-ছমছম ঝোড়ো সন্ধ্যায় বাংলোর এই আধো-অন্ধকার ঘরে নতুন বউকে আদর করতে গায়ে হাত দেওয়া মাত্র হঠাৎ-বারান্দা-থেকে ওভাবে-চলে-আসার ভুল শোধরাতে গিয়ে স্বামীকে যদি বেপরোয়ার মত ঝাপটে ধরে বউটা—আঁতকে উঠে দিশা হারিয়ে স্বামী কি সাথে সাথে গলা টিপে তাকে শেষ করে ফেলবে না?

বউ-হলেও-মাসখানেকের-আলাপী-অন্নর-মেয়ে মুক্তোমালা ওভাবে হঠাৎ ঝাপটে ধরলে আতঙ্কে দিশেহারা হওয়া অন্যায় তো না?

কিন্তু কী-যে খাপছাড়া চালচলন মানুষটার।

বারান্দায় মালীর সামনেই যে মুচকি মুচকি হাসির হ্যাংলামি শুরু করে দিয়েছিল, আধো-অন্ধকার একা ঘরে গা ঘেঁষে বউয়ের পাশে দাঁড়িয়েও চলে যায় সে আরেক জগতে।

আকাশটা যেন বারুদ-ঠাসা, না অনু?

মানে না বুঝেও অনু বলে, হুঁ। কাঁধে না হাত রাখুক, তার দিকে চাইছে না পর্যন্ত!

ওই তালগাছটাকে দেখছ, অনু ?

হুঁ।

কেমন পাগলের মত মাথা ঝাপটাচ্ছে।

হুঁ।

এদিকে এই কৃষ্ণচূড়াকে দেখ, কেমন আকুলি-বিকুলি করছে।

হুঁ।

অনু, ওদের দেখে কি মনে হয় না—তালগাছটা যেন বর, আর লাল ফুলের চেলীপরা এই কৃষ্ণচূড়া তার বউ ? মনে হয় না, দুজন দুজনকে পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে গেছে, অথচ এমনই প্রকৃতির কারসাজি যে এক পা-ও কারো নড়ার সাধ্য নেই ? বউ, বদমাস ওই আকাশই এদের উসকে দিয়েছে, দিয়ে এখন রাশভারী ভালোমানুষ সেজে মজা দেখছে। তার মজা দেখার শখ মিটলে হয়ত বাজের বাণ মেরে বরের মাথা ভেঙে দেবে, ঝড়ের থাবা বাড়িয়ে বউকে তুলে আছাড় মারবে।

হুঁ বলতে গিয়ে এবার ঘাবড়ে যায় অনুপমা: এসব কথার মানে ? কেন তাকে এসব বলে ভয় দেখানো ? স্বামী-হলেও-মাত্র-মাসখানেকের-আলাপী একটা মানুষের সাথে কলকাতা থেকে এতদূরে এসে বাংলো বাড়ির আধো-অন্ধকার ঘরে ঝোড়ো সন্ধ্যায় এভাবে একা একা থাকতে কি ভয়-ভয় করে না অন্নর মেয়ে মুক্তোমালার ? করা অন্তত উচিত নয় ?

ঝোঁকের মাথায় একটা বাজারে মেয়েকে বউ করে ফেলার ভুল শোধরাতে গলা টিপে এখানে শেষ করে রেখে গেলে—

দম নিতে ভুলে যায় অনুপমা।

ভালোমানুষ! আজকের দিনে পুরো ভালো কোন মানুষই হতে পারে না, অনু। হওয়া অসম্ভব। মানুষ হয় ভালোয় মন্দয় মিশিয়ে। আসলে যারা হাড়ে হাড়ে বদমাস তারাই বাইরে ভালোমানুষ সেজে থাকে। মুখ গোমড়া করে রাশভারী বনে থাকে। কেননা প্রতি মুহূর্তে তাদের আশঙ্কা—এই বুঝি গেল ধরে পড়ে। কিন্তু তোমার ওই বদমাইসির বারুদ-ঠাসা ভালোমানুষ আকাশ

অসহায় প্রকৃতির ওপর যত বাহাদুরিই দেখাক, আমি ওকে পরোয়া করি নে, বউ। ভালোমানুষ আকাশ, ভালোমানুষ মানুষ কাউকেই না। বলেই এক হেঁচকায় তাকে বুকে টেনে নিয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে উবে গিয়েছিল আকাশটার ভালোমানুষেমি। চকিতে একবার হিংস্র হাসির ঝিলিক হেনেছিল। তারপর অট্টহাসিতে ভেঙে পড়েছিল।

জানালা থেকে সরে এসো, বউ। তোমার ভালোমানুষের স্বরূপ এবার বেরিয়ে পড়েছে।

তখন আর সায় না দিয়ে পারে নি অনুপমা। তখন তারও মনে হয়েছিল, পৃথিবীর রাশভারী ভালোমানুষগুলো অবিকল ওই আকাশের মত।

অন্নর মেয়ে মুক্তোমালা কম ভালোমানুষ তো দেখে নি জীবনে!

কথাগুলি হয়ত ঠিকই বলত মানুষটা। ভালোয়-মন্দয় মেশানো সেই মানুষটা।

আজকের দিনে পুরোপুরি ভালো কোন মানুষই হতে পারে না। থাকতে পারে না। মেয়ে পুরুষ কোন মানুষই।

অথচ বাজার-চালু ভদ্রলোক হতে হলে এটা কি মানা যায়? ভালো মানুষ তাই সাজতেই হয়। পুরোপুরি ভালোমানুষ। ভাজা-মাছটিও-উল্টে-খেতে-না-জানা ভালোমানুষ। রাশভারী ভালোমানুষ।

কিন্তু ভালো মানুষের মন্দ মানুষটা যাবে কোথায়? সে থাকে তাই তক্কে তক্কে। ওত পেতে। মওকা পেলেই মাথা চাড়া দেয়।

তবে বাজার-চালু ভদ্রলোকরা কিনা পুরোপুরি ভালোমানুষ, তাই তাদের মন্দগুলিও ভালো হয়ে ওঠে। তর্কের জোরে, যুক্তির জোরে, গলার জোরে। ঘুঘু উকিলের হাতে পড়লে খুনে আসামীও খালাস পায় না?

ঘুঘু উকিল আর খুনে আসামীতে দেশটা আজ ছেয়ে গেছে। তারাই দেশের মাথা। এদেশ ওদেশ—সব দেশের। দীনদুনিয়ার মালিক তারা।

হর্দম ভণ্ডামি করতে করতে ভণ্ডামিটাই আজ সত্যি বনে গেছে। ভণ্ডামিটাই ভদ্রলোকোমি হয়ে উঠেছে।

এর চেয়ে ছোটলোকরা হাজারগুণে ভালো। তারা জানে তারা মন্দ মানুষ। পুরোপুরি মন্দ মানুষ।

কিন্তু মন্দ মানুষের ভালোমানুষটা যাবে কোথায়? সে থাকে তাই তক্কে তক্কে। ওত পেতে। মওকা পেলেই মাথা চাড়া দেয়।

তবে বাজার-চালু মন্দলোকরা কিনা পুরোপুরি মন্দলোক, তাই তাদের ভালোগুলিও মন্দ হয়ে ওঠে। তর্কের জোরে, যুক্তির জোরে, গলার জোরে। ঘুঘু উকিলের পাল্লায় পড়লে নির্দোষীকেও ফাঁসির দড়ি পরতে হয় না?

আমি, বুঝলে অনু, এ-দলেও নই ও-দলেও নই। আমি হলাম—

আজ, এখন, মালার মনে হয়, পৃথিবীতে বাঁচতে হলে পৃথিবীর মানুষ সেজেই বাঁচতে হয়। মানুষ আসলে ভালোয়-মন্দয় মেশানো হলেও হয় পুরো ভালো, নয় একেবারে খারাপ সাজতে হয়।

সেই অবুঝ জেদী গোঁয়ার মানুষটা কেন এটা বোঝে নি, বুঝত না, বুঝতে চাইত না? সে-ও সকলের মত ভালোমানুষ সেজে মালাকে কি অনুপমা করে রাখতে পারত না? স্বামী হয়েও কেন সে আর-পাঁচটা স্বামীর মত হতে পারে নি?

সে-ও মন্দ মানুষ সেজে মালাকে কি হীরেমতীর মত বাঁধা রাখতে পারত না? বড়লোকের ছেলে হয়েও কেন সে আর-পাঁচটা বড়লোকের ছেলের মত হতে পারে নি?

আকাশকে সাক্ষী রেখে এইসব কথা মালা ভাবছে বলেই বুঝি ভালো-মানুষ আকাশটা যায় ক্ষেপে। ক্ষেপা কুকুরের মত তার গর্‌র্‌ গর্‌র্‌ হুমকিতেও মালার ভ্রূক্ষেপ নেই দেখে সে তলব করে তার তাঁবেদার ভিস্তিওলাদের। এবং বড় বড় ফোঁটায় হলেও টিপে টিপে বৃষ্টি ছোঁড়ায় মন ওঠে না বলে·হঠাৎ সে এমনই প্রচণ্ড এক ধমক লাগায় যে ধমকের চোটেই যেন ফেটে যায় একসাথে হাজার-লক্ষ স্বর্গীয় ভিস্তি।

এবার আর ঘরে না ঢুকে উপায় থাকে না মালার।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আসে গুইরাম।

এ কী গুইরামদা, একেবারে যে ঢোলকম্বল হয়ে গেছ!

তোর তরেই তো।

আমার তরে ?

তবে কি বংশী শালা গুল দিয়ে এল ?

ও। হঁ্যা—তাই বলে এই ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে আসতে হবে ? দুদণ্ড পরে এলে পারতে না ?

মেরা খুশি। কারো হুকুমের চাকর হাম ? কখন কটায় আসব কেউ ফরমে দেবে ?

হয়েছে ! গামছাটা গুইরামের দিকে এগিয়ে দেয় মালা। বাহাদুরি না করে আগে মাথা মোছ।

হাসা হচ্ছে ?

বাঃরে, হাসলুম আবার কোথায় ! মালা হাসে। জানো না, কথা বললেই আমার মুক্তোর মত দাঁতগুলি ঝিকমিক করে ওঠে। তাই না আমার নাম মুক্তোমালা।

গুইরাম পায় লজ্জা : ছুঁড়ি কী শয়তানী ! নেশার ঘোরে কবে কী বলেছিল মনে করে রেখেছে ? সেই কথা তুলে মারল খোঁচা ?

কাপড় ছাড়বে ? ভিজে কাপড়ে থাকলে—

মেয়েছেলেকা মাফিক তুলোর শরীল গুয়েগুণ্ডাকা নয়। মাথা না মুছেই গামছাটা গুইরাম ছুঁড়ে ফেলে। যাক, কী কথা আছে, ঝড়াকসে উগরে ফেল। রোঘোরা উদিকে হাত গুটো আছে। দেরি হলে শালারা ভাববে শালা জিতে কেটে পড়ল।

রোঘোদের তুমি ভয় করো ?

ভয় ! গুয়েগুণ্ডাকা ডর !

তবে অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? একটু বোস। জিরোও। সিগারেট খাবে ? দামী সিগারেট আছে—ওই ছাখ।

আধভেজা ওয়াড় শুকোবার জন্যে ফুলস্পীডে কুন্দ ফ্যান খুলে দিলে সাবিত্রীর আর ঘুমিয়ে থাকা চলে না।

কী ঘুমরে তোর!

বৃষ্টি এসেছে, না?

ঝড়ের চোট তো দেখলি নি! কী নাকাল বল দেখি। এ ওয়াড় যদি এখন না শুকোয়—

আমার বাড়তি ওয়াড় আছে, দেব'খন।

সে নয় দিদি। কিন্তু আমারগুলো শুকোবে না কেন? সেই কখন ধুয়ে দিয়েছি—

ঘর থেকে বেরোয় সাবিত্রী।

কলঘরে ঢুকতে গিয়ে মালার ঘরে গুইরামের সাড়া পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। বৃষ্টির ছাট গায়ে লাগলেও দাঁড়িয়ে থাকে।

আমি বলি কি গুইরামদা—

চাপা গলায় কী যেন বলে গুইরাম।

নর্দমা! তোমার মুখটা না—এক্কেবারে নর্দমা!

গুইরাম হো হো করে হেসে ওঠে।

দূর হয়ে যাও!

আরেক দফা হাসতে যাচ্ছিল গুইরাম, সাবিত্রীকে দেখেই হাসি গিলে ফেলে।

কেয়া খবর? আ যাও।

গুইরামের হাসি শুনে মালার কথা শুনে নিজেকে সাবিত্রী ঠিক রাখতে পারে নি: কী ব্যাপার? গুয়েগুণ্ডার কাছে কাতর স্বরে কী কথা বলছে মালা? দরজা ভেজিয়ে?

খাটে দুজনকে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখে সাবিত্রী হকচকিয়ে যায়। সে ঢোকা সত্ত্বেও মালা মুখ না ফেরানোয় অবাক হয়: কথাটা যাই হোক, এমনই রসের কথা যে ওই নিয়ে গুইরাম খিস্তি করায় এখনও মালা মুখ তুলতে পারছে না।

গুইরাম বলে, কাপ্তেনটাকে নাকি খুব বাগ্যেছিস ?

হেসে সায় দিয়ে সাবিত্রী সুধায়, হঁ্যারে, মালা, আমার ফুলকাটা গেলাসটা তোর এখানে ?

ফুটকাটা গেলাস ?

সেই যে কালো-বউয়ের কাছ থেকে পুরনো শাড়ি দিয়ে কাপ-ডিস কেনার সময়—

সেটা না পরের দিনই বংশী ভেঙে ফেলল। সাবান রগড়াতে গিয়ে—

এরপরে আর মনে না পড়িয়ে উপায় নেই।

অগত্যা 'তাইত !' বলে বেরিয়ে যেতে হয় সাবিত্রীকে।

গুইরাম বলে, এবার ওটার বরাত ফিরল। লোকটা নাকি অনেকদিনের জানাশোনা।

মালা বলে, অনেকদিনের জানাশোনা বলেই তো খারাপ। নতুন তবু আপন হয়, পুরনো চিরকাল পর। বুঝলে—পর ! পর !

নির্বিকারভাবে গুইরাম বলে, বাকতাল্লা বাদ দে। আসল হল ট্যাকা।

ট্যাকা। ট্যাকা কি মানুষের সাথে স্বগ্যে যাবে।

আপন বাঁচনেসে বাপকা নাম। ট্যাকা স্বগ্যে না যাক, স্বগ্যে যাওয়াটা আটকায়।

ঘণ্টা জানো ! টাকার লোভ মানুষকে নরকে নিয়ে যায়। তোমার কী গতি হয় দেখো না—দেখো ! তুমি যদি না—

তোর নরকের আমি—

খবর্দার ! আমার বিছানায় বসে ফের মুখ খারাপ করলে ভালো হবে না বলছি !

লে হালুয়া ! কথার পিঠে কথা বলা মুখ খারাপ ? অমন [illegible] ভালো মুখের আমি—

তবে থাক তুমি ! আমি চললুম !

ওদিকে সাবিত্রী তাড়াতাড়ি কলঘরে ঢুকে পড়ে।

গুয়েগুণ্ডা ঠিকই বলেছে। সতীপনা! গুয়েগুণ্ডাকে পাশে বসিয়ে দরজা ভেজিয়ে তার সাথে রসালাপ করতে বাধে না—গায়ে ফোস্কা পড়ে ওর কথাতে! তাও কথার পিঠে কথা!

কত ঢঙই জানে মালা!

গুয়েগুণ্ডার নেকনজরে আছে বলে ধরাকে সরা দেখে। কুন্দরা যাই বলুক, কম উপকার তো গুয়েগুণ্ডা করেনি ওর, করে না? মালার কি উচিত নয় গুয়েগুণ্ডাকে একটু খাতির করে চলা? মালা কি জানে না গুয়েগুণ্ডা বিগড়ে গেলে কী অবস্থা হয়?

চিরটাকাল যখন এখানেই থাকতে হবে—কেন মানিয়ে নিচ্ছে না? মালাটা কেন এত বোকা—ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা যার অসাধারণ?

এদিকে উঠে দাঁড়িয়েও ফের বসে পড়ে মালা। বেশি মান মানাবে না। উঠে দাঁড়ানো সত্ত্বেও হাত ধরে কি টেনে বসাল গুইরাম? এমনিতে না ধরুক, ঝোঁকের মাথায় তো ধরে ফেলতে পারত?

মেয়েটাকে তুমি ফিরিয়ে দিয়ে এসো।

মাইরি আরকি! ফুর্তির প্রাণ গড়কা মাঠ।

তোমার পায়ে—

পড়। লে, পড় পায়ে। দুই ঠ্যাঙ বিছানায় তুলে বসে গুইরাম।

আহা, ভাবছ পায়ে ধরতে পারি না, না?

টেরাই করে দেখ না একবার—ক্যাঁৎ করে এ্যায়সা এক চাট ঝাড়ে গা—

বেশ, তাই— আমায় লাথিই মারো তুমি। তবু—

পেঁয়াজি করিসনি, অ্যাই, ভালো হচ্ছে নি কিন্তুক—মাইরি—আমি রেগে কিন্তুক —বিছানা থেকে তড়বড়িয়ে নেমে যায় গুইরাম। দুস্‌শালা। হাম কাটতা হ্যায়।

ভাবো দেখি ওর মা-টার অবস্থা।

তুমি ভাবো দিকি গুইরামশালার অবস্থা? ভুঁড়িদাসের ট্যাকা হজম করে—

সে টাকা তুমি ফিরিয়ে দাও। আমি তোমায় টাকা দিচ্ছি। গুইরামদা! মালাও উঠে দাঁড়ায়। গুইরামের একটা হাত জড়িয়ে ধরে। আমার এই কথাটা

রাখো। এর বদলে তুমি যা চাইবে, যা বলবে—কাতর মুখখানি তার দিকে তুলে ধরে, আমি তাইতেই রাজী। হ্যাঁ, গুইরামদা—যা চাইবে, যা বলবে—

হুম!

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গুইরাম বলে, খবরটা কে দিল শুনি? ওই বংশে শালাকে যদি না—

না না, বংশী দেবে কেন?

তালে?

পেয়েছি।

পেইছিস তো বুঝতাচ্ছি। কিন্তুক—

আমার মন বলেছে গুইরামদা।

তোর মনের শালা আমি—

হ্যাঁ গুইরামদা, বিশ্বাস করো, সত্যিই আমার মন বলেছে।

মন ছাড়া কী?

বংশী শুধু বলেছিল, গুইরাম ফের একটা দাঁও মেরেছে। তবে এবার আর আতরের ওখানে রাখে নি, ধুকুড়িয়া বাগানে লছমির ওখানে নিয়ে তুলেছে। 'কী দাঁওরে বংশী?' 'ওরে বাবা! আর তোমায় কিছু বলি! সেবার একটুর. তরে গুয়েদা মোর পেট ফাঁসায় নি। আর তোমায় বলব নি। না বাপু, আমায় তুমি কিছু সুধিও নি।'

তার দরকারও হয় নি। সেবার-এবারের কথাতেই বুঝে গিয়েছিল মালা। মালা নয়, মালার মন। চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল বছর নয়েকের একটি মেয়ের মুখ।

এটার বয়েস কত গুইরামদা?

কোনটার?

লছমির ওখানে যাকে—

আস্তানাও জানা হয়ে গেছে! তবে নির্ঘাত শালা রোঘো—

কেন মিছে রঘুনাথকে টানছ। সে কারো সাতেপাঁচে থাকে? বিনা কাজে কখনো ওপরে ওঠে?

তবে কী করে তুই—

বললুম না, আমার মন বলেছে। বলো না, এটার বয়েস কত?

দেড়-দুই হোগা সায়েদ।

দেড়-দুই! মালা আঁতকে ওঠে। একেবারে যে কচি খুকি! দুধের বাছা!

কচি খুকি! বছর বছর বয়েস বাড়বে নি? বয়েসকালে এই কচি খুকিই দেখবি গণ্ডা গণ্ডা কচি খুকি বিইয়ে চলেছে।

গুইরামদা!

তাছাড়া কারবার কি ভুঁড়িদাসের একঠে? হাত-পা ভেঙে চোখ গেলে দিলে এখন থেকেই—

গুইরামদা!

বরং ধাড়ীর চেয়ে ছানাপোনা ভালো। ধাড়ীগুলো যা নেমকহারাম হয়। ইয়াদ নেহি—ও-মর্তবে ক্যায়সা গাড্ডামে গির গিয়া থা? চৌদ্দ পুরুষকা পুণ্যেমে—হাসছিস?

হাসব না! একটা দুধের বাছাকে মার কোল থেকে ছিনিয়ে এনেছ—তোমার এতবড় বাহাদুরিতে না হেসে পারি!

ঘাবড়ে যায় গুইরাম। বারকয়েক মালার মুখখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। তবে কি কথাটা তার বেফাঁস হয়ে গেছে? আসলে সব দোষ ওর মুক্তোমালার মত দাঁতগুলির? ওই দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরাকেই ও হাসি ভেবে ভুল করেছে? নইলে হাসলে কখনো কথা বলতে গিয়ে গলা শ্লেষ্মায় বুজে আসে? চোখ জলে ভরে আসে? শুধু ভরে আসা! গাল দিয়ে ফোঁটা গড়ায়?

আচ্ছা ছিঁচকাঁদুনে তো। রাগ হয়ে যায় গুইরামের। তাছাড়া সেবারে অমন ব্যাপারের পর কোন্ মুখে ও ফের কথা কয়? ভেবেছে কি মালা তাকে—গুয়ে-গুণ্ডা তার হুকুমবরদার? মালার জন্যে নিজের ভালো-মন্দও সে দেখবে না? একবার ঘা খেয়েও আক্কেল হবে না?

ওর পাল্লায় পড়েই সেটাকে সেবার ফিরিয়ে দিতে রাজী হয়েছিল। ওর

মুখ চেয়েই ছুঁড়িটার কান্নাকাটিতে মনটা তারও নরম হয়েছিল শেষ অবধি।

কিন্তু কী মিটমিটে ডান সেই ছুঁড়ি! হাড়-হারামজাদী! বাড়িতে পৌছে দিলে কোন কথা ফাঁস করবে না দিব্যি গেলেও পাড়াতে পা দেওয়া মাত্র সে কী গলা ফাটানো: 'ওগো, কে কোথায় আছ, শিগগীর এসো—এই লোকটা আমায় আইসক্রিম খাওয়াবার নাম করে—'

ভাগ্যিস গাড়ি থেকে নামে নি! ভাগ্যিস রিকসার বদলে হাঁদুর গাড়িটা বুদ্ধি করে নিয়ে গিয়েছিল!

ব্যাক কর হাঁদু, ব্যাক কর! শালীকে চাপা দিয়ে পয়লা খতম কর।

ব্যাক করবে কি, তার আগেই হাঁদু গীয়ার বদলে প্রাণপণে একসিলেটার মাড়িয়ে ধরেছে, হর্দম স্টিয়ারিং পাকানো শুরু করে দিয়েছে।

ওইটুকু মেয়েটার পেটে পেটে এত! ইঞ্জিনের ঘড়ঘড়ানির সাথে সমান তালে খিস্তি শুরু করে গুইরাম। ঈশ! না হয় পড়তই ধরা--এলোপাথাড়ি খানিকটা ব্যাক-গীয়ারে চালিয়ে কেন হাঁদু ওটাকে চেপটে দিয়ে এল না? হাঁদুকে এই মারে তো সেই মারে!

গুইরামদা!

ও হয় না। ব্যস।

হতে হবে।

বলছি হয় না।

আমি বলছি—হতে হবে!

কী?

হ্যাঁ, কী!

হুকুম? তুই আমায় হুকুম করিস?

হ্যাঁ, হুকুম! আমি তোমায় হুকুম করছি। গুইরামদা!

ওদিকে কান খাড়া করে আছে সাবিত্রী: এই বুঝি—এই বুঝি লাথির শব্দ শোনা যায়। দমাদ্দম কিলের শব্দ আর দেওয়ালে মাথা ঠুকে দেওয়ার শব্দ শোনা যায়।

মালার চুল মুঠো করে দেওয়ালে মালার মাথা ঠুকে দিচ্ছে গুইরাম—পরীর মাথাটা নাগালে নেই বলে দেওয়ালে—এই বুঝি আড়াল থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।

গুইরামদা!

কোন উপায় নেহি গুইরামদা! মিওনো সুরে গুইরাম বলে, বাপ মেয়ে বেচে গেছে। গুইরাম ভাগ্যে আনে নি।

বাপ নিজে?

জি হঁ্যা, গুইরামদা—খোদ বাপ। যিসকো পিতাজি বোলা যাতা হায়। দখ্‌নের মানুষরা নাকি খেতে পাচ্ছে না। সেই আকালের মত—

তাই বলে বাপ হয়ে—

মাইজীও সাথমে থা। বাকি বাচ্চাগুলোও পাশ মে থা। ওই ট্যাকায় ওগুলো কদিন খেয়ে বাঁচবে। স্বগ্যে যাওয়াটা কদিন মুলতুবি থাকবে, বুঝলে চাঁদু। আমি যদি ফিইরে দিয়ে আসি—নাফা? ভুঁড়িদাস কি কলকাত্তামে একঠো হায়? মাঝখান থেকে ঝুটমুট হামশালা নুকসান দেগা!

সাবিত্রীর হঠাৎ খেয়াল হয়, বৃষ্টির ছাটে সে একেবারে নেয়ে উঠেছে।

সাবিত্রী ভেবে পায় না, গুইরামের কথায় মালা অমন চমকে উঠল কেন? ঘণ্টাকয়েক ভাবার পর কারণটার সে হদিস পায়—বাপ মা ভাইবোন কাকে বলে, তার পরিচয় পায় নি মেয়েটা। তাই মা বাপ ভাইবোন সম্পর্কে পরের মুখে শোনা কথাটা আঁকড়ে ধরে আছে। চলতি ধারণাটা সত্যি ভেবেছে।

মা অবিশ্যি একটা ছিল, কিন্তু সুখের দিনে সময় বুঝে মরে গিয়ে মা সম্পর্কেও চিরকেলে ধারণাটা বদলাবার সুযোগ দেয় নি।

সময়মত মরে যাওয়ার চেয়ে ভালো আর কিছু নেই। ছেলে বিয়োতে গিয়ে মালা যদি মরে যেত, আজ এভাবে দগ্ধে দগ্ধে মরতে হত না। মেয়েকে গেরস্থ ঘরের বউ করার জন্যে স্বামীর জিম্মায় গছিয়ে দিয়ে স্বামীর কোলে মাথা রেখে মরে একেবারে বেঁচে যেত।

মেয়ে ফেরত দেবার জন্যে স্বামীটাও তাহলে হন্যে হয়ে ঘোরাঘুরি করত না। হাজার হলেও মানুষটা তো আসলে মোদো-মাতাল ছিল না? পেটে ও জিনিস না পড়লে না ভালোই থাকত?

মালার কথার দশ ভাগের এক ভাগও সত্যি হয়, অসাধারণ ভালো বলতে হবে। তবু—কী যে হয়ে গেল!

বেচারা! দু-দুটোই বেচারা!

স্বামীটাও যদি লীভার পচিয়ে সময় থাকতে ফৌত হত! জ্যান্ত স্বামীকে ঘেন্না করলেও শিবরাণীর মত মরা স্বামীটার ফটো পুজো করেই রীতিমত একটা নাম করে ফেলতে পারত অন্নর মেয়ে মুক্তোমালা।

মালার জন্যে, সুধাময়ের জন্যে মন সাবিত্রীর টনটন করে। এত বেশি টনটন করে যে মনে মনে সে মা কালীকে ডেকে বলে, এখনও সময় আছে, মালাকে স্রেফ মেরে ফেল মা! মানুষের মৃত্যু তো! আচমকা যদি মেয়ের মরার খবর চলে আসে, এ-মাগীর কী গতি হবে বলত?

পটল ঘরে ঢুকে বলে, কার সাথে কথা কইছিস রে?

সাবিত্রী বলে, মনের মানুষের সাথে।

পটল বলে, মনের মানুষটা ঘরে এলে যে ফিরেও চাইবে না! এখনও এলিয়ে আছিস?

এই যাই। এবার গা ধুতে যাব। ঘরটা একটু সাফসুফ করে রাখি। কী নোংরা হয়েছে দেখছিস।

কুলুঙ্গির কাছে দাঁড়িয়ে কালীর পটের দিকে চেয়ে কথা বলছিল সাবিত্রী। মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে পেছন ফেরে।

ওমা!

কেন? খারাপ দেখাচ্ছে? দেখ, ভালো করে দেখ দেখি—

ঘুরে দাঁড়ায়, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজেকে দেখায় পটল: লুঙ্গি করে পরা নীলাম্বরী। তার ওপর সাদা শেমিজ। গায়ে লাল ব্লাউজ। সোনালী জরির ফিতে জড়ানো লম্বা বেণী।

গালে ঠোনা দিয়ে সাবিত্রী বলে, এটা কোন্ দিশি হল ?

খারাপ দেখাচ্ছে ? মানায় নি ?

তোর লজ্জাও করে না ? এভাবে সঙ সাজতে তোর—

সঙ নয়। আজ আমার এই ড্রেস। দেখিস এর ঠেলায়—

ঘেন্না !

আচ্ছা, এবার—এইবার দেখ দেখি। দেখ—বাঁ হাত কোমরে রেখে, ডান হাত ওপরে তুলে নাচের ভঙ্গিতে বেঁকে দাঁড়ায় পটল। মাথা ঘুরে যাবে, বুঝলি, মাথাখানা বন্-বন্-বোঁ-ও-ও-ও ! থলথলে শরীরটাকে পাক খাওয়াতে গিয়ে টাল সামলাতে খাটের বাজু ধরে ফেলে পটল।

মুখপুড়ি ! লাজ-লজ্জার বালাই না থাক, ঘেন্নাপিত্তিও নেই ? তুই কি মানুষ নস ?

মুখ গম্ভীর করে পটল বলে, তুমি বড্ড হিংসুকে ভাই ! লিলি ইস্তক তারিফ করল, নাচ দেখিয়ে আস্ত একটা চার মিনার মুজরো আদায় করলুম, আর তুমি—

হিংসুকে ?

পাছে তোর কপাল ভাঙে এই ভয়ে তুই গেলি। আমায় দেখলে তোর দিকে সে ফিরে চাইবে ? ঠোঁট উল্টে পটল বলে, তা আমিও রইলুম বারান্দায়—সিঁড়িতে সাড়া পাওয়া মাত্তর 'আ-যা-আ' বলে এমন গান ধরে দেব !

ক্ষেপী !

বাঙাল !

পটল বেরিয়ে যায়। থলথলে করতে করতে। নাচের তালে।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সাবিত্রী।

আর কোনদিন এদের সাথে দেখা হবে না—এই পটল পরী লিলি মালা কুন্দদির সাথে। মানদা গুইরাম বংশী রঘুনাথের সাথে। চেনা জানা আরও কত জনের সাথে।

আর কোনদিন চোখের আলাপীকে নাগর বলে সোহাগ বেচতে হবে না।

গলা টিপে ধরার সাধ পুষে রেখে গলা জড়িয়ে ধরতে হবে না। ঘেন্নায় শরীরের শিউরে ওঠাকে সুখের শিহরণ করে তুলতে হবে না। আর কোনও দিন!

তবু, তবু এদের কথা তার মনে পড়বে। সকলের কথা। কতবার! বার বার। মনে না পড়তে চাইলেও সে মনে করবে।

অবু মাস্টার, সুভাষিণী, ননী, ফনী, সুষমা, সুরমা, টুলুদের সাথে এদের কথাও।

মালার মত অতীতকে সে ভোলার জন্যে ব্যাকুল হবে না। অতীত ভেবে দিশেহারা হয়ে যা-তা করে বসবে না। অতীতের কী দোষ!

অতীতটাই না জীবনের সাথে হাতেকলমে মানুষের পরিচয় করিয়ে দেয়। বর্তমানকে চিনিয়ে দেয়। ভবিষ্যৎকে জানিয়ে দেয়।

অতীতই না স্বামীকে সুবর্ণর ফিরিয়ে দিল।

আমার কী মনে হত জানো, সোনা। মনে হত—শৈলর জন্যে আমায় তুমি ঘৃণা—না না, কথাটা আগে বলতে দাও—ঘৃণা কর। এই ভেবে ঘৃণা কর যে লোকলজ্জায় তোয়াক্কা না করে যে নিজের বিধবা বৌদিকে নিয়ে ঘর করতে পারে—কিন্তু—বিশ্বাস করো সোনা, শৈলকে আগে ভালোবাসলেও তোমায় দেখার পর থেকেই—

হিন্দুর মেয়ে কি স্বামীকে ঘৃণা করতে পারে গো?

কী জানি! আমার কিন্তু কেবলি মনে হত—যাক, আজ আর সে সমস্যা নেই!

কাল সাবিত্রী ভেবেছিল—সমস্যাটা বুঝি শৈলই। শৈল নেই বলে সমস্যাটাও নেই।

তা নয়। ঘৃণ্য আজ দুজনেই। দুজনেরই অতীত এক সুরে বাঁধা।

সেদিন পাছে সুবর্ণ শৈলর খোঁটা দেয়—আগে থেকেই ভুজঙ্গ তাই উল্টো চাপ দেওয়া শুরু করেছিল।

আজ সে ভুজঙ্গকে কিছু বলতে পারবে না, ভুজঙ্গও তাকে কিছু।

ভুজঙ্গ আজ নতুন করে ঘর বাঁধতে চায়।

নতুন করে ঘর বাঁধবে সাবিত্রীও। অতীতকে ধুয়ে-মুছে ফেলে। মালার মত না হয়েও মনে রাখবে সে মালার মা অন্নর উপদেশগুলি—মনে করিস মা, সংসারে তোর কেউ নেই। কেউ নেই! মা বাবা ভাইবোন ভাইঝি সব—সব্বাই মরে গেছে। মরে ফৌত হয়ে গেছে। সোয়ামী-সংসার ছাড়া এ-তুনিয়ায় কেউ নেই তোর!

সাবিত্রীও তৈরি হয়ে আছে।

আর সকলের সাথে তার তৈরি হয়ে থাকার তুলনা হয় না: পরনে সাদাসিদে শাড়ি-ব্লাউজ, এলো-খোঁপা চুল। গায়ে এক রতি সোনা নেই।

বড় ভুল হয়ে গেছে: যদি বলে দিত যে, গয়নাগুলি গিল্টির নয়, সোনার। সব সোনার। আসল সোনার। স্বর্ণর। স্বর্ণ মানে সোনা নয়? পাকা জহুরী হয়েও কেন সে এটা টের পায় নি?

প্যাঁচানো কথায় সে-ও যদি বলত, স্বর্ণর সব গয়না স্বর্ণর! শুনে প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও পরে খুশিতে উথলে উঠত। নাক টিপে দিয়ে বলত, মুখচোরা বাঙালনী তো দিব্যি কথা শিখেছে!

সাবিত্রী এবার স্বর্ণ। স্বর্ণ যখন, এক কাপড়ে বেরিয়ে যেতে বাধবে কেন? এই বেশে বেরিয়ে যেতে?

এখানকার সবকিছু বংশীকে দিয়ে যাবে।

যাওয়ার পথে দোকান থেকে পরনের এই শাড়ি-ব্লাউজ বদলে নেবে। এগুলো প্যাকেট বেঁধেও দোকানে রেখে যাবে। মনের ভুলে।

যাওয়ার পথেই গয়নাগুলি বেচে দেবে। কী হবে স্বর্ণর গয়না দিয়ে? অক্ষয় হোক তার হাতের শাঁখা, সিঁথির সিঁদুর। স্বামীর চেয়ে বড় গয়না মেয়েমানুষের আছে নাকি!

মা হবার যার মুরোদ নেই, গয়না পরে সে কোন্ লজ্জায়!

ভুজঙ্গ টাকার কথা তুলতে সাবিত্রী বলে, চোখে তোমার ছানি পড়েছে।

ছানি? আমার চোখে? প্রাণপণে চোখ বড় করে ভুজঙ্গ। তা হবে। নইলে তোমায় এমন বিধবা বিধবা দেখব কেন!

কথার কী ছিরি! রাগ দেখিয়ে সাবিত্রী বলে, সঙ না সাজলেই বুঝি—কেন, আর কোন দিকে চোখ পড়ে না? বলে মুখ নামায়: মুখটা খানিক হেঁট না

করলে সিঁথির :দিকে নজর পড়বে? কৌটো-উজাড়-করা সিঁদুর পরাটা বরবাদ হয়ে যাবে?

ছানির কথা ভুলে গিয়ে ভুজঙ্গ ফের পুরনো কথা পাড়ে, নতুন সংসার পাতার খরচ কম! যেমন ধরো—

কত? এক হাজার? দু হাজার? তিন হাজার? এটাচিটা ভুজঙ্গর দিকে ঠেলে দেয় সাবিত্রী; খুলে দেখ। সাধে বলি, চোখে ছানি পড়েছে। নইলে এগুলি গিল্টি না আসল বুঝতে পারো না। তাও যে-সে দোকানের জিনিস নয়, প্রত্যেকটি সরকার-বাড়ির ছাপ মারা।

নিজেই সে এটাচিটা খুলে মেলে ধরে।

দু চোখ ভরে দেখে ভুজঙ্গ!

কী, ভাবনা এবার ঘুচল?

দীর্ঘশ্বাস চাপে ভুজঙ্গ। কী যেন একটু ভাবে। ভাবিত ভাবে বলে, ভাবি কি আর শথ করে গো। কাল-পরশুর মধ্যে ছ মাসের ভাড়া গুণে দিতে হবে। সে তোমার প্রায় সাতশো টাকার ধাক্কা। সেই সাথে সেলামি পাঁচশো।

অ্যাঁ! ভাড়া দাও নি? তবে যে কাল—

ভাড়া দিইনি, কথা দিয়েছি।

কথা!

বাঃ, কথার দাম নেই? কথাতেই ও-বাড়ি বাঁধা পড়ে গেছে। চেনাশোনা লোক।

স্থির দৃষ্টিতে ভুজঙ্গর দিকে তাকায় সাবিত্রী। চোখ ঘুরিয়ে নেয় ভুজঙ্গ।

তবু—বুঝলে না—

সাবিত্রী বলে, বুঝেছি! বলেই ধাঁধায় পড়ে যায়, কেন বুঝল? নাকি বোঝে নি? নাকি সত্যিই বুঝে গেছে?

এটাচিটা ভুজঙ্গ কোলে তুলে নেয়। পা তুলে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে।

তাছাড়া, গোপন কথার ফিসফিস সুরে ভুজঙ্গ বলে, মোটা টাকার মস্ত একটা মওকা যখন এসে গেছে, কেন ছাড়ি?

রঙকা ?

হেরম্বর—

হেরম্ব ?

ওই ব্যাটাই তো যত নষ্টের গোড়া। সব আমি শুনেছি, সোনা। জানো, রাসকেলটা তোমার মত অনেক মেয়েকেই—

বাধা দিয়ে সাবিত্রী বলে, কিন্তু—ওগো—কেন আর ও নিয়ে—

উঁ-হু! আমি ছেড়ে দেব না। হারামজাদা আজ পাইকপাড়ায় বাড়ি হাঁকিয়েছে। টাকায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। একটা বারের লাইসেন্স বাগিয়েছে, মেয়ে-বয়ওলা দু-দুটো রেস্টুরেন্ট ফেঁদেছে—ওকে কক্ষনো—

তাতে আমাদের কী! আমরা কেন মিছিমিছি—

আমাদের কী? মিছিমিছি? এতগুলো মেয়ের সর্বনাশ করে স্কাউণ্ড্রেলটা মাথা উঁচু করে চলবে? জানো, এক এটর্নীর মেয়ের সাথে ওর বিয়ের কথা চলছে? সেখানেও কোন্-না পনেরো-বিশ হাজার—

যার যা ইচ্ছে করুক, আমাদের কী এসে যায়। আমরা ছুটিতে নিরিবিলি—

এসে যায় সোনা, এসে যায়! স্বামী হলে বুঝতে এসে যায় কিনা! দাঁত কিড়মিড় করে ভুজঙ্গ। আমার স্ত্রীকে যে-লোফারটা—

সাবিত্রী মুখ ফেরায়। চোখ বোজে। কান বুজতে চায়।

কেন আর ওসব কথা তোলা? কেন আর! পচে-গলে-যাওয়া অতীত নিয়ে কেন আর ঘাঁটাঘাঁটি করা?

হেরম্বর ওপর রাগে? ওর বউকে হেরম্ব বার করে এনেছিল বলে?

কিন্তু ও কি সব জানে? জানে কি যে সাবিত্রীই আগে হেরম্বর দ্বারস্থ হয়েছিল? তিন দিনের মধ্যে যে-কোন-একটা ব্যবস্থা না করে দিলে আত্মঘাতী হয়ে হেরম্বকে ফাঁসাবার ভয় দেখিয়েছিল?

'পরে আমায় ছুঁড়বে না?'

'ছুঁড়ব! চিরকাল তোমার কেনা হয়ে থাকব।'

জানে কি যে এখানে তাকে রেখে যাবার সময় সেই ঘড়েল মানুষটারও চোখ-মুখের ভাব কেমন বদলে গিয়েছিল ?

'তুমি বড় বোকা সুবর্ণা। সত্যিই বাঙাল। দেখ তো জবা কেমন দুকূল বাঁচিয়ে চলেছে। কত মেয়ে চলছে। কটা দিন তোমার তর সইল না। তোমার না তোমার বাবারও না। ব্যবস্থা কি একটা হত না ? দীপ্তিরা পর্যন্ত—'

'দুকূল বাচিয়ে !'

কথার মাঝখানে অমন করে না হেসে উঠলে কি এখানে এসেও অত সহজে তাকে রেখে যেত হেরম্ব ? হেরম্ব যে হেরম্ব—এই ঘরে ঢুকে তারও মনটা বেতাল হয়ে যায়নি ? মাসে শ খানেক পেলে চলবে কিনা জানতে চেয়েছিল কোন মতলবে ? সাবিত্রী বুঝি টের পায় নি ?

টের পেয়েও টের পেতে চায় নি : বেতাল মনটা তার কদিন বেতাল থাকবে ঠিক কি ? তারপর ? বাঁধনই যদি ছিঁড়ল তবে আর শ খানেকের বাঁধাবাঁধি কেন ? কী হবে এক শ টাকায় ?

কিন্তু হেরম্বকে সেদিন বিশ্বাস না করলেও শত্রু বলে কি ভেবেছে কোনদিন ? এখনই বা কী করে ভাবে ?

তেজী গলায় ভুজঙ্গ বলে, বুঝলে, এই সব লোক হল সমাজের শত্রু। জাতির কলঙ্ক। এদের কাপড় খুলে যদি কষে চাবকানো যায়—

হেরম্বকে চাবকাবে আজ !

কিন্তু হেরম্ব না থাকলে সাবিত্রী কি সুবর্ণ হয়েও টিকে থাকত ? সুবর্ণ না থাকলে কার কাছে তখন হেরম্বকে চাবকাবার ইচ্ছেটাকে অমন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে জানান দিত ?

বাবার কাছে সব শোনার পর থেকে—

বাবা ?

উনিই তো সব বললেন।

বাবার সাথে তোমার দেখা হয়েছিল ? সাবিত্রী চমকে ওঠে।

সোয়াইনটার নামে আমি কেস করব।

কেস করবে? চমকের হোঁচটটা সামলাতে না সামলাতে খানায় পড়ে যায় সাবিত্রী।

হয়ত তার দরকার হবে না। কড়া করে একটা উকিলের চিঠি ঝাড়তে পারলেই, ব্যস—বিয়ের আগে কেলেঙ্কারির পথ নিশ্চয় এড়িয়ে চলবে।

হেরম্বকে সাজা দেওয়ার জন্যে নয়, কেস করবে টাকার জন্যে? তাই উকিলের চিঠি পেয়ে সে টাকা দিয়ে দিলে কেস করার আর দরকার হবে না?

ব্যাকুলভাবে সাবিত্রী বলে, টাকার জন্যে কেস করবে? কেন তুমি টাকার জন্যে এত ভাবছ? ওই গয়নার দাম কত জানো? ক হাজার? ওই সঙ্গে নগদও—

তবু—

জানো, এই ঘরের সব কিছু সিকি দামে বেচলেও—

তাও বেশ কিছু। জানি। কিন্তু টাকা কি কখনো বেশি হয়, সোনা? টাকার প্রয়োজন কখনো ফুরোয়? কেস আমি করবই। পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করেই ও পার পেয়ে যাবে? প্রাণ থাকতে ভুজঙ্গ গাঙ্গুলী সইবে না।

রুমাল দিয়ে প্রাণপণে ঘাড় ঘষে ভুজঙ্গ।

কেস হলে আমায় সাক্ষী দিতে হবে?

কেস হলে তো!

যদি হয়?

হবে না। উকিলের চিঠি পেলেই—

ধরো, কেস হল?

তাহলে অবিশ্যি—

বাবাকেও সাক্ষী দিতে হবে?

তা—

মাকেও? ননীকেও? বুড়ি, ছুটকি, টুলুকেও? ফনী—ফনীকেও সমন দিয়ে এনে—

ওদের কথা ভাবছ কেন? সোজা আঙুলে ঘি যদি না-ই ওঠে—সাক্ষীসাবুদের জন্তে আটকাবে না। ওটার ওপর বাবার যা রাগ দেখলুম!

আচ্ছা!

ভীষণ!

হেরম্বর ওপর অবু মাস্টারের রাগ? যে-হেরম্বর সাথে দুদিনের আলাপেই অবু মাস্টার বুঝে গিয়েছিল 'বড় কামের পোলা' সে?

'আইজ্‌কাইলের মধ্যেই আমাগোরও একটা গতি' করার জন্তে বাপ ডেকে যে-হেরম্বকে সকাতর মিনতি জানিয়েছিল অবু মাস্টার। নিজে সুবিধে করতে না পেরে মেয়েকে শেষে ঠেলে দিয়েছিল: 'এ্যামনে তো দিনরাত হেরম্বদা হেরম্বদা কইরা মরস—অখন যত লজ্জা।'

লজ্জা! স্বামী-তাড়ানো আদালত-ফেরা মেসেজ-ক্লিনিকের মেয়ের লজ্জা!

গা ঝাড়া দিয়ে বসে সাবিত্রী। অর্থাৎ অবু মাস্টারই উস্কে দিয়েছে। নইলে হেরম্বর কথা ভুজঙ্গ জানবে কী করে?

ব্যাপারটা পলকে স্পষ্ট হয়ে যায়:

মাসকাবারী বন্ধ হতে জামাইকে শ্বশুর ডেকে পাঠায়। জামাই বলে কথা! আপন জন। তায় প্রয়োজন।

ঠিকানা দিয়ে সে-ই পাঠিয়েছে।

প্রয়োজন হলে কেসে সাক্ষী দেবার জন্তে ছেলে-মেয়ে-বউ-নাতনী নিয়ে পা বাড়িয়ে আছে।

হেরম্বর মত ভুজঙ্গও প্রথমে দ্বিধা করে থাকলে ভারিক্কি চালে মাথা নেড়ে নেড়ে বলেছে, 'বুঝছি! কী কইতে চাও বুঝছি! কিন্তু আমরা রিফুজী বাবা—আমাগো কি—কইরে—'

সোনার বদলে একসাথে বুড়ি ছুটকি ননী টুলুকে 'কইরে' বলে ডাক দিয়েছে। অবিকল সেই সেদিনের মত।

বউকে ডাক দেওয়াও বিচিত্র না। 'এ্যামনে তো দিনরাত জামাই জামাই কইরা মর, অখন যত লজ্জা!' বলে।

না। আস্তে আস্তে ঢোঁক গিলে মা-ও হয়ত মেয়ের মতই বলেছে, না, লজ্জা কিয়ের!

হ্যাঁ, কিসের লজ্জা? বাপ হয়ে অবু মাস্টার যদি প্রয়োজনের সাথে এমন বেমালুম মানিয়ে নিতে পারে, মা হয়ে সুভাষিণী পারে না?

ভাই বোন হয়ে সুষমা সুরমা ননী পারে না? ভাই-ঝি হয়ে টুলু?

মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা যা অসীম বাঙাল রিফুজীদের।

সুতরাং সাক্ষী দিতে রাজী আছে সবাই।

কিন্তু অবু মাস্টার কি জানে না যে উকিলের চিঠিতে ভড়কাবার বান্দা হেরম্ব নয়? তিন হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে একদিন যে আসামীর কাঠগড়া থেকে নেমে এসেছিল, সে আজ পাইকপাড়ায় বাড়ি হাঁকিয়েছে, একটা বার, দুটো হোটেল ফেঁদেছে, বনেদী ঘরের জামাই হতে চলেছে—উকিলের হুমকিতেই সে সুড়সুড় করে টাকা বার করে দেবে? তার বিরুদ্ধে হাতেকলমে কোনরকম প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও? এ বাড়িতে কি আর ভুলেও কখনো পা দিয়েছে হেরম্ব যে দরকার হলে কুন্দরা তাকে সনাক্ত করবে?

শুধুমাত্র সাবিত্রীর আপনজনের সাক্ষীতে টিকবে তো কেস?

কেস টিকুক না টিকুক, কাগজে কাগজে ফলাও হয়ে বেরোবে সেই কেসের খবর। কেস ফেঁসে যাওয়ার খবরও। হুবহু উষা চক্রবর্তী ওরফে ললিতার মত।

আগে থেকেই বদ ছিল বলে উষার মামলা খারিজ হয়ে গেছে, আর সুবর্ণ ওরফে সাবিত্রী তো পাঁচ বছরের বাসিন্দা এখানকার। নিজে থেকে খাতায় নাম-লেখানো।

কেস ফেঁসে গেল এই আপনজনেরাও পর হয়ে যাবে। যেমন গেছে উষার।

পরও তখন আপন হবে না: কে জানে বাবা, ঘাগী মেয়ে, কাকে কখন কী মতলবে ফাঁসিয়ে দেবে—কাজ কী!

সাবিত্রীর দিন চলা তখন ভার হবে। হুবহু উষার মতই।

হয়ত দুবেলা রোজ খাওয়াও জুটবে না। এ বাড়ি ছেড়ে বস্তিতে গিয়ে উঠতে হবে। উষার মত।

নিজের ভবিষ্যৎটা যেন স্পষ্ট সাবিত্রী দেখতে পায়।

দু হাত দূরে এটাচি থেকে এক-এক করে গয়নাগুলি বার করে করে দেখছে ভুজঙ্গ। চোখ দুটি তার ছলছল-র বদলে ঝিকমিক করছে। লকলকে জিবখানা তার নিচের ঠোঁটটা হর্দম চাটাচাটি করছে।

সাবিত্রীর মনে হয়, সামনে সে পাহারা না থাকলে ভুজঙ্গ বোধ হয় প্রতিটি গয়না—দুটি হার, চুড়ি, চুর, কঙ্কন, বালা, রুলি, মানতাসা, আর্মলেট, এমন-কি কানের ওই পাশা-ঝুমকো, নাকের নাকছাবি আর খোঁপার বাগানটিও—নিজে একবার পরে দেখত। গয়নাগুলির আসলত্ব গায়ে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে পরখ করে দেখত।

দেবে নাকি সেই সুযোগ লোকটাকে?

ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল যে এটাচি নিয়ে কেটে পড়বে, উপায় নেই। সদরে ওত পেতে আছে দুটো কুকুর। গন্ধ শুঁকেই টের পেয়ে যাবে নির্ঘাত।

বেহুঁশ পটলের গলার হার, কানের মাকড়ি আর হাতের দুগাছা চুড়ি লোপাট হয়ে যাওয়ার পর থেকে ওরা ভয়ানক হুঁশিয়ার হয়ে গেছে। পরীর অ্যাসট্রেটা পকেটে ফেলে ভাগছিল একজন, পকেট উঁচু দেখেই পাকড়ে ফেলে রঘুনাথ।

সাবিত্রী উঠে দাঁড়ায়।

আঁচল ধরে খপ করে তাকে টানে ভুজঙ্গ। সাপটে টেনে আনে। এলোপাথাড়ি চুমো দেয়। কোলে বসিয়ে মোলায়েম আদর করে। হুবহু এটাচিটার মত।

হয়েছে?

চললে কোথায়?

আসছি।

বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, সোনা।

হঠাৎ-আদরের তাই অত ঘটা?

ঢুলুঢুলু চোখে সাবিত্রী বলে, তাইত যাচ্ছি।

না বলতে কী করে টের পেলে গো ?

কোমর দুলিয়ে ঠোঁট উল্টিয়ে এক চোখ বুজে সাবিত্রী বলে, বউ যে বরের কথা টের পায় গো।

ঠিক ঠিক! গদগদ গলায় সায় দেয় ভুজঙ্গ। শাস্ত্রে বলেছে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সাত জন্মের। মুখের কাছে মুখ নিয়ে আসে। ঠোঁট সূচলো করে। চা-টা যেন খুব কড়া হয়—কেমন। দাও!

ধাঁ করে স্বামীকে একটা চুমু দিয়ে ফেলে সাবিত্রী বলে, ভদ্রলোক কি তেষ্টা পেলে চা খায় ?

থতমত খেয়ে মুখ সরিয়ে নেয় ভুজঙ্গ, বিশ্বাস করো—এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে—তাও মাত্র—আপন্ গড—বড় জোর এক পেগ—বিশ্বাস করো—

তোমায় কি অবিশ্বাস করতে পারি! তুমি খাইনি বললেও বিশ্বাস করতুম। হিঁদুর মেয়ে হিঁদুর বউ না আমি!

নিজের ঘরের সামনে চেয়ারে বসে আছে পটল।

রেলিঙে পিঠ দিয়ে সিগারেট টানছে লিলি।

ঘরের চৌকাঠে নেশায় ঝিম মেরে বসে পানের জাবর কাটছে পরী। থেকে থেকে ফিকফিক হাসার মত পায়ের কাছে পিক ফেলছে। বাঁ হাতে শালপাতা মোড়া দুটি পান উঁচিয়ে ধরে আছে।

থেকে থেকে ঘর-বার করছে কুন্দ।

কথা নেই কারো মুখে। তৈরি হয়ে আছে সবাই। সাধু ভাষায়—প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে।

মাদুর বিছিয়ে বারান্দার একপাশে কাত হয়েছে মানদা। মাথার কাছে দুধের বাটি। আফিঙের ঘোরটা গাঢ় হয়ে এলেই বাটিতে চুমুক মেরে রাতের মত নিশ্চিন্ত হবে।

ঘর থেকে ফের বেরোতেই সাবিত্রীর মুখোমুখি হয়ে যায় কুন্দ।

বলে, আনমনেই হাসছিস যে লা ?

হাসব না! এত হাসাতেও পারে!

নাগর বড় রসিক বুঝি?

রসিক বলে রসিক! বলে কি জানিস, বেশ তো গিন্নিবান্নি দেখাচ্ছে, তা কাপড়ে হলুদের দাগ নেই কেন?

ইল্লি! লিলি বলে ওঠে, হলুদের দাগ! ঠিক শুনেছিস তো? তাহলে বললি না কেন, দেখবে কত দেখাই এসো—

কুন্দ বলে, আস্তে! শুনতে পাবে যে!

গলাটা আরেকটু চড়িয়ে ছড়াটা লিলি শেষ করে।

কলকল হেসে সাবিত্রী বলে, যা বলেছিস মাইরি! আরেকবার বল তো ভাই—মুখস্থ করে ফেলি—দেখবে কত, দেখাই এসো, যেটাই দেখার সাধ—দেখার চোটেই দেখো যেন—

ধমক দিয়ে কুন্দ বলে, এই—হচ্ছেটা কি! ছি!

কুন্দকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে সাবিত্রী। তোর যে ভারি দরদ রে কুন্দদি। বলি চক্কোত্তী কি—

আঃ! ছাড় মুখপুড়ি ছাড়—দিলি তো খোঁপাটা ভেস্তে! সাবিত্রীকে ঠেলে সরিয়ে দেয় কুন্দ। তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘরে ঢোকে। হায় হায়! এত মেহনতে বানানো খোঁপাটা তার গেল বুঝি তছনছ হয়ে!

টানা টানা দুই চোখ মেলে সাবিত্রীর দিকে চেয়েছিল পরী, চোখ চেয়েই যেন ঘুমুচ্ছিল, চোখোচোখি হতে গম্ভীরভাবে বলে, সরে যাও—পিক ফেলব।

সাবিত্রী বলে, ফেল না। পায়ে লাগলে আলতা হয়ে যাবে।

সঙ্গে সঙ্গেই তার পায়ে পচাৎ করে খানিকটা পিক ফেলে দেয় পরী।

পানের পিক নয়—বুকের জ্বালা উগড়ে দেয় যেন : ঢঙ হচ্ছে! বড় করে তাকে কোণঠাসা করে তোফা আছে সবাই! সকালে ভাত আনাবার তরে একটা টাকা ধার চেয়েছিল, খুচরো না থাকার অজুহাতে এই সাবিত্রীই কি ভাগিয়ে দেয় নি?

একটা টাকার অভাব অবশ্য আজও পরীর হয় নি, এবং বিনা স্বদে দু-একশো ধারের কথা নিজে থেকেই মানদা কবুল করেছে। সাবিত্রীর কাছে টাকা চেয়েছিল

সে মনটা ওর ঘেঁটে দেখার জন্যে : এ বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে, ধার আর ফেরত পাবে না বুঝে একটা টাকার মায়া সাবিত্রী ছাড়তে পারে কিনা দেখতে।

শুধু সাবিত্রী নয়, একটি করে টাকা ধার পরী সকলের কাছেই চাইবে ভেবেছিল—সে-ও এখান থেকে উঠে যাচ্ছে শুনেও টাকা ধার কেউ দেয় কিনা দেখতে।

সাবিত্রীর অজুহাত শুনে আর এগোয় নি।

আসলে যার যা-কিছু দরদ মুখে।

এই যে একটার পর একটা দিন তার বরবাদ হয়ে যাচ্ছে, কেউ ফিরে চায় ? শুধু গান গাইবার জন্যেও মালা কাল তাকে ডেকে পাঠাতে পারত না—এগারো নম্বর থেকে বাসনাকে না আনিয়ে ?

আসলে সব স্বার্থপর। স্বার্থপর ! যে যার নিজেরটা নিয়ে ব্যস্ত।

ফের পানের পিক ফেলে পরী। সশব্দে।

সাবিত্রী বলে, একটা পান দে না ভাই। পায়ের আলতা হল, এবার ঠোঁটের লিপস্টিকটা—

কিনে খা !

দে ভাই দে। তোর দুটি হাতে ধরি।

তবে মুখ নামা—দি। শুধু লিপস্টিক কেন, মুখভরে রুজ-পাউডার মাখিয়ে দি।

মানদা বলে, কেন ওকে জ্বালাচ্ছিস সাবি। ঘরে যা। আর পরী, তুইও—

পরী ঝাঁঝিয়ে ওঠে, নিজের ঘরেই তো আমি আছি। তোমার বারান্দা ছুঁয়েছি ?

ঝুটমুট কেন—

রীতরেয়াজ ?

নাও ! ভালো কথা বললুম—

মানুষটা যখন আমি ভালো নয়, কী দরকার ভালো কথা বলার ?

তোর ভালোর তরেই মা—

থাক ! ভালো আমার দুনিয়াভর সবাই করল, বাকী শুধু মানী বাড়িউলী !

কী ! আফিঙের মৌজ ঝেড়ে ফেলে ফোঁস করে উঠছিল মানদা, দুটো লোক নিয়ে রঘুনাথকে সিঁড়ি ভাঙতে দেখেই নেতিয়ে পড়ে। কাত হয়ে গুড়ি মেরে শোয়। শুয়ে, বাটি তুলে চুক চুক দুধ খাওয়া শুরু করে দেয়।

পরীও উঠে দাঁড়ায়। দড়াম করে বন্ধ করে দেয় দরজা।

লোক দুটোকে নিয়ে রঘুনাথ লিলির ঘরে ঢোকে। ইশারায় লিলিকে ডেকে নিয়ে।

এপাশ থেকে কুন্দ আর ওপাশ থেকে পটল হুঁশিয়ার হয়ে ওঠে সাথে সাথে। প্রাণপণে কটাক্ষ হানে। একটানা, লোক দুটির পিঠ তাক করেই।

বলা যায় না, হঠাৎ যদি পেছন ফেরে ?

মানুষ দুজন তো ? শরীরটা লিলির ভালো যাচ্ছে না তো ?

চাপা গলায় মানদা বলে, এই সাবি, ঘরে যা। ঘরে লোক রেখে বাইরে আড্ডা দেয় না। এ তোর কী বিচ্ছিরি অভ্যেস হচ্ছে।

একবার কুন্দ একবার পটলের দিকে তাকায় সাবিত্রী। মুগ্ধ চোখে ওদের কটাক্ষহানা দেখতে দেখতে ভাবে নিজের কথা: ভুজঙ্গ ঘরে না থাকলে সে-ও এখন, ওইভাবে কটাক্ষ হানত। হানতে হত। রেষারেষি করে কটাক্ষ হানার পাল্লা চালিয়ে দিত। দিতে হত।

কটাক্ষ হানতে হানতেই মনে মনে ওদের সাথে মিলিয়ে দেখত নিজের সাজসজ্জা: তার ওপরে কেউ টেক্কা দিয়ে বসে নি তো ? কেষ্ট বহুরূপীর মত দেখালেও ওই বেশেই ধুমসীটা বাজী মেরে দেবে না তো ? বাজী মেরে দেবে না তো বাহারী খোঁপাওলা পাকাচুল বুড়িটা ? ভাগ্যিস পরীটা অকেজো পড়ে আছে। টানা টানা ওর চোখের দিকে চোখ পড়ে গেলে সহজে কেউ ওকে ডিঙিয়ে যেতে পারে ? সাধে পরীর সাথে ঘর বদলাবার জন্যে অত চেষ্টা করে লিলি।

নিজেদের অস্তিত্বটা জানান দেবার জন্যে প্রথমে গলা সকলের খুশ-খুশ করে উঠত। তারপর আজেবাজে কথা নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি শুরু করে দিত। বাইরে হাসলেও ভেতরে ভেতরে সকলেই মুণ্ডপাত করত সকলের।

শত সুখ-দুঃখের সাথী এই মেয়েগুলি যে তখন কী ভীষণ শত্রু হয়ে উঠত!

হয়ে ওঠে!

পেটের আগুনে প্রাণের ভালোবাসাটা যে কত সহজেই ধোঁয়া হয়ে যায়!

ভুজঙ্গ এখন ঘরে আছে বলেই না মনটা তার উদার বনে গেছে? নিজেকে আলাদা ভেবে এইসব কথা সে ভাবতে পারছে? নির্বিকার হয়ে ওদের কটাক্ষহানা দেখতে পারছে?

তবু, শত্রু হোক, সখী হোক—এরাই তার আপনজন। এদের সে বোঝে। এতদিন সংসারে থেকে আজ পর্যন্ত সংসারের মানুষগুলিকে সে চিনে উঠতে পারল না। কত সহজে তারা বদলায়, বদলে যায়। অথচ সেই পাঁচ বছরেই এদের নাড়ি-নক্ষত্র সে চিনে গেছে।

নিজেকে চিনলে, এদের না চিনে কি পারা যায়!

এরাও যে তারই মত বেশ্যা। খানকী।

মানদা বলে, কিরে—ঘরে গেলি!

যাচ্ছি! মালার ঘরে কেউ আছে নাকি মাসি? দরজা খোলা, কিন্তু ওকে দেখছি না—

ওর কথা আর বলিস নি!

কেন? আবার কী করল?

দেখগে যা। কিছু বললেই অম্নি মেয়ের মুখ হাঁড়ি হবে। কিন্তুক রীতরেখাক্ক বলে যে একটা কথা আছে—

গুইদা এখনও আছে?

দেখগে যা না!

ভালোবাসা কাকে বলে—যে-ভালোবাসার চলতি নাম পিরীত?

বিছানায় চিতিয়ে আছে গুইরাম, সামনে চেয়ারে বসে ভালোবাসা কাকে বলে ভেবে ভেবে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে মালা।

তবে কি যে-কথাটা সে বলেছিল, তাই সত্যি? মানুষের একটা মনের ব্যামো ভালোবাসা?

ভালোবাসে মানুষ নিজের গরজে? নিজেকে মানুষ ভালোবাসে বলে? কিন্তু শুধু নিজেকে ভালো বেসে মন ভরে না বলে আরেকজনকে ভালোবাসে? নিজের করে নিয়ে তবে ভালোবাসে?

আসলে সে-ও নিজেকেই ভালোবাসা? নিজেকে-ভালোবেসেও-না-ফুরনো ভালোবাসা পরকে আমি ভেবে নিয়ে ভালোবেসে মেটানো?

তবু ভালোবাসাটা বুজরুকি নয়? শুনে হয়ত তুমি দুঃখ পেলে, অনু—কিন্তু সত্যিকে স্বীকার করতে দুঃখ পেতে নেই।

দুঃখ পাব কেন? দয়া করে তুমি আমায়—

দয়া! ও একটা মস্ত ধাপ্পা, অনু। বিনা স্বার্থে কেউ কাউকে দয়া করে না। নিজের গরজে যেমন ভালোবাসে মানুষ, দয়া করলেও করে তেমনি নিজেরই গরজে। অনর্থক দয়া আমি করি না। কাউকে দয়া করে যদি আমার কিছু লাভ হয় তবেই—

আমার মত মেয়ে যেটুকু পেয়েছে—

অভিমান? ও দুঃখের চেয়েও মারাত্মক। তুমি আমায় ভালোবাসো তোমার গরজে, আমি তোমায় ভালোবাসি আমার গরজে। কিন্তু গরজটা যখন আমাদের মিথ্যে নয়, আমাদের ভালোবাসা কেন মিথ্যে হবে, অনু? খাওয়া নিয়ে আমরা শখ করি, তাই বলে খাওয়াটা কি শখের? শখ বলে খাওয়াকে বাতিল করতে পারো? শখের খাওয়া বাতিল করলেও কাঁচা মাংস চিবিয়ে খেতে হবে—বাঁচার গরজে। আসলে দুনিয়ার সব কিছুর গোড়াতেই এই গরজ।

অনুপমা সেদিন জবাব দিতে পারে নি। ওসব কথার জবাব দেওয়া সহজ?

তবে শুনতে খারাপ হলেও গরজের কথাটা বোধ হয় মিথ্যে না। বোধ হয়!

আজও সে ওকে ভালোবাসে। ওর মুখের আদলটা কষ্ট করে মনে আনতে হলেও ভালোবাসে। কেন ভালোবাসে? মেয়েটা তার গেরস্থ ঘরের বউ হবে বলে ওর কাছে বলে? শুধু তাই বলে? সেই গরজে?

ভালোবাসা তবে এত ঠুনকো ?

তাহলে কি সুধাময়ের বদলে যে-কেউ তাকে বউ করে নিয়ে গেলে অবিকল সুধাময়ের মতই তাকে সে ভালোবাসত ?

এমন কি সেই মানুষটা অন্ন মাসির ছেলে শুইরাম হলেও ?

স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা নাকি ষোলআনা স্বর্গীয়। হবেও বা। স্বর্গে যখন যাই নি, স্বর্গের খবরাখবর যখন জানিনে—অস্বীকার করি কী করে ? তবে এই স্বর্গীয় ভালোবাসাকে মর্তে কায়েম করার জন্যে দুপক্ষে যেমন দরদস্তুর চলে, যেমন যাচাই-বাছাই চলে—তাতে করে ওই বিশেষ পাড়ার—

ধমকের চোটের ওর মুখ সেদিন বন্ধ করে দিয়েছিল ।

কিন্তু ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল তার মন : এই তবে স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা ? মালা-অনুপমায় তফাত শুধু—একেক রাতে একেক মানুষকে ভালোবাসে মালা, আর অনুপমার ভালোবাসা সব রাতে একটি মানুষকে ? একটি মানুষকে ভালোবাসায় সারা জীবনের নিশ্চিন্তি বলেই সেই ভালোবাসাটা জমাট বেশি ? জমাট বেশি বলে তার তেজও বেশি ? দাম বেশি ?

অর্থাৎ ছুটকো খদ্দেরের চেয়ে হপ্তার বাঁধা বাবুকে ভালোবাসাটা যেমন জমাট বেশি তেজী বেশি দামী বেশি ?

বউ হয়ে ভালোবাসলে মা বৌদি মামিমা কাকিমা শাশুড়ী, দিদিমা ঠাকুমা ইত্যাদি হওয়া যায় বলেই সেই ভালোবাসার নামডাক বেশি ? মানমর্যাদা বেশি ?

মনের কথা টের পাবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল লোকটার।

শুধু বউকে ভালোবাসা নয় অনু, বাবা মা ভাই বোন ছেলে মেয়ে সবাইকে ভালোবাসাও ওই গরজের চোটে। চাকরি যাওয়ার নোটিশের সাথে সাথে বাপ হওয়ার নোটিশ পেয়ে ডাক্তারী মতে ছেলেকে খুন করার জন্যে মরিয়া হয়ে গিয়েছিল সুশীল—বউকে ওষুধ-বিষুধও খাইয়েছিল—কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারে নি। সাহসের অভাবে, টাকার অভাবে। অগত্যা বাপ শেষ অবধি তাকে হতে হল। আর আজ গিয়ে ভাখ, সেই ছেলে নিয়ে সুশীল আর তার বউয়ের কী

আদিখ্যেতা! হবে না? বাপ-মা যে! এ-ও এক স্বর্গীয় সম্পর্ক যে! বুড়ো বয়সে এই ছেলেই রোজগারপাতি করে—

ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল অনুপমা।

এসব কথা শোনাও পাপ। অনুপমার পক্ষে। যে-অনুপমা কমাস আগেও মালা ছিল। মালার জীবনে যে-অনুপমা দিনের পর দিন বাপ মা স্বামী সন্তান শ্বশুর শাশুড়ী ননদ ভাজ নিয়ে সংসারের স্বপ্ন দেখেছিল।

সত্যিই সব স্বপ্ন!

স্বপ্ন? সে সবই তবে স্বপ্ন?

তবে কেন গুইরামের পিরীতের সাথে ভালোবাসাটা খাপ খাওয়াতে গিয়ে এখন সে ধাঁধায় পড়ে গেছে?

একটি কথায় গুইরাম তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে: দিন তিনেক তো এখন রেহাই মালার, তাহলে কেন তাকে তাড়াবার জন্যে এত ব্যস্ত?

এরপরে অবশ্য বলা যেত, এভাবে থাকাটা বড় খারাপ দেখায়। বলতে পারে নি। গুয়েগুণ্ডা বলে ওকথা বলার কী হক্ আছে?

ভালো ভালো অনেক ভদ্রলোকের চেয়ে এই গুয়েগুণ্ডার কাছে কি সে অনেক বেশি ঋণী নয়? তারই মুখের কথায় কি সেবার সেই মেয়েটাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসে নি গুয়েগুণ্ডা?

ভুঁড়িদাসের টাকাও ও নিজে থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

মালা টাকা দিতে এলে 'ও তোর কাছে জমা থাক। সুদে বাড়ুক।' বলে নে য়নি।

সুদে বাড়ুক!

তাকে পিরীত করে গুয়েগুণ্ডা! মনোমাসির ছেলে গুইরামদা!

এ পিরীতও নিজের গরজে। বিয়ে করতে চাওয়াও। জানকীকে দেখে ওর শখ হয়েছে ভদ্রভাবে সংসার করার। গরজে হলেও এ পিরীত বুজরুকি নয় কিন্তু পিরীতের আসল মানেটা বুঝে যাওয়ার পর কি করে ফের বউ সাজে মালা? যে-মালা একদিন অনুপমা হয়েছিল।

সুধাময়কেও যে মালা ভালোবাসে আজও। সুধাময়ের মুখের আদলটা কষ্ট করে মনে আনতে হলেও। সুধাময়ের দৌলতেই না মেয়ে তার গেরস্থ ঘরের বউ হবে?

গেরস্থ ঘরের বউ হবে যে-মেয়ে, তার বাপ সুধাময় স্বামী নয় তার? বউ হয়ে গুইরামকে জড়িয়ে ধরা মাত্র সুধাময়ের কথাগুলি মনে পড়ে যাবে না মালার?

তার চেয়ে হাজার গুণে ভালো গুইরামের খানিক আগেকার কথাটা মেনে নেওয়া।

মাথা হেঁট করে নখ খুঁটতে খুঁটতে মালা বলে, আমি রাজী—শুনছ!

রাজী? চকিতে গুইরাম উঠে বসে। তবে কালই?

কাল? মালা হাসে। আহা! কাল কী করে—?

মারেঙ্গা গাঁট্টা। আমি শালা কি ওর তরে—ছোঃ! গুয়েগুণ্ডা চাইলে অমন দশ-বিশ গণ্ডা—তুমি কি ভেবেছ মুক্তো—

তুমি! মুক্তো! না, তারই ভুল। সে-ই ভুল করেছে। ভুল ভেবেছে। মেয়েমানুষের অভাব গুয়েগুণ্ডার নেই। তার দেহটার জন্যেই শুধু পাগল হয়ে ওঠে নি গুইরাম। গুইরাম যে তাকে ভালোবাসে: বুঝলে অমু, দেহ বাদ দিয়ে যেমন ভালোবাসা হয় না, তেমনি শুধু দেহ দিয়েই ভালোবাসা হয় না। প্রদীপ থেকে আলোকে কি আলাদা করা যায়?

শুধু দেহটার ওপর লোভ থাকলে বছরের পর বছর ধরে অত ভণিতা না করে সরাসরি একদিন ঢুকে পড়ত গুইরাম। সেই মেয়েটাকে ফিরিয়ে দেওয়া বাবদ শ আড়াই তো পাওনাই আছে।

এরই নাম তবে পিরীত। ভদ্রলোকে যাকে বলে ভালোবাসা।

গুইরাম বিছানা থেকে নামে। মালার পিছনে এসে দাঁড়ায়।

হঠাৎ রাজ্যের লজ্জা এসে মালাকে পেয়ে বসে। শরীরটা কেমন অস্থির লাগে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসে। ঘন ঘন থুতু ফেলে। মাথাটা আরও খানিক হেঁট হয়ে পড়ে।

মালার মাথায় হাত বুলোয় গুইরাম। চুলগুলি একবার মুঠো করেই ছেড়ে দেয়।

তবে ওই কথা রইল ?

ঘাড় নেড়ে মালা সায় দেয়।

যা বলেছি, ঠিক তেমনি ?

হুঁ। আঃ—লাগে না!

লাগুক!

লাগুক! আব্দার! ছাড়ো বলছি!

আজ মাথা ঘষেছ ?

জানি না!

তোমার চুলে হাত দিলে কী মনে হয় জানো—চুলে তোমার ইলেকট্রিকি আছে! মাইরি মনে হয় শরীলটা শালার—

সাবিত্রীকে দেখেই তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়ায় গুইরাম।

আহাম্মক বনে যায় সাবিত্রী! এ কী করে বসল! পা দু'টো তার এ কী বেয়াড়া কাণ্ড করে ফেলল!

আহাম্মক বনে গেছে মালাও। চুল খোঁপা করতে করতে বলে, জানিস সাবি, গুইরামদাটা কী ভীতু ভাই! আড্ডায় হামলা হয়েছে বলে এখানে এসে পালিয়ে আছে। লজ্জাও করে না।

বেশ কিয়া হ্যায়! মনে মনে মালার বুদ্ধির তারিফ করে গুইরাম।

গুইরামের দিকে তাকায় সাবিত্রী: চুলের মুঠি ধরে তার মাথা ঠুকে দিয়েছিল যে-মানুষ, সেই কি এখন মালার চুল নিয়ে খেলা করছিল? যে-মালার চুলের গোছা অনেক কম তার চেয়ে? যে-মালার চুল কোঁকড়ানো নয় তার মত? চুলের ব্যাপারে অন্তত যে-মালার ওপর টেক্কা দিয়ে গেছে সে?

বেশ কিয়া হ্যায়! পালিয়ে এসে আবার বড়াই হচ্ছে! দুপুরে একটু গড়াতে দিলে না—

কেন, হাম কি হাত-পা বাঁধকে রাখা?

গুইরামদা বলে কি জানিস সাবি—আমার চুলে—

মাইরি—ভালো হচ্ছেনি কিন্তুক—

আমার চুলে নাকি—

এ্যাও! এ্যায়সা রদ্দা দুঙ্গা—

ইলেকট্রি কি আছে! মালা হেসে ওঠে।

তবে রে!

সাবিত্রী আঁতকে ওঠে।

কিন্তু না, অনর্থক আঁতকানো। এ 'তবে রে!' পলকে দুমুঠের বাঘ নামিয়ে ঝাঁপিয়ে যাওয়া নয়, পিরীতের লদকা-লদকি।

'তবে রে!' শুনেও দাঁত বার করে হাসছে মালা। 'তবে রে!' বলেও চোর বনে গেছে গুয়েগুণ্ডা।

এরপর গুয়েগুণ্ডা যদি চুলের মুঠি ধরে মাথা ঠোকার বদলে মাথাটা মালার বুকে টেনে আনে? তখনও কি মালা ওই ভাবেই বসে ডগমগ করবে?

একবারও তার মনে পড়বে না যে সাবিত্রীকে—তার প্রাণের সই সাবিত্রীকে—এই সেদিন ওই গুয়েগুণ্ডাই 'তবে রে!' বলে হামলে উঠে চুলের মুঠি ধরে মাথা ঠুকে দিয়েছিল পবার সাথে?

হারামজাদী! জাতবেশ্যার মেয়ে আর কত হবে!

মালা কি বলতে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি বাধা দেয় সাবিত্রী, যে জন্যে এলুম। একটা খারাপ খবর আছে, ভাই।

খারাপ খবর?

ভীষণ খারাপ! লোকটা এই মাত্র বলল—বলল কি—আজ দুপুরে পদ্মপুকুরে বছর চারেকের একটা মেয়ে নাকি বাস চাপা পড়ে—

আহা!

মেয়েটার নাকি মা নেই।

ভগবান সে-হতভাগীকে বাঁচিয়েছেন।

বাপটা নাকি সংসারের সাথে ঝগড়া করে মেয়ে নিয়ে আলাদা থাকে। বউ নিয়েই ঝগড়া। আগে বালীগঞ্জে থাকত, কিন্তু বউটা নাকি—

অ্যাঁ! চমকে ওঠে মালা। বালীগঞ্জে থাকত? বালীগঞ্জের কোথায়? রাস্তার নাম—

গুইরাম বলে, দূর! বউ লেকে সংসারকা সাথ ঝগড়াঝাঁটি ভদ্দরলোক আজকাল হামেসা করতা হ্যায়।

সাবিত্রী বলে, বউটা নাকি মরে গেছে। স্বামী বলে মরে গেছে, কিন্তু লোকে বলে—

গুইরামদা!

মারো গোলী! বলি পদম্‌পুকুর সে শালা বহোৎ রোজ ছোড় দিয়া না? উও হপ্তামেও হাম খোঁজ নিয়ে আয়া না? বাপ-বেটিতে বহাল তবিয়তমে—

বিষাদমাখা উদাস স্বরে সাবিত্রী বলে, এক হপ্তায় সাত দিন গুইদা! ভগবান না করুন—তবু—মানুষের জীবন—তায় ওইটুকু মেয়ে—

চোপ! কাঁহা পদম্‌পুকুর আর কাঁহা গড়েহাটাকা সুবালা মানসন।

তা অবিশ্যি। এতক্ষণে হারানো মানিক খুঁজে পায় সাবিত্রী। এ মেয়েটা পদ্মপুকুরেই থাকে। ওদের পাশের বাড়িতে। হঠাৎ রাস্তায় বেরোতেই—বাঁচালে গুইদা! বাঁচলুম ভাই! শুনে অব্দি বুকটা এমন ধড়াস ধড়াস করছিল! ভগবান! দুহাত কপালে ঠেকায় সাবিত্রী।

ভগবানের দয়ার তুলনা হয় না।

বেয়াড়া পা দুটি তাকে বেমক্কা ঘরে ঢুকিয়ে বেকসুর বেকুব বানিয়ে দিলেও ভগবানই সামলে দিয়েছে শেষ পর্যন্ত। নইলে রাগে-ঘেন্নায় দিশে হারাবার বদলে মনটা তার হঠাৎ অমন মতলব যুগিয়ে দেয়? সবসেরা যোগানদার ভগবান পেছনে না থাকলে?

ভাঙা কাঁচ আর জোড়া লাগে না।

সত্যিই লাগে না। মালা ঠিকই জানে।

কিন্তু কাঁচের জিনিস ভাঙতে কতক্ষণ? তার অত শখের ফুলকাটা গেলাসটা পরের দিনই ভেঙে ফেলে নি বংশী?

এটা কেন জানে না বেশ্যার মেয়ে বেশ্যাটা?

ভুজঙ্গ বলে, এত দেরি?

হয়ে গেল।

কই, ইয়ে তো এখনও—

চাকরটাকে খুঁজে পেলুম না।

তাইত! তাহলে—থাকগে।

দেশী হলে চলবে?

না না, আমি চা-র কথা বলছিলুম গো।

সে যখন আর হল না ওই দিয়েই তেষ্টা মেটাও।

ধেৎ। সেটা কেমন দেখায়!

আমি নিজে থেকে দিচ্ছি—তুমি তো আর চাও নি।

সে—তা—একটা দিন বই তো নয়। তাছাড়া—তুমিই যখন বলছ—কোথায় আছে বলো?

দিচ্ছি।

উঁহু, আমি নেব।

আমার ছোঁয়ায় জাত যাবে?

বউয়ের হাত থেকে কি—

এখনও তো বউ হই নি।

আলমারি খুলে সাবিত্রী বোতলাদি বার করে। আগে কেস হোক। কেসে জিতি। তোমার ঘরে গিয়ে উঠি—

আসল ব্যাপারটা তুমি কিন্তু—

টাকা তো? জানি গো জানি। টাকার প্রয়োজন কখনও ফুরোয় না। আমিও তোমায় একটা মোটা রকম মওকার হদিস দিতে পারি।

মানে?

পারবে হাসিল করতে? যদি পারো—

কত টাকা?

বারো হাজার। বেশিও হতে পারে। পারবে?

ভুজঙ্গ বুঝি ইতস্তত করছিল, তার দুহাত ধরে সাবিত্রী বললে, পারবে—পারবে। তুমিই শুধু পারবে। পারতে তোমায় হবেই।

সন্ধ্যা সকাল : রাত্রি।

রাত্রির ভূমিকা সন্ধ্যা।

ঘরে ঘরে রাত্রিবরণের তোড়জোড় শুরু।

মালার দিকে তাকিয়ে মানদা ভাবে, এবার তাকে উঠতে হবে।

নীলের উপোসী শরীরটা তার মড়ার মত মেঝের একপাশে পড়ে থাকতে চাইলেও, ঘর এখন খালি করে দিতে হবে, বারান্দায় গিয়ে হাত আড়াই-তিন জায়গা বেছে নিতে হবে।

মালার দিকে তাকিয়ে মানদার বছর ষাটেকের হাড়-জিরজিরে বুকখানা রোজকার মত মোচড় দিয়ে ওঠেই।

রোজকার মতই মনে হয়, ভাগ্যিস সে এদের আসল মাসি নয়। এদের মায়েরা তার মায়ের মেয়ে নয়। ইচ্ছে করলে এরা অবিকল গেরস্থ ঘরের বউ হতে পারলেও লোক-বসানোর কাজে নেমেছে তো বটে? পেটের দায়ে হলেও নেমেছে তো?

আসল মাসি হলে মানদা এটা সইতে পারত?

তবে কি একেক সন্ধ্যায় মানদার মনে পড়ে যায় : ইচ্ছে করলে সে-ও মা হতে পারত, সেই অবুঝ বয়েসে সেই মারাত্মক ভুলটা না করে বসলে? সেই ভুলের জের টানতে গিয়ে মা হওয়ার পথ চিরতরে না বন্ধ করে দিলে?

বিয়ের জন্যে সবুর করলে মানদারও এমনি ছটি মেয়ে হতে পারত? ছ মেয়ের মা মানদার মায়ের মত অবিকল?

কিন্তু ভাগ্যিস তার মেয়ে নেই!

নিজের মেয়ে থাকলে তাকেও তো এইভাবে ঘর ছেড়ে দিত হত? রীতরেওয়াজ মাফিক? সরোজিনীর মত?

রাতের পর রাত একদিন যে-ঘর সরোজিনীর সরগরম হয়ে থাকত মাইফেলে, সেই ঘর আজ দখল করেছে আদুরী।

দিন কাটে সরোর চিলেকোঠায়।

ভাগ্যিস সময়মত মরে গেছে ময়না! মরে বেঁচে গেছে। নইলে তার ন বাবু শেষে সত্যি-সত্যিই তার মেয়ে ফেলীকে নিয়ে—

গা গুলিয়ে ওঠে মানী বাড়িউলীর।

চোখ দুটি জ্বলে ওঠে। আর জলে ভরে আসে।

চোখের জল আর চোখের জ্বালার বেয়াড়া টানাপোড়েন বড়ই বেকুব বানিয়ে দেয়। বেকুব-বনা মানদার তখন মনে পড়ে যায় তারও একদিন যৌবন ছিল। যৌবনভরা সেই দেহটাকে প্রতি সন্ধ্যায় কত-না সোহাগে সাজাত সেদিন মানদাও।

ওই মালার মত।

তাই কি প্রতি সন্ধ্যায় মালাকে দেখে সেদিনের তরে বুকটা তার মোচড় খায়?

তার আফিঙের ভাগ মেরে বুলবুলি দুনিয়া-পারের পারানি যোগাড় করেছিল।

বুলবুলির বমি-মাখা পিঁপড়ে-ধরা, ইঁদুরে-একটা-চোখ-খুবলে-খাওয়া মুখটার ছবি চোখে ভেসে উঠতেই হাত থেকে আফিমের মোড়ক পড়ে গিয়েছিল সেদিন সন্ধ্যায়। তিনদিন সে আফিঙ ছোঁয় নি।

ছোঁয় নি স্রেফ প্রাণের ভয়ে। বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে থাকার বদলে আফিঙ খেলে মরেও যায় মানুষ? আরেকজনের বরাদ্দ থেকে ভাগ-মারা আফিঙ খেলেও?

মরার ভয়টা যে কী ভয়ানক পেয়ে বসেছিল! কদিন।

আফিঙে যে কী ভয়ানক আতঙ্ক ধরে গিয়েছিল! কদিন।

কদিন পরে সন্ধ্যায় পরীকে তার দেহটা গোছগাছ করতে দেখে বুকটা মোচড় দিয়ে না উঠলে হয়ত আর মনেও পড়ত না যে আফিঙ খাওয়াটা কী ভয়ানক জরুরী তার।

তাক থেকে আফিঙের ডেলা, দুধের বাটি এবং খাটের তলা থেকে মাদুর আর বিছানা থেকে একটা বালিশ টেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরোয় মানদা। বারান্দায় গিয়ে

পড়ে থাকার জন্যে। আফিঙ গিলে বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে থাকার জন্যে। বরাত গুণে কেউ ঘরে তুলে না নিয়ে এলে সারাটা রাতের জন্যে।

যাবার সময় আবার মানদা বলে যায়, কাজটা কিন্তুক ভালো হচ্ছেনি। এখনও বলছি—ভেবে দ্যাখ। ভেবে দ্যাখ। এভাবে রীতরেয়াজ ভাঙলে—

কাজটা ভালো হচ্ছে না?

ভালো-খারাপে কী আসে যায় মুক্তোমালার? পরকে খুশ যোগানোই পেশা যে-মুক্তোমালার।

একটি রাতের তরে কেন, মাঝে মাঝে মালার৩ কি বেপরোয়া ইচ্ছে জাগে না চিরতরে সায় দিয়ে বসে গুইরামের সাথে? জানকীকে দেখে বউ নিয়ে ঘর-সংসার করার জন্যে হন্যে হয়ে গেছে যে গুইরাম। এবং মুখে-বড-বড়-বাৎ দেখতে-ভদ্রলোক হলেও চালচলনে গুইরামের বাড়াদের মন যোগাতে যোগাতে নিজের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে যে-মালার।

কথাটা গুইরাম মিথ্যে বলে নাঃ হারামজাদী! দুবার বিয়ে হয় না,

বিয়ে! স্বামী! মেয়ে! কিছুই কি স্পষ্ট মনে আছে মালার? স্বামী আর মেয়েকে দেখলে আজ কি সে আর চিনতেও পারবে?

কিন্তু মনে না থাকলেও মনে রাখতে হয়। স্বামী যে! মেয়ে যে!

দালাল গুণ্ডা ঘুসাকির বেটা গুইরাম জানে না যে মালার স্বামী হলে সেই মেয়েটার সে সৎ বাপ হয়ে যাবে।

ভবিষ্যতে যদি কোন দিন দুজনে দেখা হয়ে যায়? পরিচয়টা জানাজানি হয়ে যায়? তাহলে কি আর মেয়ে তার গেরস্থ ঘরের বউ হতে পারবে?

অন্নর যে বড় সাধ ছিল! মরা মায়ের বানচাল সাধটা যে মেয়ে তার আঁকড়ে ধরে ছিল!

তার চেয়ে এই ভালো। একটি রাতের তরে গুইরামের সাথে সায় দেওয়া। এমন-কি স্থায়ীভাবে দেওয়াও। এখানে থেকে। মুক্তোমালা হয়ে থেকে।

সে যাই বলুক—সব কিছু অমন তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে মালা পারবে না। মালা তো তার মত লেখাপড়া জানে না। অত বিদ্যেবুদ্ধি তো মালার নেই।

জীবনের এইটুকু সান্ত্বনা মালার।

পটল ঘরে ঢুকে বলে, ওমা। আজো—?

ন্যাকা সাজিস নি পটলি, বেরো মুখপুড়ি!

মাইরি—আমি কিস্সুটি জানি না।

জানিস না? বিকেলে ঘোঁট পাকানো হচ্ছিল টের পাই নি?

ওমা, সে কি তোকে নিয়ে। তোমার সই যে আজই—

আজই?

মাসিকে বলে নি। পাছে হাঙ্গাম বাধায়। নটার শোয়ে সিনেমা দেখার নাম করে—ফুড়ুৎ!

তোকে বলেছে?

বাঙালনী অত কাঁচা মেয়ে!

তাহলে জানলি কি করে?

হাত গুণে।

সাবিত্রী চলে যাচ্ছে? বাঁধা থাকবার জন্যে? যাক! ভগবান করলে, ভালোই হবে। ফিরে আসতে হলেও ভালো হবে। তখন যদি চোখ খোলে। বাঙাল না বাঙাল। মাথায় আঁচল তুলে দিয়ে মালা বলে, যে যা ভালো বুঝবে করবে—আমাদের কী! তুই এখন দেখ দেখি, জানকীর বউয়ের মত দেখাচ্ছে কিনা—

কে জানকীর বউ? জানকাই তো শুনেছি রামের বউ ছিল।

আমাদের সেই তেলেভাজাওলা জানকী—তার পরিবার। তিনকড়ি মিস্ত্রিরির বোনরে। সেই যে—

তালে খানিক ভুসো কালি মাখ। শাড়ির বদলে গামছা জড়িয়ে নে।

ড্রেসিং টেবিল থেকে কুমকুমের শিশিটা নিয়ে যায় পটল।

মালার পাশেই পটলের ঘর।

ঠোঁটে-গালে আলতা মেখে পাতা কেটে চুল বেঁধে কুমকুমের টিপ পরে নীলাম্বরিটা লুঙি করে পেটে-হাওয়া-খাওয়া ব্লাউজের ওপর ওড়না চড়িয়ে দেখতাই একখানা সাজ করবে আজ ভেবেছিল পটল।

কিন্তু সাজের ব্যাপারে মালা যাবে তার ওপরে ?

মুক্তোমালার পরনে কিনা আধময়লা শাড়ি, ফেঁসে-যাওয়া ব্লাউজ ? মুখে পাউডার-পমেটমের ছিটে ফোঁটা নেই ? চুলগুলি পিঠময় ছড়ানো ? খালি গলা, খালি কান ?

তবে কি পটল আজ শাড়ি-টাড়ি একেবারে বাতিল করে এগিয়ে যাবে আরও এক ধাপ ?

কিন্তু আজ আর তার কী দরকার ? কোনরকম সাজগোজেই বা আজ কী দরকার পটলের ? এমন একটি দেহের মালিক যে-পটল।

কিসের টানে পিরীতের কাঙাল শখবাজ প্রফেসারটা আটক পড়েছে, জানতে কি পটলের বাকি আছে ?

কে জানে, কতদিন ওটাকে রাখা যাবে—দম-দেওয়া পুতুলের মত সব শখ ওর মিটিয়েও। খোরাকির টাকা অবধি হাতে তুলে দিয়েও।

কে জানে, সে চেপে গেলেও আগ বাড়িয়ে ইঁদুর গিয়ে বাগড়া দিয়ে বসেছে কিনা ঃ খাণ্ডারনী বউটাকে তালাক ঠুকে সাত-চড়ে-রা-না-কাড়া আরেকটা বউ জোটাতে উস্কেছে কিনা।

ওস্কালেও বড় সুবিধে হবে না ঃ পিরীতের কাঙাল হলেও মানুষটা প্রফেসার। এখানে এসে যাই করুক ওদিকে প্রফেসারী চাল বজায় রেখে চলতেই হবে।

তবু যদি পটল-মার্কা বউ একটা জোটাতে পারে—বয়ে গেল পটলের। বয়ে গেল ! কাঁচ-ভাঙা আয়নায় আগাপাশতলা নিজেকে যাচাই করে পটল ঃ পটলের পরোয়া কাকে ! টিকে থাক এই লক্ষ্মা শরীর।

একঘেয়ে সুন্দর হওয়ার চেয়ে এমন বেঢপ হওয়ার কদর অনেক ! নাচ-গান-না জানা পটলের অন্তত।

পটল জানে, তার এই দেহটা নিয়ে কেউ করে হাসিমস্করা, কেউ গায় কাঁদুনি।

তালে তালে হাসে-কাঁদে পটলও। যখন যেমন মানায়।

তাকে মাতাল ঠাউরে কেউ তার কানের মাকড়ি হাতের চুড়ি গলার হার খুলে নিচ্ছে টের পেয়েও বাধা দিতে মন চায় না: আহা, নিক নিক! এমন দেহ যার গয়নায় তার প্রয়োজন? এই নিয়েও খদ্দের যদি খুশী হয়, আহা, হোক হোক!

টাকা দেওয়ার বদলে উল্টে তারই খোরাকি মেরে কেউ যদি খাণ্ডারনী বউয়ের সেলামী যোগায়, আহা, যোগাক যোগাক।

খদ্দের খুশী করার সর্বস্বপণ এই চেষ্টা পটলের ব্যর্থ হবে? এই করে করে একটা লোকও কি পিরীতে তার পড়ে যাবে না? আল্পনার তরে ফতুর শীলেদের সেই ছোকরার মত পিরীতে?

মেথর-মুদ্দাফরাশ যে-কোন একটা লোক?

তেলে-ঝুলে-হলুদে মায়ের আমলের দুর্বোধ্য পটটায় রোজ যে এত করে মাথা ঘষে পটল—বৃথা হবে? একটি দিনের তরেও কি পটলকে খদ্দের বানিয়ে আর খদ্দেরকে পটল বানিয়ে খদ্দের-পটলকে নিয়ে পটল-খদ্দেরের বেলেল্লা ফুর্তি লোটার বেপরোয়া শখবাজা চালানোর দাও মিলবে না?

হেই ভগবান!

কাঁচ-ভাঙা আয়নায় নিজের মুখ দেখে নিজেই পটল ঘাবড়ে যায়: এ কী! পটলী যে মালার ঘরের দেওয়ালে লটকানো অর্ধ-নারীশ্বর না কী যেন তাই বনে গেছে!

তাড়াতাড়ি পটল কাঁচের ফাটা জায়গাটা থেকে মুখ সরায়। যাক! আবার যে-পটল সেই-পটল।

কনে-চন্দনের কায়দায় মুখ ভরে কুমকুম পরা শুরু করে পটল। আর ভাবে, আসবে তো আজ মানুষটা? পিরীতের কাঙাল শুধু সে নয়, সে-ও—প্রফেসারটাকে বোঝাতে এতদিনে পেরেছে তো?

গানের সুরে ভাবনা তার চরকুটে যায়।

গানের রেকর্ড বাজছে লিলির ঘরে।

শরীরে শাড়ি জড়ানো মুলতুবি রেখে রেকর্ড বাজাতে বসেছে লিলি: এখনও যদি গান না শোনে, শুনবে কখন? কী দরকার মাসে মাসে তবে নতুন নতুন রেকর্ড কেনার?

পেটে বালিশ চেপে গানের তালে মাথা দোলাতে লিলি আপসোস করে—মিছেই কটা দিন এর-ওর-তার খোসামুদি করে কাটাল। মিথ্যে কয়েকটা টাকা বাসা-ভাড়া বাবদ বেরিয়ে গেল।

হয়ত টালিগঞ্জে সে পাঁচ টাকা রোজের কাজ একটা পেয়ে যেত। টেকোকে তোয়াজ করে চললে। আরও দিনকয়েক টেকোর সাথে হোটেলে গেলে। টেকোটার নাকি বড় দয়ার শরীর। লতা বলেছে যখন!

কিন্তু ছায়ার ব্যাপার শুনে আক্কেল তার গুড়ুম হয়ে গেছে।

দেহটা ছায়ার নাকি বড়ই খাবসুরৎ ছিল। 'অপূর্ব সুন্দরী'—খবরের কাগজে লিখেছে।

ছায়াও সিনেমায় নামতে চেয়েছিল।

ভদ্রঘরের মেয়ে ছায়া। পেটের যন্ত্রণায় না হলেও পেটেরই দায়ে। অনেকগুলি পেটের। স্বামী মরায় তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে অকূল পাথারে পড়ে-যাওয়া ছায়া।

ছায়াকে গণ্ডাদেড়েক লোকের মন যুগিয়ে চলতে হয়েছিল। মাস তিনেক ধরে।

গরিব মেয়ে অপূর্ব সুন্দরী হলে পুরুষের মন না যুগিয়ে পার আছে?

তবু ছায়ারানীর সিনেমায় নামা হয়ে উঠল না। কী করে হবে? গন্ধ-শুঁকে-শুঁকে-আসাদের আপসে-কামড়া-কামড়ির ঠেলায় অপূর্ব সুন্দরী দেহটা কি তার আস্ত ছিল শেষ অবধি?

বস্তাবন্দী ধড়টা পাওয়া যায় বেলেঘাটায়। একটা হাত উল্টোডিঙ্গিতে, আরেকটা কালীঘাটে। পা দুটি মানিকতলার খাল পাড়ে।

মুণ্ডুটা?

সেটা একজন পুঁতে রেখেছিল উঠোনে। তালতলায় এক বাড়িতে।

কেন?

ছায়া যে অপূর্ব সুন্দরী ছিল গো। জ্যান্ত ছায়ার ভাগ না পেয়ে মুণ্ডুটা তাই রেখে দিয়েছিল। প্রতি রাতে মাটি খুঁড়ে তুলে ওই মুণ্ডু নিয়েই রাত কাটাবে বলে। পচে-গলে মুণ্ডুটার মাংস ঝরে গেলে খুলিটা নিয়েই।

লোকটা অবশ্য একথা কবুল করে নি। ধরা পড়ে গেলে করে কখনও? খুনের কথাটাই কি করেছে?

লিলির ইচ্ছে হয়—এক্ষুনি ছুটে যায় মালার কাছে: ফের একবার খবরটা পড়ে শোনাক মালা। ফের একবার।

দেড় বছরের পুরনো খবর—আর লিলি এতদিন কিচ্ছু জানত না? ঘুণাক্ষরেও আভাস পেলে কি হিরোইনের পার্ট নিয়ে সাধাসাধি করলেও এ বাড়ির বার হত লিলি?

লিলি যদিও অপূর্ব সুন্দরী না, বাড়তি সময় থাকার মতলবে অনেকে এমন আমড়াগাছি করলেও নিজের দেহটাকে সে ভালভাবেই চেনে। কিন্তু অপূর্ব সুন্দরী হোক না হোক দেহটা তার নিজের বটে তো? এই দেহেরই পেটটা তাকে এত কষ্ট দিয়ে চললেও এই দেহটাকে সে বড্ড ভালোবাসে তো?

যন্ত্রণায় মরার দাখিল হওয়া আর খুন-হয়ে-মরে যাওয়া এক কথা?

পরের হাতে খুন হওয়ার জন্যেই কি এতদিন ধরে এই দেহটাকে সে বাঁচিয়ে রেখেছে?

গান শেষ হয়ে ঘ্যাসঘ্যাসে আওয়াজ শুরু হয়, তবু হাত বাড়িয়ে রেকর্ডটা তুলতে আলসেমি লাগে। বালিশটা লিলি আরও জোরে পেটের সাথে চেপে ধরে।

যাবে নাকি একবার মালার কাছে? সবাইকে ডেকে নিয়ে? বলবে নাকি—ডাইংক্লিনিং থেকে শাড়ি-মুড়ে-আনা কাগজখানা আরেকবার মালা পড়ে শোনাক। গোল হয়ে বসে সবাই শুনুক। চাপা কথা কি মিথ্যে হয়।

তারপর দলবেঁধে চলুক হাকিমের কাছে। হাতজোড় করে হাকিমকে বলুক—প্রমাণ নেই বলে লোকগুলোকে তুমি খালাস দিলে হাকিম বাবা? প্রমাণ নেই

বলে ? কিন্তু আসামী না হোক, আসামীদেরই তো জাতভাই এরা ? ব্যাটাছেলে তো ?

এর চেয়ে আর বড় প্রমাণ কী আছে হাকিম বাবা ?

তোমার পায়ে পড়ি হাকিম বাবা—এগুলোকে তুমি কিমা করার হুকুম দাও। দাও, দাও, হুকুম দাও। একজনের দোষে আরেকজন কি সাজা পায় না হাকিম বাবা ? আমি কেন তবে সাজা পাচ্ছি হাকিম বাবা।

আমরা কেন সাজা পাচ্ছি !

হাতজোড় করে সবাই যখন এই কথাগুলি বলবে, লিলি খিস্তি করবে মনে মনে : প্রমাণ নেই বলে খালাস তুই ওদের দিবি বইকি ঢ্যামনা ! তুইও যে একটা ব্যাটাছেলে ! চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

হঠাৎ লিলি উঠে দাঁড়ায়। রাধাকৃষ্ণের দিকে দুহাত জুড়ে আর্জি জানায় : হে ঠাকুর ! পরের জন্মে লিলিকে তুমি ব্যাটাছেলে করো না করো, ওই হাকিমটাকে মেয়ে বানিয়ে দিও। ওই হাকিমটাকে তোমরা লিলি বানিয়ে দিও—দোহাই রাধা, দোহাই কেষ্ট !

মাথাটা লিলির দপদপিয়ে ওঠে।

মাথা দপদপিয়ে ওঠা মাত্র তলপেটের যন্ত্রণাটা ভোঁতা মেরে যায়।

তাই যায়। মনটাকে অকথ্য রাগিয়ে দিলে যন্ত্রণাটা এমনি ভয় পেয়ে যায় ভড়কে।

মেজাজ চড়া থাকতে থাকতে লিলি দিব্যি করে : আর কখনো পকেট হাতড়ানো নয়। ওতে করে আখেরের কোন লাভ হয় না। বরং দুর্নাম রটে যায়। এক মানুষ দুবার আসে না।

যে-মানুষটা আছে, যে-করে হোক আটকে ওকে রাখতেই হবে। হপ্তায় একটা দিন মদ গিলে আদর করে তাকে স্রেফ পেটবার জন্যে এলেও মাসে একশটা টাকা তো আগামই দেয় ?

আসুক না মানুষটা আজ—লিলিও আজ তাকে যা আদর করবে ! নিজে

থেকেই যেচে যেচে। পারে তো আদর করার ফাঁকে ফাঁকে সে-ও দু-চারটে চড়-চাপড় আজ হাঁকিয়ে দেবে।

মনের খুশিতে লিলি চার মিনার ধরায়।

ধোঁয়া শুষতে শুষতে লিলির মনে পড়ে যায়—গুয়েগুণ্ডার কাছে মার খাবার দিন সকালে পরী একটা সিগারেট চেয়েছিল। সিগারেটের বদলে সে দিয়েছিল মুখনাড়া।

পরীকে একটা চার মিনার দিতে হবে। এক্ষুনি। দরকার হলে খোসামুদি করেও। করে চলে যায়।

তারই জন্যে না ওর এই দুর্গতি? গেলে তারই জন্যে না যাবে?

তাকে দেখামাত্র পরী না ক্ষেপে যায়—ভয় ছিল লিলির। যা অভিমানী মেয়ে! তায় সকাল থেকে মাল টেনে টেনে মেজাজ এখন কেমন হয়ে আছে কে জানে।

পরীর ঘরে ঢুকে প্রথমে লিলি তাই ইতস্তত করে খানিক।

পরী বলে, পান খাবি লিলি?

হুঁ। লিলি একগাল হাসে। সিগারেট খাবি তুই?

হুঁ। পরী সাথে সাথে হাত বাড়ায়।

লিলি দেয় সিগারেট। পরী পান।

পরী বলে, মাল খাওয়াতেও পারি। কিন্তু মুখুজ্জে বাবা যখন মানা করে গেছে—

আগে গোটা দুই কলা খেয়ে নিলে—

কী দরকার!

দরকার কিছু লিলিরও নেই। পরীর উদারতায় সে তাজ্জব বনে গেছে বলেই মাল-খাওয়ানোর কথায় রাজী হয়ে গিয়েছিল। সেজন্যে দরকার হলে বংশীকে এখন বাজারেও পাঠাত। গোটা দুই কলা আনার জন্যে: সে মাল খেলে যদি খুশী হয় পরী, হোক। আহা, বড্ড কষ্টে আছে মেয়েটা। বিছানা-নিয়েও-

বেঁচে-থাকলে কী করে তার দিন চলবে ভেবে-সে হিমসিম খাচ্ছে, আর এখনই ধার-ধোর করে দিন চালাতে হচ্ছে পরীকে। গয়না বাঁধা রেখে ধার।

লিলি বলে, কেমন আছিস ভাই? কমছে? দেখি।

গলা-বুক আঁচলে সাপটে পরী বলে, না কমে পারে। খরচা করে ইনজেকসন নিচ্ছি—ইয়ার্কি।

রাধাকেষ্টর দয়ার—

মা কালী বল!

আমি কি বোষ্টম?

বোকার মত হেসে বেরিয়ে যায় লিলি: কী দরকার কথা বাড়িয়ে! চোখ মুখ যেমন থমথমে হয়ে আছে, বাপ্‌স্! আচমকা কী বলে বসবে কে জানে। সিগারেট দেওয়া হয়েছে, মানে মানে এখন কেটে পড়া ভালো।

লিলির পিছনের ঝুনুনির তালে মাথা দোলায় পরী: কালও যদি লিলি ঘরে ঢুকত, বোতল-পেটা করে তাড়াত সে। নির্ঘাত।

আজ সকালেও।

দুপুরেও।

কিন্তু এখন আর কারো বিরুদ্ধে কোনও নালিশ নেই তার।

সকাল থেকে মাল টেনেও মনানসই নেশা হল না, কী ভুলই হয়ে গেছে কআনা সস্তা বলে আতরের ঘর থেকে বোতল আনিয়ে—এই ভেবে আতরের ওপর ধাপে ধাপে চটতে গিয়ে হঠাৎ তার খেয়াল হয় যে আশ্রমে গিয়ে ওঠার কথাটাই সে ভাবছে শুধু—আশ্রমের ব্যাপারটা পাত্তা দিচ্ছে না?

ভুলে গেছে রেণুবালার কথা বেমালুম?

আশ্রম ছেড়ে এলি?

এলুম।

কেন?

কেন! ঢেঁকিকে যদি স্বগ্যে গিয়েও ধান ভানতে হয়—

বলিস কি!

বাইরে চিকনচাকন ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন। রায়বাবুও এক বাড়িওলা।

রেণুবালার কথা প্রথমে সে বিশ্বাস করে নি। রায়বাবুর মুখ দেখে তার মুখের কথা শুনে যায় বিশ্বাস করা? রেণুবালার কথা সত্যি হলে এই কলকাতা শহরে ও-আশ্রম টিকতে পারত? পুলিশী হামলা হত না? পাড়ার ছেলেরা হল্লা বাধাত না?

হ্যাঁ, রায়বাবুও বাড়িওলা—এই বাড়ির মালিক যখন। কিন্তু তাতে কি? বাড়ি দেখতে এসে কতবার মা বলে সবাইকে কাছে টেনে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে ভালো ভালো কত কথা বলে গেছে ওই রায়বাবু। শুনেও শান্তি। এ বাড়ির সকলের জন্যে আশ্রমের দরজা সব সময় খোলা—ঢালা হুকুম দিয়ে গেছে রায়বাবু।

কিন্তু মুখের নালিশই শুধু জানায় নি রেণুবালা—মাসকয়েক পরে প্রমাণও দিয়েছিল হাতেনাতে: মা বলে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে সত্যিকারের মা বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে কথায়-কথায়-তুড়ি-দিয়ে-উঠে জয়-গুরু বলা মানুষটা!

এখন, এতদিনে, আজ সন্ধ্যায় হঠাৎ পরীর মনে পড়ে গেছে—সেদিন রেণুবালা ঠিকই বলেছিল: রায়বাবুও এক বাড়িওলা। ব্যাটাছেলে বলে বাড়িওলা। লেখাপড়া জানা ভদ্রলোক বলে তার কারবারের ধরনটা আলাদা। কারবারের ধরন আলাদা বলেই দেশ জুড়ে তার খাতির অত।

রায়বাবুর দরদের মতলব হল, হাতের-কাজ শেখানোর ছলে মেয়ে ফুসলানো? তারপর তাদের নিয়ে ভদ্রভাবে কারবার চালানো?

কিংবা বিয়ে দেওয়ার নামে বাইরে পাচার?

আসলে রায়বাবু এক বাঙালী ভুঁড়িদাস?

নইলে অতই যদি তোর দরদ পরীদের ওপর—এই কখানা ঘরের ভাড়া সাড়ে তিনশো নিয়েও শকুনিপনা তোর যায় না কেন? থেকে থেকে তুলে দেওয়ার হুমকি দিয়ে পুরো পাঁচ শো করে নিয়েছিস কেন? গেরস্থ ভাড়াটে বসালে দেড় শোর বেশি পেতিস?

দরজা থেকে মানদা বলে, ভরসাঁঝে কাকে গালাগাল দিচ্ছ বাছা?

পরী বলে, তোমায় দিই নি মাসি।

আমায় দিলে ক্ষেতি নেই। আমি ঘরের নোক। পরকে দিও নি। ভর সাঁঝে গালিগালাজ দেয় না। বলতে বলতে মানদা আড়াল হয়।

আফিঙের ডেলা গেলবার আগে ঘরে ঘরে সে রোজ একবার উঁকি মেরে যায়। রীতরেওয়াজ মাফিক তৈরি হয়ে সবাই আছে কিনা দেখে যায়।

পরী ভাবে, কথাটা মাসি মিথ্যে বলে নি। মানদা ঘরের লোক। আপনার লোক ঃ রায়বাবু ভাড়া বাড়ালেও মানী বাড়িউলী ভাড়া বাড়ায় নি। বরং সখেদে বলেছিল, অধম্মের কল বাতাসে নড়ে। পাঁচশো ট্যাকা ভাড়া বলে তোদের কাছে ধাপ্পা দিয়েছিনু, ভগমান তাই—তা তোরা যা দিচ্ছিস তাই দে।

মাসি শুধু ভাড়া বাড়ায় নি নয়, আজও ইলেকট্রিকের বিল মিটিয়ে চলেছে। ঠাকুর মশাইয়ের প্রণামিটাও। রোজকার ফুলের খরচও; এমন কি ধূপধুনোর যোগানদার পর্যন্ত ওই মাসি।

গয়না বাঁধা রাখলেও বিনা সুদে টাকা ধার দিয়েছে।

আর পরী কিনা এই মাসিকেই ছেড়ে যাওয়ার ফন্দি আঁটছিল?

কী নেমকহারাম পরী!

সাবিত্রীর চলে যাওয়া সাজে। সাবিত্রী কি কোনদিন তাদের আপন ভেবেছে যে যাওয়ার সুযোগ পেলেও আপন ভেবে থেকে যাবে? ভাড়া মিটিয়ে দিলে আর কীসের সম্পর্ক ওর সাথে?

অথচ এই মাসি তার জন্যে কম করে নি।

জ্ঞান হওয়া ইস্তক লাথিঝাঁটা খেয়ে মামার বাড়ি মানুষ। আরেকজনের ঘর করতে গিয়েও সকলের কাছ থেকে দূর-দূর ছাই-ছাই ছাড়া কিছু শোনে নি। নাতিপাগল শাশুড়ী কথায় কথায় ছেলের আবার বিয়ে দিত—গলায় দড়ি দিয়ে তাকে মরার মতলব দিয়ে। মুখে গালমন্দ আরেকজন করে নি যদিও, ইতরামো করেছে মাত্রাছাড়ানো: পারে তো চোখ দুটো তার শিক দিয়ে গেলে দেয়। যে-চোখ দেখলে স্বামীরই বলে মাথা ঘুরে যায়, অন্যের কী অবস্থা ভাবো! জানো, বাবা তোমার চোখের তারিফ করছিলেন। হেঁ! হেঁ!

দেহ অকেজো হলে বুঝি মনটাও মানুষের ইতর হয়ে যায়।

আবার সেই ব্যক্তিকের সাথে লড়াই করতে গিয়ে নিজের জীবনটা বরবাদ হয়েছে বলে আরও একটি মেয়ের জীবন বরবাদ করবার রোখ্ চেপে যায় প্রচণ্ড? নিজে মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও?

সাজা তার পেতে হবে না?

আজ ছাখো গিয়ে—তার গয়না বেচা টাকায় সেই বেকারটা দিব্যি তেজারতী কারবার ফেঁদে বসেছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে বউকে আনিয়ে নিয়েছে। ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়েছে। বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার চালিয়ে যাচ্ছে।

সুখের সংসার। সোনার সংসার!

সোনার সংসার ফেঁদেছে পরীও। এই মাসিরই দৌলতে। মাসি না থাকলে সেদিন কী অবস্থা হত?

মাদুর বিছিয়ে মানদা শোবার ব্যবস্থা করছিল, পরী বলে, ও মাসি, ওখানে কেন—ঘরে এসো।

ঘরে? মানদা হকচকিয়ে যায়। কোন্ ঘরে?

কোন্ ঘরে আবার—আমার ঘরে।

মুখে মানদার কথা সরে না।

হাত ধরে পরী টেনে তোলে বুড়িকে।

এ কদিন তুমি আমার ঘরেই শোবে, মাসি। একা ঘরে রাত কাটাতে আমার ভয় করে।

শুধু একা ঘরে রাত কাটাতে নয়, এই সবে-সন্ধ্যায় বারান্দাতেও যেন বড় ভয় পেয়ে গেছে পরী। দরজায় দরজায় কুন্দরা দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও।

মানা বাড়িউলীকে জড়িয়ে ধরে ঘরে নিয়ে যায় পরী।

ছড়া কাটতে গিয়ে সামলে নেয় লিলি। চোখ মারে কুন্দকে

কিন্তু কুন্দর সেদিকে খেয়াল নেই। সে জলছে তার নিজের জালায়: ব্যাপারটা কি? ম্যাটিনীতে নিয়ে যাবে বলে গিয়েছিল, সাড়ে ছটা বাজে—তবু পাত্তা নেই?

লিলির কলের গান বন্ধ হতে কুন্দ রেডিও খুলে দিয়েছিল, সদরেই রেডিওর আওয়াজ পেলে খুশী হয় ঘাটের মড়া, চটে গিয়ে এখন সে রেডিও বন্ধ করে দেয় : তাকে যে এভাবে জ্বালিয়ে মারছে, বয়ে গেছে তাকে খুশী করতে! কুন্দর বুঝি মান নেই?

সে এদিকে হেদিয়ে মরবে—ওদিকে একজন কথা দিয়ে কথা রাখবে না?

টাকা কুন্দ চায়। একশোবার চাইবে। দরকার হলে তাগাদা দিয়েও নেবে। নইলে তার চলবে কী করে?

কিন্তু টাকাই কি সব?

বেশ তো, চায় না কুন্দ টাকা। তার সব ভার নিক, একটা আধলাও কুন্দ আর চাইবে না। একদিনের আলাপী—কেমন নিয়ে চলল সাবিত্রীকে। আর এতদিন ধরে এত দরদ-আদিখ্যেতা—সব মুখের? গিন্নী বলে অমন ডাক দেওয়া —তাও মুখের?

বুঝেছি গো বুঝেছি!

মান করলে কেমন দেখাবে তাকে—চোখ বুজে নিজের মুখখানা দেখতে গিয়েই চমকে ওঠে কুন্দ : অ্যাঁ—!

তার মাথায় পাকা চুল?

বেগমবাহার খোঁপা বাঁধা সত্ত্বেও বাগ মানে নি?

দেওয়ালে মাথা ঠুকতে ইচ্ছে করে কুন্দর।

এগারো নম্বরের ছুঁড়িটা চুলে গোলাপ গুঁজে কবে কার সাথে ট্যাক্সিতে উঠেছিল—আজও ভোলে নি ঘাটের মড়া। নিজেই সেদিন গোলাপ এনেছিল। খোঁপায় তার গুঁজবে বলে। কলেজী বিনুনী থাকায় পারে নি।

ওরই জন্যে আজ ঘণ্টাখানেক ধরে খোঁপা বেঁধেছে কুন্দ। একটি গোলাপও কিনে রেখেছে। কিন্তু গোলাপ গুঁজতে গিয়ে যদি নজরে পড়ে যায় পাকা চুল?

বুক কুন্দর ঢিপঢিপ করে।

নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মারার মত এ কী ভুল করে ফেলেছে?

ভাগ্যিস এখনও এসে পৌঁছোয় নি!

ঝটপট কুন্দ খোঁপা খুলে ফেলে। তড়বড় করে চুলের পাক ছাড়ায়। গোলাপটা মুঠোয় পিষে ছুঁড়ে ফেলে ট্রাঙ্কের পিছনে।

আজও নিজে গোলাপ নিয়ে এসে চুলে না গুঁজতে পারলে মুখ ভার হবে, হোক—কিন্তু গোলাপ গুঁজতে গিয়ে পাকা চুল দেখে ফেললে এ তল্লাট আর মাড়াবে?

দিন যত ঘনিয়ে আসছে, যৌবন ততই চাগিয়ে উঠছে ঘাটের মড়ার। দিনকে দিন খোকামি বাড়ছে।

দ্বিতীয় দফায় দাদু হওয়ার পর এমন খোকামিই করে আজকাল:

জানো গিন্নী, পাঁচের কম আর পঞ্চাশের বেশি বয়েসের মধ্যে কোন তফাত নেই। শাস্ত্রে বলেছে।

তাই নাকি?

তবে! বলে বাঁধানো দাঁতের পাটি খুলে রেখেছিল। হেসেছিল।

হেসেছিল কুন্দও। সেই হাসি দেখে। দাঁতের পাটি আলমারিতে রাখতে গিয়ে। পিছন ফিরে।

এখন কুন্দর মনে হয়—ওভাবে হাসাটা তার অন্যায় হয়েছিল। আড়ালে হলেও। স্বপ্নে যে-মানুষটার মরা মুখ দেখেই নাওয়া-খাওয়া তার মাথায় উঠেছিল—তার কোকলা মুখের হাসি দেখে কিনা হাসি পায়!

ঘাটের মড়া মরে গেলে 'ও গিন্নী' বলে সোহাগ ভরে ডাকার তরে বাকী জীবনে কি একটা মানুষও জুটবে কুন্দর?

সত্যিকারের গিন্নী ভেবে কে আর তাকে ঘর-সংসারের নানান কথা সুখ-দুঃখের নানান কথা নতুন নাতিটির নানান কথা সারা রাত জেগে শুনিয়ে যাবে?

কে আর!

চুলের পাক ছাড়াতে ছাড়াতে কুন্দ ঠিক করে—ঘাটের মড়ার কোলে মুখ গুঁজে আজ কাঁদবে একচোট। কাঁদবেই। মন ভরে কাঁদবে। মনের সাধে কাঁদবে। মাগো, কতদিন কাঁদে নি কুন্দ!

করার বদলে মন ভরে খানিক কাঁদায় কত আরাম! কত স্বস্তি!

ভুজঙ্গ বলে, বাঃ!

সাবিত্রী মুখ টিপে হাসে। চোখ ঢুলুঢুলু করে। কোমরে একটা পাক খাইয়ে। দুই দরজায় দুই হাত তুলে দিয়ে। কাত হয়ে দাঁড়িয়ে।

সরো, ভেতরে যাই।

পছন্দ হয়?

চুমু ছুঁড়ে মারে ভুজঙ্গ!

পাল্টা সাবিত্রীও। সেই সাথে খিলখিল হাসির খিলি!

হাত ধরে ঘরে নিয়ে আসে স্বামীকে।

গয়না পরোনি কেন?

তাতে কী!

না, তাতে আর কী। ড্রেসিং টেবিলের ওপর এটাচিটার দিকে বারেক তাকিয়ে ভুজঙ্গ বলে, এতেই তোমায় দুর্দান্ত দেখাচ্ছে কিন্তু। আপন্ গড! আজকালকার মেয়েরা আবার গয়না পরে!

যাক, খবর বলো।

বলি। এপাশ-ওপাশ তাকায় ভুজঙ্গ।

আছে গো আছে। খাস বিলিতি। একটু জিরোও--

আরে না না। আমি ভাবছি গোছগাছ করে রাখনি—

ব্যস্ত কি!

ও আসবার আগেই কেটে পড়ব ভেবেছিলাম।

আসবে—অ্যাঁ?

সব ঠিক করে এসেছি।

নিজেই গিয়েছিলে?

মিছিমিছি ভাগীদার জুটিয়ে লাভ?

তা বটে!

তাছাড়া, আমি তো ক্ষতি করতে যাই নি, উপকার করতেই—

নিশ্চয়! তা শুনে কী বলল? চটাচটি করল?

চটাচটি! বরং প্রথমে কী করে খবরটা দি ভেবে আমি ইতস্তত করছিলাম—শুনে না জানি কী কাণ্ড বাধায়। আমি যখন বললুম—দিনরাত দরজা বন্ধ করে কান্নাকাটি করে, খালি বুক চাপড়ায়—চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করে দিলে। খানিক পায়চারি করে বললে, আপনি নিয়ে যাবেন? আমি ভাবলুম, সেরেছে কম্ম! পরের বোঝা নিয়ে কি শেষে ফ্যাসাদে পড়ব! বললুম, আমি? আমার সাথে তো চেনাজানা নেই। ও বাড়িরই আরেকজনের কাছে শুনে আমি আসছি। ঠিকানা হল গিয়ে তিনের-দুই দেশবন্ধু এ্যাভেনিউ। দোতলায় উঠে বারান্দা পেরিয়ে ডানদিকের শেষ ঘরখানা। আপনি বরং কাউকে দিয়ে—

পাকা হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে এসেছ?

তুমিই না বলে দিলে—

সাবাস! নাক টিপে দিয়ে ভুজঙ্গকে আদর করে সাবিত্রী। তারপর উঠে গিয়ে আলমারি থেকে সাজসরঞ্জাম বের করে আনে।

ভুজঙ্গ হা হা করে ওঠে!

তোমার জন্যে আনিয়ে রেখেছি।

তাই বলে—

পয়সা দিয়ে কেনা জিনিস নষ্ট হবে।

সে একটা কথা। কিন্তু আজ আর তুমি দিতে পারবে না—কক্ষনো না—আজ আমি নিজে নেব—হাঁ!

বলে নিজেই ভুজঙ্গ সব কাছে টেনে নেয়।

অবিশ্বাস? মনে মনে হাসে সাবিত্রী: ভেবেছে, কয়েক চুমুকের বেশি সে দিত না? খাস বিলিতি যখন?

সাবিত্রীর দিকে একটু পিছন ফিরে বসে ভুজঙ্গ। বসেই বোতলের ছিপি খোলে। দাঁত দিয়ে সোডার মুখ।

মনের হাসিটা এবার মুখে ফুটে ওঠে সাবিত্রীর: একেবারে তৈরি হয়েই এসেছিল যেন। দু মিনিট তরও সইল না।

কিন্তু এ তো আর আধ ঘণ্টার কড়ারে আসে নি যে ওই সময়টুকুর মধ্যেই নিজেকে নেশায় দিশেহারা করে টাকা উসুল করে চলে যেতে হবে ?

চুমুক দিতে দিতে তাকাচ্ছে কেন এটাচিটার দিকে ? নিয়ে সরে পড়ার মতলব ?

কিন্তু রঘুনাথ-গুইরামের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়লেও যে ঘুরে আসতে হবে পাকা জহুরাকে। কৈফিয়ত তলবের জন্যে : গিন্টির গয়নাগুলি এটাচিতে রেখে এভাবে তাকে বেকুব বানাবার মানে ? স্বামী হয় না ? গুরুজনের সাথে ইয়ার্কি ?

ভুজঙ্গ বলে, ভালো কথা, আগে নাকি একবার এক গুণ্ডার পাল্লায়—

গুণ্ডার পাল্লায় ?

হ্যাঁ। তখন আরেক পাড়ায় ছিল। সেবার একেবারে সাথে করে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু গুণ্ডাটা তাকে অপমান করে—

গুণ্ডা-বদমাসদের কাণ্ড !

কী অন্যায় !

বেশ্যাদের ব্যাপার, বাদ দাও।

আচ্ছা এক পাগলের পাল্লায় পড়েছিলুম যা হোক। কী যে ছাই মাথামুণ্ডু গড়গড়িয়ে বলে গেল—

কী বলল ?

অতশত মনে থাকলে তো। তবে মোদ্দা কথাটা হল—ফিরিয়ে দেওয়ার কম চেষ্টা সে করে নি। হদিস পায় নি বলে চুপ করেছিল—অগত্যা। আজ আমি তার যে উপকার করলাম—

ঠিকই তো। কিন্তু আসবে কবে ?

কবে মানে ? আজই।

আজই ?

সওয়া সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে—নিশ্চয়।

সওয়া সাত থেকে সাড়ে সাত ? কিন্তু সাতটা তো বাজে। কুন্দর ঘড়িতে

সাড়ে ছটার ঢং পড়েছে বেশ কিছুক্ষণ। সওয়া সাতটা মানে মিনিট কুড়ি-পঁচিশ বাকি আছে। তার পরেই আসবে?

তা মন্দ হয় না। আজই এলে নাটকটা জমে ভালো: ওদিকে মাগ সেজে আছে মালা, ইদিকে ভাতার সেজেছে গুইরাম।

গাছে না উঠতেই এককাঁদি: কী তোফাই কাটবে ওদের রাতটা আজ!

গা শিরশির করে সাবিত্রীর:

আজ ঠিক আসবে তো? হঁ্যাগো?

হাতের চেটো দিয়ে ঠোঁট মুছে নিয়ে ভুজঙ্গ বলে, আসবে গো আসবে। যা গরজ দেখলাম। তবু যদি সাতটার মধ্যে না আসে, আটটা পর্যন্ত দেখে ফের যাব। নিজেই নিয়ে আসব। কাজের ভার যখন নিয়েছি—হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টায়, ইয়ে—আসল ব্যাপারটা কিন্তু চাপা পড়ে যাচ্ছে—তুমি যাও—নগদ অত না থাকে—তার বদলে গয়না হলেও চলবে—নিয়ে এসো। তারপর গোছগাছ করে করে নাও।

টাকা তোমার মারা যাবে না।

তাড়াতাড়িতে তখন যদি—

অতই সোজা! টাকা নিয়ে ইয়ার্কি।

যা ভালো বোঝ। জানো তো টাকার কী দরকার এখন? সেরা উকিল লাগাতে হবে। তার ফি-ই তোমার ধরো গিয়ে—

সদরে সিগারেট ফুঁকছিল গুইরাম। বিড়ির বদলে সিগারেট।

দিশী ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবী পরনে থাকলে সিগারেট না ফুঁকে উপায় কি। সিগারেট টানতে টানতে লাল-সুতীর জন্যে গলাটা খাঁ খাঁ করলেও।

গুইরাম ভাবছিল, এখনই যাবে কি যাবে না? শনিবারের বাজার, দরজায় না থাকলেও ক্ষতি নেই, তবু—সাঁঝ পেরোতে না পেরোতে—তাও এই বেশে—

ওগুলো বারান্দায়। সবাই হাসাহাসি শুরু করে দেবে। লিলি শালী নির্ঘাত ছড়া কেটে উঠবে।

এখন চড়া কাটলে তো গাঁট্টা হাঁকানো যাবে না। শালীর ঠাট্টা ভেবে সয়ে যেতে হবে।

বুকে হাত দিয়ে রাধাকেষ্টর কিরে করে বললেও শালী বিশ্বাস করবে না যে এই পাঞ্জাবিটা সে জানকীর থেকে ধার নিয়েছে। ভাইফোঁটায় এই ধুতিটা তাকে জানকীর বউ দিয়েছে।

নইলে গুইরাম কিনবে দিশী ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবি? দু টাকার আশীর্বাদীর বদলে বারো টাকার একটা ধুতি পেয়েও দাঁত খিঁচিয়ে উঠেছিল যে তিনকড়ি মিস্ত্রীর রোগাপটকা কেলেকিস্কিন্ধি বোনটাকে?

মারো গোলী! এ শালার ভদ্রলোকী মাল চড়াবে কে? এর চে যদি গণ্ডা-খানেক লুঙি দিতিস।

শোন কথা! ভাইফোঁটায় কি দাদাকে লুঙি দেয় গা?

তা যদি বলিস—দাদাও তো শাড়ি দেয় র‍্যা। হাম তো শালা দু রূপীয়া দেকেই—

তুমি আশীর্বাদ করো দাদা—ভাত-কাপড়ের অভাব যেন বোনটার না হয়।

ওর সাথে তুই পারবি নি গুয়ে। দেখতে ভিজে বেড়ালটি, কিন্তুক টকাটক যা কথা শোনায়—মাইরি, ইঁদুরের মত কুটকুট করে—

চোপ! হামার বহিন যে তোকে ধরে প্যাঁদায় না—তোনকা সাতজন্মকা পুণ্যি।

বিসমিল্লা! তোর হয়েই বলতে গেলুম—

ভাই-বহিনকা কথায় তুমি শালা নাক ঘুসানে কাহে আতা বে? এ্যায়সা রদ্দা দুঙ্গা—

কেমন!

হেসে উঠেছিল অতবড় মেয়েটা। কচি খুকির মত। দেখতে মুক্তোমালার ধারে কাছে না হলেও হাসিটা একেবারে মুক্তোমালার মত।

আর তাই দেখে সে সত্যিসত্যিই গুইরাম রেগে গিয়েছিল জানকীর ওপর: এই বউয়ের গায়ে হাত তোলে শালা! হাত তুলে আবার সাফাই গায়!

সাবিত্রী এসে বলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছ গুইদা ?

কেয়া বাত ?

দুবার ডেকে সাড়া পেলুম না।

আমায় ডাকার দরকার ? আসবার লোক তো আগিয়া। এখন যা দরকার বংশীকো বোলো।

তোমার দরকার কি কখনও ফুরোয় গুইদা।

তেলানো হোতা হায় ? তবে বল মাগী—খসে ফেল তোর দরকারটা।

মাগী ! কট করে কানে বাজে। এখান থেকে কথাটা কি আরেক জনের কানেও যাবে ? তার বউকে একটা দালাল মাগী বলছে—শুনে কী ভাববে ? তেড়ে আসবে কি ?

কিন্তু শুনতে পেলে তো! এখান থেকে কেন, দরজায় দাঁড়িয়ে বললেও শুনতে পেত না। বোতল নিয়ে যেমন মশগুল হয়ে গেছে, তার বউকে একটা দালাল তুই-তোকারি করছে শুনলে চাট হিসেবে সেটা কাজে লাগাত।

গুইদা, তোমায় এক জায়গায় যেতে হবে।

যেতে হবে ? আভি ? কভি নেহি বিবিজান।

কাজটা কিচ্ছু নয়—

বংশীকো ভেজো। নেহি তো রঘুকো বোলাকে দেতা।

বংশীকে এইমাত্র কুন্দদি দোকানে পাঠাল। রঘুনাথকে দিয়ে চলবে না। অথচ সওয়া সাতটার মধ্যে না গেলে—

আমি কোথাও যেতে পারব নি। সাফ বাৎ।

দোহাই ! কতক্ষণ আর লাগবে। বড়জোর আধঘণ্টা—

সাবিত্রী হাত ধরার জন্য এগিয়ে আসে। সরে দাঁড়ায় গুইরাম।

ছুঁও মৎ।

মরণ !

শোন, আজ হাম ছুটি লেচুকা। আজ আমি নেহি হায় মনে কর।

জানি ! জিভ দেখিয়ে সাবিত্রী বলে কিন্তু দুদণ্ড দেরি হলে কি—

এ্যাও ! এ্যায়সা রদ্দা খাবি। গুইরামও হেসে ফেলে। না ছুঁয়েও কীভাবে সাবিত্রীকে ঢিট করা যায় ভেবে পায় না বলে।

সাবিত্রী এবার দশ টাকার একটি নোট এগিয়ে দেয়।

কেয়া ?

বকশিশ।

বকশিশ ? বহুতাচ্ছা। হাত বাড়ায় গুইরাম। কাপ্তেন ? কেমন, দেখেই বলেছিলুম কিনা ?

তোমার চোখ গুইদা ! কিন্তু এ আর কী কাপ্তেন ! আসল কাপ্তেন আসবে আজ। ভীষণ দিলদরিয়া মানুষ। তাই তো বলছি—যাবে ? তাকে নিয়ে আসতে হবে। বড়জোর আধঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে।

নোটটা মুঠোয় নিয়ে বড় চিন্তায় পড়ে যায় গুইরাম।

সাবিত্রী বলে, লোকটা যেমন খরচে শুনলুম, ওর কাছ থেকেও কোন্ না দশ-বিশ টাকা আজই—

ফরমাইয়ে বিবিজান। হঠাৎ সেলাম ঠুকে সিধে হয়ে দাঁড়ায় গুইরাম। তেরি লিয়ে জান লড়ায় দেগা। কিন্তু আটটার মধ্যে কাম খতম হোগা তো ? বল, কী করতে হবে ? জলদি !

নতুন কাপ্তেনটাকে নিয়ে আসতে হবে। গাড়ি নিয়ে সে অপেক্ষা করবে—আলী পার্কের সামনে। সওয়া সাতটা থেকে পৌনে আটটা পর্যন্ত। এরই নিয়ে আসার কথা ছিল। কিন্তু খবর দিতে এসে মজে গেছে, নড়তে চাইছে না। জোর করলে অবিশ্যি—কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে গুইদা ?

ঠিক যে হবে না—ঘাড় নেড়ে গুইরাম জানিয়ে দেয়।

আমি বললেই আয়েগা ?

আসবার জন্যেই বলে অপেক্ষা করবে। শোন, গাড়ির নম্বর হল চার হাজার দু শো বারো। নম্বর না মনে থাকে গাড়ি দেখলেই চিনবে—সিঁদুর রঙের ছোট গাড়ি। এক্ষুনি যাও গুইদা। সাতটা বাজল। বাসে চলে যাও। খুচরো আছে তো ?

গুইরাম শুনতে পায় না। নোটটা ভাঁজ করে। চুমু খেয়ে পকেটে রাখে : এ একরকম ভালোই হল। এখুনি গিয়ে মালার ঘরে ঢুকতে পারছিল না, সেজেগুজে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতেও বদখত লাগছিল। বাঁধা বাবুরা আসবে এখন—কী ভাববে!

যাক, ফাঁকতালে দশটা টাকা এসে গেল। নয়া কাপ্তেনটার কাছে আরও কোন্-না দু-দশ টাকা বাগানো যাবে।

পা বাড়াতে গিয়ে ফিরে দাঁড়ায় গুইরাম। কিন্তুক—আরেকটা যে আসতা হ্যায়, মেয়ে কাঁহা?

সাবিত্রী হেসে বলে, ভয় নেই গো ভয় নেই!

সে গুড়ে বালি বিবিজান। আমি বলি—কি বাইরে থেকে যাকে ইচ্ছে আনা, সেই সাথে পরীকেও নিস। শুধু গান গাইবে, ব্যস। সমঝে?

কিন্তু বাড়তি একজনকে নিতে যদি—

দশ-পনেরো ট্যাকা বাড়তি খর্চা করবে নি? দিলদরিয়া কাপ্তেন বলছিস?

বললে কি আর করবে না!

বলতে বুক টাটায়?

টাটায়ও যদি, তুমি বলছ না নিয়ে পারি!

খুশী হয় গুইরাম। ভবতারণের ভঙ্গিতে হাত তুলে বলে, কালী তেরা ভালা করে!

হয়েছে! তুমি এখন তাড়াতাড়ি এসো দিকি। নইলে ওদিকে আবার—

ভাবো মৎ। হাম ঝড়াকসে যায়েগা আর পড়াকসে আয়েগা। উসকো একদম বগলদাবা করকে।

পকেট থেকে নোটটা বার করে গুইরাম। চুমু খেয়ে ভাঁজ খোলে। চুমু খেয়ে ফের ভাঁজ করে। ফের চুমু খেয়ে পকেটে পোরে।

কালী বহোৎ উমদা হ্যায়। শালা-গুইরামকা ভি ভালা কর দিয়া। আপ্‌সে। কালী মায়ীকী—জয়!

সাবিত্রীকে এক সেলাম ঠুকে বেরিয়ে যায় গুইরাম।

প্যাসেজের আলো-আঁধারিতে সাবিত্রীর মুখটা তার নজরে পড়ে না।

পড়লে রক্ষে থাকত না।

সাথে সাথে চুলের মুঠি ধরে দেওয়ালে মাথাটা ঠুকে দিত। 'তুমি বলছ না নিয়ে পারি!' বলে মুখ ভেঙিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষা বের করে দিত।

গুইরামের পিছে পিছে এগিয়ে আসে সাবিত্রী। প্যাসেজের দরজায় দাঁড়ায়।

এভাবে দরজায় দাঁড়ানো বারণ করে দিও, কিন্তু সত্যিই তো সে আর দরজায় দাঁড়ায় নি। ঘরে যার খদ্দের মোতায়েন, দরজায় দাঁড়াবে সে কোন্ দুঃখে ?

ধরো, সাবিত্রী দাঁড়িয়ে আছে বাসের পথ চেয়ে।

বাস আসছে দেখলে তরতর করে এগিয়ে যাবে। এখানে স্টপেজ নেই। লোক নামাবার জন্যে বাস থামে না, তোলার জন্যে থামে।

তাই বলে কখন বাস আসবে সেই আশায় ফুটপাথে গিয়ে যায় দাঁড়িয়ে থাকা ? মনিহারী ও জ্যোতিষালয়, ডাইংক্লিনিং আর সোনারূপা অগ্নি তাহলে চনমনিয়ে উঠবে না।

অবশ্য তাতে আজ আর কিছু যায়-আসে না। এখন তাকে তাক্ করে কেউ চুটকি সুর কি ফালতু ইয়ার্কি ছুঁড়লে মাথাটা তার দপ করে উঠবে নাঃ সাবিত্রী তো এখন স্ববর্ণ হয়ে বাসের পথ চেয়ে নেই। বাপের বাড়ি যাবে বলে বাসের পথ চেয়ে।

আসলে কি সাবিত্রী বাসের পথ চেয়ে আছে নাকি ?

সুতরাং এখন যদি কেউ চনমনায়, মুখ টিপে টিপে সে হাসা শুরু করে দেবে। বিনুনীর ডগা দিয়ে গালে সুড়সুড়ি দেওয়া। থেকে থেকে বুকে বিনুনীর বাড়ি মারা। আড়ে আড়ে চাওয়া। চোখ ঢুলুঢুলু করে চোখ-খোলা চোখ-বোজা খেলা করা।

দরকার হলে দুহাত দুই দরজায় তুলে কাত হয়ে দাঁড়াবেও। মানী বাড়িউলীর রীতরেওয়াজের তোয়াক্কা না করে।

নাগালে কেউ এগিয়ে এলে ইশারায় তাকে ডাক দেবেও। ওদিকের ওই পাহারালার তোয়াক্কা না করে।

তারপর হাত ধরে তাকে ওপরে নিয়ে যাবে: হায়! হায়! কা ভুলই হয়ে গেছে! শনিবার আজ—ভুলেও যদি স্বামীসোহাগীর হুঁশ থাকে: বাঁধা মানুষটা এসে হাজির গা।

ফিরিয়ে দিলে আদালতে গিয়ে কেস ঠুকে দেবে না? মোটা টাকার ক্ষতিপূরণ চেয়ে বসবে না?

ওগো, আজ তাহলে তুমি—। ভাঙা-ভাঙা গলায় বলবে, এসো গো—এসো! কাঁদ-কাঁদ মুখে ছলছল চোখে বিদায় দেবে।

কিন্তু অত সহজে বিদায় ভুজঙ্গ নিলে তো! তার আগেই তার কায়দাটা বউ খাটিয়ে ফেললেও ঘাবড়াবার বান্দা ভুজঙ্গ নয়। টাকার কথায় টাকার কথা মনে পড়ে তার যাবেই।

সে এসেছে তার বউয়ের কাছে, দুদিনেও তাই একটি আধলাও ঠেকায় নি। তাই বলে সে নিজের পাওনা ছাড়বে কেন? অমন বাহাদুরির বকশিশ পাওনা।

টাকা না নিয়ে ভুজঙ্গ গাঙ্গুলা নড়বে না।

সাবিত্রী কি তখন হল্লা বাধাবে? একসাথে রঘুনাথ আর গুয়েগুণ্ডাকে লেলিয়ে দিয়ে ঘাড় ধরে ওকে বার করে দেবে?

কী সবনাশ! অমন রীতরেওয়াজের বরখেলাপের কথা ভাবলেও পাপ। ব্যবসার তাহলে বারোটা বেজে যাবে না।

টাকা দেবে সাবিত্রী।

ফাঁকি সে কাউকে দেয় নি, দেবে না।

সবাই হয়ত রুখে দাঁড়াবে। শুধু মালা নয়, সবাই। চাই কি, তুলকালাম একটা কাণ্ডই হয়ত বানিয়ে বসবে।

অবুঝরা তো আজ বুঝবে না কেন সাবিত্রী একাজ করল।

মানদার রীতরেওয়াজের তালিমই শুধু দেয় ওরা, দুনিয়ার রীতরেওয়াজের ধার ধারে না।

ইঁদুরের সরোজের কথাতেও ওদের চোখ খোলে নি : যতদিন দুনিয়া থাকবে তাদেরও থাকতে হবে। তারা মেয়ে না বিয়োলেও মেয়ে জুটে যাবে। শুধু জুটে যাবে নয়, দিনকে দিন বাড়বে। বাড়াবে ব্যাটাছেলেরাই। ওরাই যে সবকিছুর জন্মদাতা। দুনিয়ার হর্তাকর্তা।

কম খাটনি জগৎ-সংসারের কর্তালি করার? বাড়তি ফুর্তি উটকো ফার্তি ছাড়া শানায় ওদের?

তারা না থাকলে ওরা যে এর-তার বৌ-ঝি নিয়ে টান মারবে।

দেশ তাহলে জাহান্নমে যাবে না?

ওদের থাকতে হবে দেশের জন্যে।

ওরাই দেশের সেবাদাসী না?

জাতবেশ্যা হলেও কুন্দ লিলি পটল মালা আকাশ থেকে পড়ে নি। মানদা পরী সাবিত্রীর মত এদেরও মা কি দিদিমা কি তার মা কি তার মা একদিন সংসার থেকেই এসেছিল। সেই সংসারে মা ছিল বাবা ছিল ভাই ছিল বোন ছিল স্বামী ছিল সন্তান ছিল।

অবু মাস্টারের সংসারের মত সেগুলিও এক-একটি আস্ত সংসার ছিল।

সেইসব সংসার আজও বেঁচে আছে।

শুধু এরা সেইসব সংসার থেকে হারিয়ে গেছে। চিরতরে।

হারিয়ে গিয়েও সেইসব সংসারকে টিকিয়ে রাখছে এরাই। পাছে সেইসব সংসারের কোন ছেলে আজ এর-তার বৌ-ঝি নিয়ে টান মারে—এরা তাই বাড়তি ফুর্তি উটকো ফার্তির দোকান খুলে বসে আছে।

সাবিত্রীও আছে।

কিন্তু ননীর ছেলে হবে ফনীর ছেলে হবে সুষমা সুরমা টুলুর ছেলে হবে— তাদের সামাল দেবে কে?

সাবিত্রীর মা হবার ক্ষমতা নেই। মা হবার ক্ষমতা নেই কুন্দ লিলি পটল পরীর।

তবে কি আবার কোন সুবর্ণকে তখন ঘরের বার করে আনতে হবে?

না না না ! তার চেয়ে এই ভালো ! এই ভালো !

কেন বোঝে না মালা যে ভাঙা কাঁচ যেমন জোড়া লাগে না, কাঁচ ভেঙেও যায় তমনি টুসকি দিলেই।

মেয়ে আমার গেরস্থ ঘরের বউ হবে !

ওরে খানকী, গেরস্থ ঘরের বউ তো অবু মাস্টারের মেয়েও হয়েছিল !

দরজায় ছটফট করে সাবিত্রী।

ফিরিয়ে দেবার জন্যে কতক্ষণে সুধাময় মালার মেয়েকে নিয়ে আসবে—দাঁতে দাঁত চেপে পথের পানে চেয়ে থাকে সাবিত্রী।

যে-সাবিত্রী একদিন সুবর্ণ ছিল।